এই মর্তভূমি

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়



এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ

বৈশাখ, ১৩৬০

সাড়ে তিন টাকা

এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ, ৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
পক্ষে সুপ্রিয় সরকার কর্তৃক প্রকাশিত এবং দি প্রিন্টিং হাউস, ১২৪ বি.
বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬ হইতে প্রফুল্লকুমার বসু কর্তৃক মুদ্রিত

শ্রীশেখর সেন

প্রিয়বরেষু

লণ্ডনের অনেক
দিন ও রাত্রির
স্মরণে

'বঙ্গশ্রী' সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীঅমূল্যভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমার অনুরোধে তাঁর পত্রিকায় 'এই মর্তভূমি' প্রকাশের ব্যবস্থা করেন এবং আমারই অনুরোধে মাত্র প্রথম অংশ শেষ হবার পর সম্পূর্ণ উপন্যাস অবিলম্বে পুস্তকাকারে প্রকাশ করবার অনুমতি দেন। তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই কারণ তাঁর অনুমতি না পেলে 'এই মর্তভূমি' এত তাড়াতাড়ি পুস্তকাকারে প্রকাশ করা সম্ভব হতো না।

লেখক

প্রথম বছর

পাড়ার নাম রাসেল স্কোয়ার। টিউব ষ্টেশনেরও ওই একই নাম। রাসেল স্কোয়ার খুব বেশী বড়ো নয়। সেখানে বসলে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় স্পষ্ট চোখে পড়ে। সাদা রঙের নূতন বিরাট অট্টালিকা। ভারতীয়রা সেদিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। আর যারা আমেরিকা ফেরৎ, তারা বলে—এমন বাড়ী আমেরিকার অলিতে গলিতে।

সূর্য উঠলে যেন সাড়া প'ড়ে যায়। রাসেল স্কোয়ারে বসবার জায়গা পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। বেঞ্চি পাওয়া দূরের কথা, মাটিতেও বসবার উপায় থাকে না। চারপাশে নানা বয়সের নানা রকমের নর-নারী গিজ গিজ করে। কেউ ব'সে থাকে, কেউ শুয়ে থাকে, কেউ আধ শোয়া অবস্থায় আকাশের দিকে তাকিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই একই কথা ভাবে, আজকের দিনটি কী অপরূপ!

এ পাড়ায় অসংখ্য ছোট বড় হোটেল। পাশেই বিশ্ববিদ্যালয়, তাই এই সব হোটেলে ভারতীয় ছাত্রদের ভীড়। শুধু ছাত্র বললে ভুল হবে, ব্যবসা কিংবা আপিসের কাজে দেশ থেকে যারা কয়েক মাসের জন্য এখানে আসেন, তাঁরাও এসে ওঠেন এই রাসেল স্কোয়ারের হোটেলে।

এ পাড়ায় থাকার আরও কতগুলি সুবিধা আছে। প্রথম প্রথম লণ্ডনে এসে দেশের জন্যে যাদের মন খারাপ হয়—চারপাশে অনেক দেশের লোক দেখে তাদের আর নিঃসঙ্গ বোধ হয় না। আর এ পাড়ার কোনো না কোনো হোটেলে জায়গা পাওয়া যাবেই। ভাড়া শুধু ঘর আর প্রাতরাশের জন্য সাধারণত সপ্তাহে তিন গিনি—মানে তিন পাউণ্ড তিন শিলিং

জাহাজ থেকে নেমে ট্রেনে চ'ড়ে ভারতীয় ছাত্ররা একটু ভয়ে ভয়ে লণ্ডনে নামে—ভাবটা, এখন কোথাও একটু মাথা গোঁজবার ঠাঁই জুটলে হয়।

ট্যাক্সিতে মালপত্র তোলবার পর ড্রাইভার জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাবে, স্যার্?

ভারতীয় ছাত্র মাথা চুলকে বলে, একটা সস্তা হোটেল টোটেলে নিয়ে যেতে পারো—জায়গা-টায়গা তো ঠিক করিনি কিছু—

এক্ষুণি, একগাল হেসে হুস্ ক'রে ড্রাইভার তাকে এনে তোলে রাসেল স্কোয়ারের হয় হ্যামিলটন্ হোটেলে, নয় কাডিফ হাউসে—নয় মিসেস জেরার প্রাইভেট হোটেলে। ভারতীয় ছাত্র খুশী হ'য়ে ভাবে—ভাগ্যিস এই ড্রাইভারের সংগে দেখা হয়েছিল! আর ড্রাইভার ভাবে, বেটাদের অনেক পয়সা—তিন গিনি করে বেড অ্যাণ্ড ব্রেকফাষ্টের জন্যে ওরা না দিলে কি আমি দোব!

প্রথম কিছুদিন ভারতীয় ছাত্ররা নিশ্চিন্তে দিন কাটায়। তারপর চারদিকে তাকিয়ে লণ্ডন শহরের হাল চাল বুঝে আস্তে আস্তে চালাক হয় আর তখনই মনে হয়, বড় বেশী খরচ করে আছি। এবং কিছুদিনের মধ্যেই রাসেল স্কোয়ার থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে ভারতীয় ছাত্র অন্যত্র যায়।

গ্রেনভিল স্ট্রীটে মিসেস জেরার প্রাইভেট হোটেলে উঠেছিল সুকুমার। তেতালায় তার সাজানো ঘর। নরম বিছানা, ঝকঝকে আসবাব-পত্র আর ঘরের মধ্যে সিঙ্কে চব্বিশ ঘণ্টা ঠাণ্ডা জল—গরম জল দেখে আনন্দে মাথা খারাপ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল সুকুমারের।

সকাল সাড়ে আটটায় মেইড টুক্ টুক্ করে দরজায় টোকা মেরে

জানিয়ে যায়—ব্রেকফাষ্ট রেডি। সুকুমার পিট পিট ক'রে চোখ মেলে কিছুক্ষণ বিছানায় পড়ে থাকে। তারপর শুয়ে শুয়েই মাথার কাছের জানলার পর্দা সরিয়ে বোঝবার চেষ্টা করে—দিনটি কি রকম। একটু পরে হাজার অনিচ্ছায় বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই মুখ ধুয়ে দাড়ি কামিয়ে ফিটফাট হয়ে একেবারে একতালায় ব্রেকফাষ্ট টেবিলে নেমে আসে।

সেখানে অনেকের ভীড়। সকলের এক সংগে জায়গা হয় না টেবিলে। প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে একবার মাত্র 'গুডমর্ণিং' উচ্চারণ ক'রে একটা খবরেব কাগজ খুলে সোফায় ব'সে পড়ে সুকুমার। এমনিতেই একটু লাজুক স্বভাব তার—তাই সব সময় তার ভয় হয়—অন্য ভাষায় কি বলতে কি ব'লে ফেলবে।

জুলাই মাস। ভয়ানক গরম পড়েছে। সুকুমার কোটপ্যাণ্ট পরে ঘামতে ঘামতে মনে মনে হাসে। লণ্ডন শহরে যে এমন সাংঘাতিক গরম পড়ে, সেকথা দেশে থাকতে একজনও তাকে জানায়নি কেন।

খাবার টেবিল থেকে শুধু টুং টাং কাঁটা চামচের শব্দ হয়—কেউই কোন কথা বলে না। মনে মনে রেগে যায় সুকুমার—ঠিক কথাই বলেছে নেপোলিয়ন, একেবারে ব্যবসাদারের জাত বেটারা। এমন গোমড়া মুখ ক'রে সারাদিন থাকে কেমন করে!

যথাসময়ে সে-ও মুখ বুজে খাওয়া সেরে নেয়!

ব্যাস্, এইবার সম্পর্ক চুকে গেল বাড়ীউলির সংগে—এখন সারাদিন চ'রে বেড়াও, যা খুশী করো, কেউ তোমার খোঁজও নেবে না, আর এক কাপ চা'ও দেবে না কেউ তোমাকে—ব্রেকফাষ্টের পর প্রত্যেকটি খাওয়া বাইরে খেতে হয়। শুধু এরই জন্যে সপ্তাহে সপ্তাহে দিতে হয় চল্লিশ টাকার কিছু বেশী। এত খরচ প্রাণ ধরে সুকুমার করছে কেমন ক'রে সেই কথাটাই শুধু সে ভাবে। আর তার মনে পড়ে যায় মা

আর ছোট ছোট ভাই বোনদের কথা। অল্প কয়েকদিনের মধ্যে তাদের ছেড়ে কতদূরে চ'লে এলো সে! এখন হাজার মাথা খুঁড়লেও চার বছরের আগে আর কিছুতেই দেখা হবে না তাদের সংগে!

যারা কোনদিন বিলেতে আসবার স্বপ্নও দেখতে পারে না, সুকুমার ছিল তাদেরই একজন। বিধবা মায়ের বড়ো ছেলে সে। সংসার তার কাছে অনেক কিছুই আশা করে। তারপর অনেকগুলি ছোট ছোট ভাইবোন। পড়াশুনোয় সে খারাপ নয়, তবে এত ভালো নয় যে স্কলারশিপ পেতে পারে। পদার্থ বিজ্ঞানে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স নিয়ে সে পাশ করেছে।

এমন সময় ঘটলো যোগাযোগ। দেশে হঠাৎ বিলেত যাবার হিড়িক পড়ে গেল। যার সংগে দেখা হয় সেই বলে, ওহে বিলেত চললাম। এতদিন যুদ্ধের জন্যে পশ্চিমের সংগে ছাত্রদের সংযোগ একেবারে বন্ধ ছিল। যুদ্ধের বাজারে সকলেই দু' পয়সা গুছিয়ে নিয়েছে। কাজেই বিদেশে পাড়ি দেবার পথও বেশ প্রশস্ত হয়ে উঠলো।

সুকুমার মাকে ধ'রে পড়লো, মা বিলেত যাবো।

মা চোখ কপালে তুলে বললেন, বলিস কি!

বন্ধু-বান্ধবরা সবাই যাচ্ছে, আমিও যাবো।

টাকা কোথায় রে সুকুমার?

ওপাশের দু'খানা ঘর ভাড়া দিয়ে দাও—অনেক ভাড়া পাবে আজকাল, আমি খুব কমে চালাবো—আর তোমার যা টাকা আছে, তাতে আমার ভাড়া হয়ে যাবে।

মা হেসে বললেন, পাগল।

কিন্তু কথাটা মনে ধরলো তাঁর। তিনি ভাবতে লাগলেন। এমনি ক'রে খুব অল্প কয়েক দিনের মধ্যে সুকুমারের বিলেত যাওয়া ঠিক হ'য়ে গেল। তবু শেষ দিন অবধি মায়ের সংগে তার নিরন্তর যুদ্ধ করতে

হয়েছে। আত্মীয়-স্বজনরা নানা কথা ব'লে, দারিদ্র্যের ভয় দেখিয়ে, অনিশ্চিত আপদ-আশঙ্কার কথা তুলে তার সমস্ত আয়োজন পণ্ড করতে চাইলো। মন শক্ত ক'রে মা বললেন, আমাকে তো জানিস সুকুমার, কেমন শক্ত মানুষ আমি—তুই চ'লে যা, সবদিক্ সামলাবো আমি—কিন্তু সাবধান, এক মুহূর্তের জন্যেও ছোট ভাইবোনদের কথা ভুলিস না—তোর ওপর আমার অনেক আশা-ভরসা রে সুকু—।

মা বোধহয় ভাবছিলেন অন্য কথা। তিনি ভাবছিলেন, এই দারিদ্র্য একদিন ঘুচিয়ে দেবে সুকুমার। বিদেশ থেকে মানুষ হ'য়ে ফিরে আসবে সে। মোটা মাইনের চাকরী ক'রে মাথায় তুলে নেবে অন্য ভাইবোনদের মানুষ করবার ভার—আর তাঁকে দেবে নিশ্চিন্তি। সেই অদূর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা মনে ক'রে আজ হাসিমুখে সমস্ত কষ্ট তিনি সহ্য করতে রাজী। তাঁর স্বামীর অপূর্ণ সব কাজ তাঁকেই করতে হবে যে—অসম্ভবকে সম্ভব করতে হবে—ধৈর্য হারালে চলবে কেন—নিঃশব্দে তিনি সমস্ত বন্দোবস্ত ক'রে ফেললেন। সুকুমার টেরও পেল না—এত তাড়াতাড়ি সবদিক গুছিয়ে ফেলে কেমন ক'রে তিনি তার পাড়ি দেয়ার পথ প্রস্তুত ক'রে দিলেন।

যাদের কোন দিন বিলেতে আসার আশা থাকে না—এ-দেশে এসেই তাদের মনে হয় সে-ই বুঝি প্রথম এখানে এলো—আর বাড়ীতে সব বিষয়ের বর্ণনা দিয়ে লম্বা চিঠি লেখে। সুকুমারও তাই করলো।

প্রথমেই সে লিখলো জুলাই মাসের গরমের কথা, এত টাকা খরচ ক'রে অত গরম কাপড় আনবার কোন দরকার ছিল না মা, এখানে এখন বৈশেখ-জৈষ্টির গরম। এরা রোদ্দুর ভয়ানক ভালবাসে। পার্কে-পার্কে হাজার ছেলেমেয়ে খালি গায়ে রোদ পোয়ায়। এ দেশের

মেয়েরাও খুব কাজ করে—রেষ্টুরেণ্টে সার্ভ করে, পোষ্টআপিসে কাজ করে—বাসে কণ্ডাক্টরি করে—এসব দেখে বেশ ভাল লাগে মা।

সব খবর বাদ দিয়ে ওই একটি খবরই মা বড়ো ক'রে নিলেন, সেটি হ'লো মেয়েদের কথা। উত্তরে নানা কথা লিখে বার বার তিনি লিখলেন, 'মেয়েদের লইয়া বেশী মাথা ঘামাইও না—মেয়েদের এড়াইয়া চলিও।'

চিঠি প'ড়ে সুকুমার হাসলো। একটি কথা এই অল্প কয়েক দিনেই সে বুঝেছে, এখানে ছেলে অথবা মেয়ে—কারুর সঙ্গেই সহজে আলাপ হয় না—আলাপ হ'লেও ঘনিষ্ঠতা করা কঠিন। গায়ে প'ড়ে কেউই কারুর সংগে আলাপ করে না।

আসবার আগে অনেক কল্পনা করে এসেছিল সুকুমার। কত লোকের সংগে তার পরিচয় হবে—কত ইংরেজ পরিবারের বাড়ীর ছেলে হ'য়ে উঠবে সে—নতুন পরিবেশের মধ্যে পড়ে সমস্ত কিছু একেবারে ভুলে যাবে। কিন্তু এতদিন হ'য়ে গেল সে এদেশে এসেছে অথচ আজও একটিও ইংরেজের সংগে ভালো করে আলাপ হ'লো না সুকুমারের।

পকেটে চকলেট আর আরও নানা রকম খাবার নিয়ে দারুণ গ্রীষ্মে অনেক দিন রাসেল স্কোয়ারে গিয়ে বসেছে সে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের কাছে ডেকে আপেল আঙুর বিলিয়ে অনেকবার কোলে তুলে নিয়েছে। তাদের মা কিংবা বাবা কাছে এসে মৃদু হেসে সুকুমারকে ধন্যবাদ জানিয়েছে। কেউ কেউ বুঝিয়েছে, এমন করে চকোলেট নষ্ট করো না—এখানে ওটা র‍্যাসেন্‌ড্‌ কি-না—শেষে নিজের দরকার হ'লে আর পাবে না। কেউ তাকে আর কোন প্রশ্ন করেনি—খাতির করে বাড়ীতে নেমন্তন্ন তো করেইনি। বড় জোর কেউ কেউ বলেছে, তোমার তো আনন্দ আর ধরছে না—একেবারে দেশের গরম, কি বল?

সুকুমার ভেবে ভেবে বললো, গরম আমার ভালো লাগে না।

ইংরেজ চোখ বড় বড় করে বললো, বল কি ছেলে! ব্যাস ওই

অবধি। ইংরেজ পাইপ মুখে দিয়ে কাগজ পড়ায় মন দিয়েছে আর সুকুমার চারপাশে তাকিয়ে 'হংস মধ্যে বক যথা' হ'য়ে বসে থেকেছে।

কিছুদিনের মধ্যেই তার জীবন-যাত্রা হ'য়ে উঠলো যন্ত্রের মতো। কারুর যেন এক মিনিটও সময় নেই তার সঙ্গে কথা বলবার। আশ্চর্য এই লণ্ডন শহর—প্রত্যেকটি লোক ব্যস্ত। কেউ আস্তে রাস্তায় চলে না—এমন কি বুড়ো বুড়িরাও যেন ছুটে চলে।

তবু দমে গেল না সুকুমার—বাড়ীর জন্যে তার মন খারাপ করলো না একদিনের জন্যেও। সে ঠিক করলো, একদিনও সে নষ্ট হ'তে দেবে না এখানে, ইংরেজের মতো সেও অমনি ব্যস্ত হয়ে উঠবে। প্রতিদিন সে জানবে যা জানে না, শুনবে যা শোনেনি, প্রাণ-ভরে দেখবে যা এর আগে কোনদিনও দেখেনি।

ইলেক্‌ট্রিক্যাল এন্‌জিনিয়ারিং এর ছাত্র সুকুমার। রাসেল স্কোয়ারের কাছেই ফ্যারাডে হাউসে তাকে ক্লাস করতে হবে। কিন্তু এখন তার প্রচুর অবসর। পাছে সিট না পায় এই ভয়ে জুলাই মাসে লণ্ডনে এসে পৌঁছেছে সে, কিন্তু ফ্যারাডে হাউসে ক্লাস খুলবে অক্টোবর মাসের আরম্ভে। সে ঠিক করলো এই কয়েক মাস ইউরোপের নানা তথ্য জেনে নেবে, ইংরেজীটা ভালো ক'রে ঝালিয়ে নেবে—কথায় কথায় অভিমান না করে নিজেকে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করবে। তাকে মানিয়ে নিতে হবে। অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে এদেশে আসতে পেরেছে সে। মা তার আশায় ব'সে আছেন। চারটি দীর্ঘ দীর্ঘ বছর কাটাতে হবে এদেশে। ভালো না লাগলে কিছু না করে হঠাৎ আদুরে গোপালের মতো বাড়ী ফিরে যাওয়া চলবে না তার। সুকুমার তো কিছুতেই ভুলতে পারবে না যে সে গরীব। তবু চারপাশের চঞ্চল আড়ম্বর আর দ্রুত উন্মুক্ত জীবনধারা তাকে যেন সব কিছুই ভুলিয়ে দিতে চায়।

থেকে থেকে তার স্বপ্নের মতো জাহাজের কথা মনে পড়ে। আর আজও রাত্তিরে মাঝে মাঝে দোলা লাগে। সেই একটানা শব্দ হয়—কট্ কট্ কট্ কট্ কট্—কট্ কট্ কট্ কট্ কট্ আর তন্দ্রাঘোরে তার মনে হয় মাথার বালিশ একবার নিচে নেমে যাচ্ছে—তারপর আবার ওপরে উঠছে।

জাহাজের সংগীদের হারিয়ে ফেললো স্কুমার। বাঙালী তাকে নিয়ে মাত্র তিনজন—অন্য দু'জন যাচ্ছে আমেরিকায়—দিল্লী আর বোম্বের কতগুলি ছাত্র ছিল—তারা কোথায় গেছে না গেছে স্কুমার সেকথা কিছু জানে না। লণ্ডনে নামবার পর তাদের কারুর সংগেই তার আর দেখা হয়নি। দুজন বাঙালী ছাত্রীও ছিল জাহাজে—একজন যাচ্ছে অক্সফোর্ড আর একজন ক্যাম্‌ব্রিজ।

স্কুমারের নিঃসংগ দিন এমনি করেই কাটতে লাগলো।

বাংলায় প্রাণ খুলে আড্ডা মারবার জন্যে হাঁপিয়ে উঠলো স্কুমার। চারপাশে অসংখ্য কালো লোক তার চোখে পড়েছে। কিন্তু সে ঠিক তাদের জাত বিচার করতে পারেনি। কাউকে কাউকে বাঙালী মনে ক'রে কথা বলতে গিয়ে জেনেছে, হয় সে মাদ্রাজী কিংবা সিলোনিজ, অথবা ইষ্ট আফ্রিকার লোক।

রাত দশটার পর সাধারণত রেষ্টুরেণ্টগুলো বন্ধ হয়ে যায়। তার আগে খাওয়া সেরে নিতে হয় স্কুমারকে। রাসেল স্কোয়ার টিউব ষ্টেশনের ঠিক সামনেই মার্চমণ্ট্ ষ্ট্রীট—তার একেবারে শেষ প্রান্তে ছোট একটি রেষ্টুরেণ্ট—নাম গ্রীণ কাফে। একদিন ভয়ে ভয়ে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় খাওয়া সেরে নিয়েছিল স্কুমার। গ্রীষ্মকালে লণ্ডনের সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা মানে খটখটে দিন—আলো পুরোপুরি মিলিয়ে যেতে

রাত্তির এগারোটা বাজে। তারপর রাত সাড়ে দশটায় তার আবার পেল ক্ষিধে। তখন রাসেল স্কোয়ারের চারপাশে খোলা রেষ্টুরেন্টের সন্ধানে ঘুরে ঘুরে হয়রাণ সুকুমার। সব গেছে বন্ধ হয়ে। সেইদিন সে আবিষ্কার করলো মার্চমণ্ট ষ্ট্রীটের এই গ্রীণ কাফে—এটা নাকি রাত বারোটা অবধি খোলা থাকে। বেঁচে গেল সুকুমার। তারপর থেকে সে রোজ রাত্তিরে এইখানেই খায়।

দু'টো ঘর এই রেষ্টুরেন্টের—একটা ঘর ছোট—সেখানে লোকে শুধু লাঞ্চ কিংবা সাপার খায়। আর একটা ঘর বেশ বড়—সাধারণত সেইখানেই ভীড় হয় বেশী—লোকে সে ঘরে চা আর সামান্য এটা ওটা খায়।

অনেক রাত্তিরে ছোট ঘরে মুর্গীর মাংস আর ভাত খেতে খেতে চমকে উঠলো সুকুমার— অনেকে পরিষ্কার বাংলায় কথা বলছে। ওদের সংগে কথা বলতেই হবে—যেন চলে না যায় ওরা। তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে নিয়ে পাশের ঘরে এলো সে।

একটা বড় টেবিলে চা আর স্যাণ্ডউইচ নিয়ে চার পাঁচজন বাঙ্গালী বসেছে। কয়েকজন মেয়েও রয়েছে তাদের সংগে। কারুর হাতে সিগ্রেট—কারুর মুখে পাইপ—কেউ কেউ টানছে সিগার।

আমিও বাঙালী, আস্তে আস্তে বললো সুকুমার।

পাইপে টান মেরে কোন একজন বললো, ও, বসুন।

আমি নতুন এসেছি—

দেখেই বুঝতে পারছি, কষ্ট ক'রে না বললেও চলতো।—হাসির সাড়া পড়ে গেল।

নতুন আসাটা যেন মস্ত বড়ো অপরাধ। ভয়ে ভয়ে সুকুমার এর ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগলো।

কি করতে আসা হয়েছে?

ইলেক্‌ট্রিক্যাল্ এনজিনিয়ারিং—

ও বাবা, ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দদাস মশাই! আমার নাম বিজন ঘোষ—, আমরা মানে যাদের এখানে দেখছেন এরা সকলেই ·' মানে ব্যারিষ্টরি পড়ি।

একজন হঠাৎ বলে ফেললো, কাপড-চোপড় দেশ থেকেই এনেছেন বুঝি?

বাধা দিল বিজন ঘোষ, রইলে চার বছর বিলেতে—অথচ এখনও দেখেই বুঝতে পারো না যে ওগুলো একেবারে বিশুদ্ধ স্বদেশী কাট্!

আবার হাসি। উঠে পড়বার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলো সুকুমার। খুব বাংলায় প্রাণ খুলে কথা বলা হয়েছে। এখন সে পালাতে পারলে বাঁচে। মনে মনে জলতে লাগলো সে।

যাক্ গে নতুন এসেছেন, সান্ত্বনা দিয়ে বললো একজন, প্রথম প্রথম একটু বাড়ীর জন্যে মন খারাপ করবে—তারপর একটা বান্ধবী-টান্ধবী জুটে গেলে সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

এইবার খুব গম্ভীর হয়ে সুকুমার বললো, দেখুন এখানে তো বান্ধবী জোটাতে আসিনি, এসেছি পড়াশুনো করতে—

সুকুমারকে বাধা দিয়ে হেঁকে উঠলো একজন, ওহে ঘোষ, শোন শোন ইনি কি বলছেন—ইনি এখানে পড়াশুনো করতে এসেছেন—যেন আমরা এসেছি খেলা করতে।

হেসে মাতব্বরী চালে বিজন ঘোষ বললো, বেশ তো, বেশ তো, দেখা যাক্ প্রভুর দৌড় কতদূর—ওকে জাহাজে তোলবার জন্যে হয়তো আমাদেরই হাঁপিয়ে উঠতে হবে—

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে 'আচ্ছা নমস্কার' ব'লে হঠাৎ সুকুমার বেরিয়ে গেল।

এই পাড়াটা সুকুমারের আর ভালো লাগছে না। এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি হয় উঠে যেতেই হবে। একটা ভদ্র ইংরেজ পরিবারে সে থাকতে চায়।

কিন্তু তার আগে বেশভূষার আগাগোড়া পরিবর্তন করতে হবে। কেন যে অত পয়সা খরচ করে দেশ থেকে এই কুৎসিৎ স্যুটগুলো সে আনতে গেল।

কাপড়-জামা নিয়ে মাথা ঘামানো কোন দিনও সুকুমারের স্বভাব নয়। কিন্তু এখানে সে বিদেশী—তার রঙ্ই সব সময় সেকথা ঘোষণা করে। এমনিতেই এদেশের লোকের মধ্যে সে বেমানান—তার ওপর অ তে রঙের অদ্ভুত পোষাক প'রে রাস্তায় চলাফেরা করতে আজকাল তার বড় বেশী সঙ্কোচ হয়।

ভাল দর্জির দোকানে গিয়ে এক সংগে দু'টো দামী স্যুটের অর্ডার দিলো সে। একটা ভালো ওয়াটার-প্রুফ্ কিনলো। মনের মতো গোটা কয়েক সার্ট আর ভাল ভাল টাই নিয়ে বাড়ি ফিরলো। তারপর সময় মতো মাকে কেবল্ পাঠালো কাপড়-জামার জন্যে অবিলম্বে পাঁচশো টাকা পাঠাও!

কেবল্ পেয়ে মা টাকা পাঠিয়ে দিলেন সংগে সংগে কিন্তু বেশ বিচলিত হ'য়ে সুকুমারকে লিখলেন, আবার জামাকাপড়ের তার কি দরকার পড়লো, এই তো এতো স্যুট সে সংগে করে নিয়ে এলো আসবার সময়।

ভালো ক'রে বুঝিয়ে সুকুমার মাকে এক লম্বা চিঠি লিখলো। লিখলো সে যা জামা-কাপড় নিয়ে এসেছে তা এখানে একেবারে অচল—ওরকম স্যুট এখানকার কুলি-মজুরেরাও পরে না।

মা কি বুঝলেন কে জানে, কিন্তু অনেকদিন সুকুমারকে আর চিঠি লিখলেন না।

দিন যেন আর কাটে না। বেশী কথা কোনদিনও বলে না সুকুমার—সকলের সংগে মিশতেও পারে না। তবু তার নিজেকে নিঃসংগ মনে হ'তে লাগলো। এখনও ক্লাশ আরম্ভ হ'তে মাসখানেক দেরী কিন্তু এর মধ্যেই কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে সুকুমার। 'নিউ ষ্টেটস্‌ম্যান এণ্ড নেশন' সাপ্তাহিক-এর গ্রাহক হয়েছে, রোজ সকালে অনেকক্ষণ মন দিয়ে টাইমস্ পত্রিকা পড়ে। ব্যালে, অপেরা আর কয়েকটা থিয়েটারও এর মধ্যে দেখে নিয়েছে সে। কিন্তু এই চঞ্চল কর্মব্যস্ত লণ্ডনে সে যেন একা। এদের সমাজে কেমন করে প্রবেশ করবে সে—কেমন করে মনের কথা শুনবে আর নিজের কথা বলবে। দেশে থাকতে এত একা তার কখনও নিজেকে মনে হয় নি—একা একা ঘুরে বেড়াতে আজকাল তার লজ্জা করে।

রাসেল্ স্কোয়ার থেকে 'ইণ্ডিয়া হাউস' খুব কাছে। হেঁটেই যাওয়া যায়। সস্তা বলে সুকুমার সেখানে লাঞ্চ্ খেতে যায় প্রায়ই। প্রত্যেক জাহাজেই নতুন ভারতীয় ছাত্র আসে। তাদের সংগে 'ইণ্ডিয়া হাউসে' দেখা হয় সুকুমারের। কিন্তু অনেককেই তার ভালো লাগে না। তারা শুধু কাঁদুনি গায়, কি হতচ্ছাড়া দেশ মশাই, এদেশে মানুষ আসে? লোকগুলো তো সব যন্ত্র—সারাদিন যেন ছুটছে—

যা বলেছেন মশাই, আর একজন বলে, বেটাদের প্রাণ ব'লে কিছু নেই, অতিথিকে খাতির করতে জানে না—বেনের জাত বেটারা—

সুকুমার তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে উঠে যায়। অনেক কিছুই তার এসব কথার উত্তরে বলতে ইচ্ছে করে কিন্তু পারে না। তার ভয় পাছে এরা মনে করে যে এই দু'দিনেই সে সাহেব হয়ে গেছে। হয়তো ওরা বড়লোক, ভালো না লাগলে কালকেই প্লেনে ফিরে যেতে পারে কিন্তু সুকুমারের তো তা করলে চলবে না—ভালো না লাগলেও তাকে যে জোর করে ভালো লাগাতেই হবে।

কিন্তু তিন গিনিতে বেড্ এণ্ড ব্রেকফাষ্ট আর কিছুতেই চালাতে পারছে না স্থকুমার—অনেক খরচ হ'য়ে গেছে এর মধ্যে। হয়তো মা মনে করছেন যে সে বিলেতে এসেই বাঁদর হয়ে গেছে। মার কথা মনে হলেই মন খারাপ হয়ে যায় তার। মাকে কেমন করে বোঝাবে সে যে এদের দেশের খরচের সংগে ভারতবর্ষের খরচের অনেক তফাৎ।

'ইণ্ডিয়া হাউসে' এডুকেশন ডিপার্টমেণ্টে হাজির হলো স্থকুমার—একটা ভালো থাকবার জায়গা তার চাই-ই চাই, ইংরেজ-পরিবারে থাকতে চায় সে। মিঃ নাগ তাকে ঠিকানা দিলেন একটা—একটু দূরে খুব ভদ্র পরিবার। স্থকুমার তখুনি ফোন করে দেখা করবার সময় ঠিক করে নিলো।

একদিনেই পাকা কথা হয়ে গেল। খুব খুশী হলো স্থকুমার—একেবারে নিশ্চিন্ত হলো। সাতদিনের নোটিশে রাসেল স্কোয়ারের তিন গিনির হোটেল ছাড়লো সে।

স্থন্দর সাজানো বড় ঘরে বসে শান্তির নিঃশ্বাস ফেললো স্থকুমার। একটু দূরে দেখা যায় আলেকজান্দ্রা প্যালেস—সন্ধ্যেবেলা তার চারপাশ ঘিরে জ্বলে ওঠে অসংখ্য আলো—দেয়ালী উৎসবের মতো মনে হয়—ওটা নাকি টেলিভিশনের ষ্টুডিও।

এ পাড়ার নাম ক্রাউচ্ এণ্ড—উঁচু-নীচু পাহাড়ে রাস্তা, কখনও উঠতে দম লাগে আবার কখনও সর্ সর্ ক'রে নেমে যেতে হয়। লণ্ডনে এই প্রথম স্থকুমারের বাড়ী-বাড়ী মনে হ'লো—এতদিন পর সে যেন ঘর খুঁজে পেয়েছে।

রাস্তার নাম হেসেল্মেয়ার রোড। লণ্ডনের উত্তর দিক্। ফিন্স্‌বেরী পার্ক টিউব ষ্টেশনে নেমে একতালা ২১২ নম্বর বাস নিতে

হয়—সেখান থেকে দেড পেনি মোটে ভাডা—কয়েক মিনিটের মধ্যেই সুকুমার বাড়ী এসে পৌছোয়।

প্রকাণ্ড বাড়ী। অনেক পরিবার। চার বন্ধু মি'লে খুব সম্প্রতি এ বাড়ী কিনেছে। তিন জন ইংরেজ আর একজন জার্মাণ মহিলা। যুদ্ধের সময় আর্থার কলকাতায় ছিল, বড ভালো লেগেছে তার সে-দেশ। তাই বাঙালী ছাত্রকে স্থান দিয়াছে তারা। আর্থারের স্ত্রীর নাম মার জোরী, দু'টো নিগ্রো পুষ্যি তাদের—একজনেব নাম জন্ আর একজনের নাম চার্লস। আর্থার ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে ভালো কাজ করে—বাপ ছিল অক্সফোর্ডের গ্রাজুয়েট, এদেশের পাখী সম্বন্ধে তার লেখা বহু বই আছে। আর্থার যখন কলকাতায় তখন তার বাপ মারা যায়—এ গল্প মারজোরীর মুখ থেকে শুনেছে সুকুমার।

তারপর হ'লো নোয়েল আর হেলেন। তাদের তিন বছরের মেয়ে—নাম মণিকা। মণিকার সংগে সুকুমারের খুব ভাব হয়েছে। নোয়েল বড় চাটার্ড একাউনটেণ্ট—অনেক আয় নাকি তার।

পিটার আর অড্রি। ছেলেমেয়ে নেই তাদের। পিটারও চাকরী করে ইনসিওরেন্স অফিসে—তার উচ্চারণ বুঝতে প্রাণ বেরিয়ে যায় সুকুমারের। সে কোন রকমে হাঁ না ক'রে পিটারকে এড়িয়ে পালিয়ে বেড়ায়।

জার্মাণ মহিলার নাম উরসুলা আর তার ছেলের নাম এডওয়ার্ড। ইংরেজের সংগে বিয়ে হয়েছিল উরসুলার। কিন্তু এখন ওদের আর মুখ দেখাদেখি নেই—ছেলেকে নিয়ে আলাদা হয়ে গেছে উরসুলা। ছেলের বয়েস সতেরো। বই বগলে নিয়ে রোজ স্কুলে যায়।

এক একজন দিয়েছে হাজার পাউণ্ড—চার হাজার পাউণ্ড দিয়ে এই বাড়ী কিনেছে এরা। এখনও একটা ঘর খালি আছে—কারুর বন্ধু-বান্ধব কিংবা অতিথি এলে থাকতে দেয়া হবে বলে।

বিদেশীর ঘরের ছেলে হলো সুকুমার। আনন্দ আর ধরে না তার। যা চেয়েছিল তাই পেয়েছে। খরচও এমন কিছু নয়—ব্যবসা করবার লোক নয় এরা—তাকে সপ্তাহে সপ্তাহে সমস্ত খাওয়া-দাওয়া ঘর ভাড়া নিয়ে দিতে হবে মোট দু' পাউণ্ড দশ শিলং। লাঞ্চ অবশ্য বাইরে খেতে হবে, তা না হলে ব্যাসান কুলোবে না। ছুটির দিনে বাড়ীতেই খাওয়া যাবে। এখন যখন সুকুমারের ছুটি তখন বাড়ীতেই লাঞ্চ খাবে ও—বললো হেলেন। দু' চারদিন খেয়ে উধাও হ'লো সুকুমার—বললো, এখন যখন ছুটি তখন শহর ঘুরে বেড়াই আব লাঞ্চটা বাইরেই খাবো—

আসলে শুধু মেয়েদের সংগে দুপুরে বাড়ী বসে খেতে লজ্জা হলো তার। সব পুরুষের যেন কাজ আছে আর ও যেন বেকার।

পাড়াটা ভাল ক'রে ঘুরে বেড়াতে লাগলো সে।

রাসেল স্কোয়ার হোটেলে ভরা, এ পাড়ায় হোটেল নেই একটাও—শুধু বাস করবার বাড়ী, রাসেল স্কোয়ারে কাজ, এখানে বিশ্রাম, সেখানে ব্যবসা, এখানে অবসর।

কাছেই প্রায়োরি পার্ক। লাঞ্চ খাবার আগে সেখানে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থাকে সুকুমার। প্রত্যেক লোক তার দিকে একবার তাকিয়ে যায়, ছোট ছেলেমেয়েরা বার বার ঘুরে ঘুরে দেখে।

লাঞ্চ খেয়ে সুকুমার হেঁটে হেঁটে অনেক দূর চ'লে যায়—হাইগেটে ওয়াটারলো পার্কে ঢুকে 'নিউ ষ্টেটসম্যান' পড়তে আরম্ভ করে। এ পার্কটা সব চেয়ে ভালো লাগে তার—উঁচু নিচু পা পাহাড়ের মতো মনে হয়।—সেখানে অনেকক্ষণ বসে থাকে সে।

তারপর চা খেয়ে আবার ঘুরে বেড়ায়। সব দেখতে হবে তাকে—লণ্ডনের প্রত্যেক অলি-গলি চিনতে হবে—অনেক মানুষের সংগে আলাপ করতে হবে—সমস্ত তথ্য জানতে হবে। এই প্রথম সুকুমারের

দুঃখ হ'লো—কতদিনই বা এদেশে থাকবে সে! সময় বড় কম—মোট চার বছর।

এ বাড়ীর সমস্ত বর্ণনা দিয়ে মাকে আবার সে লম্বা চিঠি লিখলো।

আস্তে আস্তে গরম কমে এলো। গম্ভীর শরৎ বহন ক'রে নিয়ে এলো শীতের ইংগীত। কয়েকদিনের মধ্যেই প্রকৃতির রূপ গেল বদলে—এই ঋতুর পরিবর্তন স্পষ্ট চোখে পড়ে। যেন হাজার অনিচ্ছায় ঝরে পড়লো পাতাগুলি—বোবা ন্যাড়া গাছ নিদারুণ আশঙ্কায় ভয়ে গুম্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

শীত আসছে। শরৎ সে কথা ঘোষণা করলো। সাড়া পড়লো ঘরে ঘরে। বউরা স্বামীর পুল্‌ওভার বোনা তাড়াতাড়ি শেষ করলো—গ্লাব্‌স্‌, স্কার্ফ খুঁজে রাখলো—কাচতে দিল ওভার-কোট। লোকের মুখে মুখে বার বার ধ্বনিত হ'লো এক কথা, শীত আসছে—

এবার ভারী ঠাণ্ডা পড়বে মনে হয়—

কে বলতে পারে সে কথা?

উঃ, আবার সেই শীত!

সুকুমারের গরম ভালো লাগেনা শুনে মারজোরী অড্রি হেলেন আর্থার পিটাব নোয়েল উরসুলা যেন প্রচণ্ড ধাক্কা খেল।

সে কি? আর্থার তার পিঠ চাপড়ে বললো, আমি ভেবেছিলাম তোমাদের দেশের ওয়েদাব পেয়ে ভারী খুশী তুমি—

ও ওয়েদার এড়াতেই তো এদেশে এসেছি, এই কদিনেই বেশ কথা বলতে শিখেছে সুকুমার।

সবাই যখন শীতের জন্যে সাবধান হচ্ছে—সুকুমার তখন খুশী হ'য়ে ভাবছে দেখা যাক্ শীত তাকে কাবু করতে পারে কি-না। ইংলণ্ডের সব কিছুকেই সে যেন জয় করে নিতে চায়।

বাড়ীর পিছনের উঠোনে ফুলের বাগান করেছে এরা। ছুটির দিনে

রোদ্দ্‌র উঠলে সবাই সেখানে জটলা করে। মণিকা আর জন্‌কে নিয়ে হৈ হৈ করে সুকুমার, চার্লস বড় ছোট, মারজোরী তাকে কোল থেকে নামায় না। জন্‌, খাঁটী নিগ্রো—ষণ্ডামার্কা চেহারা, মণিকার সংগে সব সময় মারামারি করতে চায়—সমান বয়স দু'জনের। সুকুমারের কাছে মণিকা থাকলে নিশ্চিন্ত হয় হেলেন—জানে সে ঠেকাবে জন্‌কে। ওদিকে মারজোরীও চোখ রাখে সুকুমারের ওপর, দেখতে চায় সে কাকে বেশী আদর করছে।

চকলেট খায় না সুকুমার—এতদিনে তার চকলেট বিলোবার লোক হ'লো। মারজোরী জনের চকলেট থেকে নিজে কিছু ভাগ নেয় কিন্তু হেলেন বলে, নিজের জন্যে কিছু রাখো সুকুমার—শীতের দেশে চকলেট খাওয়া ভালো।

সুকুমার হাসে, উত্তর দেয় না। হেলেনের স্বর বড় স্নেহমাখা মনে হয় আর দেশের কথা মনে পড়ে যায় সুকুমারের।

অত কথায় কথায় দেশের কথা মনে পড়ে গেলে চলবে না। দেশ তার চিরকালের কিন্তু ইংলণ্ড মাত্র চার বছরের! দেশে তাকে ফিরে যেতেই হবে একদিন কিন্তু হয় তো এখানে আর জীবনেও আসা হবে না। তাই সুকুমার ঠিক করলো মন শক্ত করতে হবে, এই চার বছর পিছনে তাকানো নয়—আঁজলা ভ'রে তুলে নিতে হবে এদেশের মণিকণিকা! একেবারে নতুন মানুষ হয়ে উঠতে চাইলো সুকুমার।

সকাল আটটায় টং টং ক'রে ব্রেক ফাষ্টের ঘণ্টা বাজে। আজ কার পালা কে জানে! এক একদিন এক এক বউ-এর ওপর ভার পড়ে—যারই পালা হোক না কেন স্বামীও ভোরে স্ত্রীর সংগে উঠে তাকে সাহায্য করে।

দাড়ি কামিয়ে ফিটফাট হ'য়ে সুকুমার নিচে নেমে আসে। সকলকে মুচকি হেসে বলে, গুড্‌ মর্ণিং। তারপর টাইমস পত্রিকা খুলে ব্রেক-

ফাষ্ট খায়। খাবার ঘরেই রয়েছে রেডিও, সেখানকার খবরও কানে আসে সুকুমারের। খুব মন দিয়ে বি বি-সি প্রোগ্রাম শোনে সুকুমার—উচ্চারণ সংশোধন করবার ওটা হ'লো শ্রেষ্ঠ যন্ত্র।

ছেলেদের সকালে বড় তাড়াতাড়ি—কোনরকমে ব্রেক ফাষ্ট খেয়ে যে যার দৌড় মারে অফিসে। সুকুমার কাগজ খুলে মণিকাকে কোলে নিয়ে অনেকক্ষণ ব'সে থাকে সে-ঘরে। বউরা ঘরের কাজ শেষ করে—সবই পালা ক'রে। কোনদিন অড্রি ঘর পরিষ্কার করে, হেলেন ব্রেকফাষ্ট তৈরী করে আর মারজোরী ডিনার রাঁধে।

খাবার ঘর থেকে সুকুমার নিজের ঘরে যায়। তারপর বেরিয়ে যায় রেনকোট হাতে নিয়ে। বাড়ী ফিরে আসে প্রায় সন্ধ্যেবেলা—ঠিক সাতটায় ডিনারের ঘণ্টা বাজে। ডিনারের পর সকলের প্রচুর অবসর—রাত এগারোটা অবধি লাউঞ্জে ব'সে গল্প চলে—বি-বি-সি শোনা হয়—গ্রামফোন বাজে। সুকুমার খুব সতর্ক হ'য়ে প্রত্যেকের প্রত্যেকটি কথা শোনে—ইংরেজের মতো ইংরেজী শিখতেই হবে তাকে।

শনি-রবিবারে লাঞ্চ্ও সবাই বাড়ীতে খায়। ছেলেরা ঠিক সময় ফিরে আসে—সুকুমারও ব'সে যায়। শনি-রবিবার সে বাড়ী থেকে একেবারেই বেরোয় না। কারণ উইক-এণ্ডে সাধারণত অনেক অতিথি আসে—এদের কারুর না কারুর বন্ধু—নতুন লোকের সংগে দেখা করে নতুন কথা শোনে সুকুমার, কেউ কেউ আবার দু'দিনের জন্যে উইক-এণ্ডে বাইরেও চ'লে যায়।

সুকুমারকে এদের মধ্যে দেখে অতিথিদের মধ্যে কেউ কেউ একটু অবাক হয়। তারপর আলাপ হ'লে তাকে ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করে। সে ভেবে ভেবে আস্তে আস্তে তাদের কৌতূহল দমন করবার চেষ্টা করে।

সুকুমার অল্প কয়েকদিনেই মন জয় ক'রে নিল সকলের। এদের

মধ্যে নিজেকে ভালো ক'রে মানিয়ে নিলো—তাকে আর কেউ ভারতীয় কিংবা পরের ছেলে ব'লে ধরে না— সে যেন এ পরিবারেরই একজন।

নতুন মানুষ হ'য়ে উঠতে লাগলো সুকুমার।

আর্থার? ডিনারের সময় সুকুমার বললো একদিন, শীতের সময়ও আমি রোজ চান করবো কিন্তু—

বেশ তো, হা-হা ক'রে হেসে বললো আর্থার, একথা বলবার কি দরকার?

তোমরা রোজ চান কর না কি-না তাই ভাবলাম, হয় তো শীতকালে চানের বন্দোবস্তই থাকবে না—

অড্রি বললো, শীতটা পড়ুক না আগে, তখন আমরা দেখবো তোমার মত বদলায় কি-না—

দেখো, হেসে বললো সুকুমার।

একটা কথা সুকুমার, কাঁটা-চামচ নামিয়ে রেখে আর্থার বললো, এই শনিবার বাড়ী থাকবে?

হ্যাঁ, কেন?

আমাদের এখানে একটা সোশ্যাল্ হবে—

খুশী হ'য়েই থাকবো আমি।

শুধু থাকলে চলবে না—তোমাকে একটা মজার গল্প বলতে হবে।

এই সর্বনাশ—কি গল্প?

যা-হয়—তুমি হবে ভারতের প্রতিনিধি সেদিন!

এই সর্বনাশ, সুকুমার বেশ ঘাবড়ে গেল।

শনিবার বিকেল পাঁচটা থেকে লোক আসতে আরম্ভ করলো। অনেক ছেলেমেয়ে—ওদের শোনাবার জন্যে কি গল্প বলবে সুকুমার!

কিছুই ভাবা হয় নি যে ছাই, যতই লোক আসে সে ততই ঝিমিয়ে যায়। আজ তার মান-সম্ভ্রম সব যাবে, অত লোকের মাঝে একেবারে বোকা ব'নে যাবে ও—তার চেয়ে কাজের ছুতো করে কোথাও পালিয়ে গেলে হ'তো।

লাউঞ্জে জড়া হলো সবাই। সুকুমারও গুটি গুটি এসে কোণায় একটা চেয়ার নিয়ে বসলো—তার পাশে এসে বসলে একটি অল্পবয়সী মেয়ে। আলাপ করিয়ে দেবার কেউ নেই—নিচে খাবার করা নিয়ে ব্যস্ত সবাই। মাঝে মাঝে কেউ না কেউ এসে শুধু ব'লে যাচ্ছে, ব'সে পড় যে-যার—ঠিক সাড়ে পাঁচটায় আরম্ভ করবো আমরা—

তুমি ছাত্রী? পাশের মেয়েটিকে সুকুমার জিজ্ঞেস করলো।

না, ও হেসে বললো, আমি অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেসে কাজ করি—তুমি ছাত্র বুঝি?

হ্যাঁ।

কিসের?

ইলেক্ট্রিক্যাল এনজিনিয়ারিং।

ও বাবা, কতদিন আছো এদেশে?

মাস তিনেক।

কেমন লাগছে এ দেশ?

তিন মাসে আর কি বলবো? একটু হেসে সুকুমার বললো, তোমাদের জাতকে তিন বছরেও বুঝতে পারবো বলে তো মনে হয় না।

খিল্ খিল্ করে হেসে মেয়েটি বললো, চেষ্টা কর।

দেখা যাক্, পকেট থেকে সিগ্রেট বের করে মেয়েটির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সুকুমার বললো, খাও!

না, ধন্যবাদ, আমি খাই না।

সিগ্রেট ধরিয়ে সুকুমার বললো, আগে তোমাকে তো কখনও এ বাড়ীতে দেখি নি—

না, এরা তো সবে এ বাড়ী কিনেছে, অড্রিদের আগের বাড়ীতে আমি প্রায়ই যেতাম—আমার মা অড্রির মার বন্ধু ছিলেন।

তোমার মা'ও এসেছেন নাকি আজ?

অনেকদিন আগে তিনি মারা গেছেন।

আর বাবা?

তারই সংগে থাকি আমি।

কয়েক মিনিট চুপচাপ।

মেয়েটি এবার জিজ্ঞেস করলো, কতদিন থাকবে এদেশে?

চার বছর।

ও বাবা, অতদিন থাকতে পারবে?

বরাবর থাকতেও আমার আপত্তি নেই।

খুব জোরে হেসে মেয়েটি বললো, যাক্ তা'হলে তিন মাসেই আমাদের দেশ ভালো লেগেছে তোমার!

হেসে সুকুমার বললো, আমার নাম সুকুমার—তোমার?

পামেলা।

পামেলা কি?

সুইট।

পামেলা সুইট—বাঃ বেশ মিষ্টি তো।

ওই নাম নিয়ে সবাই আমাকে ঠাট্টা করে।

আমি কিন্তু ঠাট্টা করছি না মোটেই।

তোমার নাম কি বললে যেন?

সুকুমার।

সুকুমার কি?

সে অনেক বড়, তুমি মনে রাখতে পারবে না—

হৈ হৈ ক'রে চায়ের সরঞ্জাম আর খাবার নিয়ে এলো মারজোরী, অড্রি, হেলেন, উরসুলা, এডওয়ার্ড, আর্থার, নোয়েল, আর পিটার। ঘড়িতে বেজেছে ঠিক সাড়ে পাঁচটা। এতক্ষণ পামেলার সংগে গল্প করে সুকুমার নিজের কথা ভুলে ছিল। ওদের দেখে আবার তার মনে পড়ে গেল সেই গল্প বলবার কথা—কি বলা যায়। ও মাথা নীচু করে ভাবতে লাগলো।

চা খাওয়া আরম্ভ হ'লো—সংগে মাছের স্যাণ্ডউইচ, কেক্ আরও কত কি, সুকুমার সে-সব খাবারের নামও জানে না। সবাই নানা রকম গল্প করছে—সুকুমারও কথা ব'লে যাচ্ছে পামেলার সংগে।

চায়ের পাট চুকতে প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগলো। তারপর যে-যার গল্প করতে লাগলো—এই হ'লো এদের সোস্যাল।

আর্থার, সুকুমার বললো, দু' একটা রেকর্ড বাজাবো নাকি ?

না না, বল গল্প, চেঁচিয়ে উঠলো আর্থার, এবার সুকুমার আমাদের ভারতবর্ষের হাসির গল্প বলবে—

পামেলা বললো, ইংরেজীতে বল।

সুকুমার ভেবেছিল গ্রামফোন বাজিয়ে এদের ব্যাপারটা ভুলিয়ে দেবো—তা না উল্টে মনে পড়িয়ে দিল। এখন কিছু একটা না বললে মুস্কিল—সবাই চুপ ক'রে অপেক্ষা করছে তার কথা শোনবার জন্যে। যাক্‌গে যা হয় হবে—পামেলার সংগে অনেকক্ষণ কথা বলে সাহস বেড়েছে তার। তবু এত লোকের সামনে কি গল্প বলবে সে! একবার মাথা চুলকে, বার কয়েক ঢোঁক গিলে সুকুমার আরম্ভ করলো—

একবার কুচবিহারের মহারাজার প্রাসাদে আমি প্রায় আধ ঘণ্টা ধ'রে বেহালা বাজিয়েছিলাম। বাজানো শেষ হবার পর মহারাজা

আসন ছেড়ে আমার পাশে এসে হাত ধরে বললেন, আমি বহু ভালো ভালো বাজিয়ের বাজনা শুনেছি—

বলুন মহারাজা বলুন!

আমি স্পেনের শ্রেষ্ঠ গিটার বাজিয়ের গিটার শুনেছি—

বলুন!

আমি ইংলণ্ডের নাম-করা পিয়ানো বাজিয়ের পিয়ানো শুনেছি—

তারপর? তারপর? গর্বে আমার বুক ফুলে উঠলো।

আমি আমেরিকান বাজিয়ের ব্যাঞ্জোও শুনেছি—

হ্যাঁ হ্যাঁ—

কিন্তু তারা কেউ তোমার মতো—

বলুন মহারাজা—

তারা কেউ তোমার মতো এত বেশী ঘামেনি, ব'লেই সুকুমার ধপ করে বসে পড়লো। সকলের হাসি থামতে প্রায় পাঁচ মিনিট লাগলো।

পামেলা বললো, উঃ এত হাসাতে পার তুমি!

আর একটা, আর্থার চেঁচিয়ে উঠলো, সুকুমার আর একটা গল্প বল—

সুকুমারের ভয় কেটে গেছে, আর্থারের কথা শুনে সে আবার উঠে দাঁড়ালো, আমি ছেলেবেলায় খুব শান্ত ছেলে ছিলাম, কত শান্ত, এ গল্পটা শুনলেই তোমরা বুঝতে পারবে। একবার কাগজে বার হ'লো যে, দিন পনেরোর মধ্যে নাকি কলকাতায় খুব ভূমিকম্প হবে; মা বিশেষ ব্যস্ত হ'য়ে কলকাতার বাইরে আমার এক মাসিমার বাড়ী আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। পনেরো দিন হয়ে গেল কিন্তু ভূমিকম্প হলো না। তখন মাসি আমাকে লোক দিয়ে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন—আর আমার মাকে দিলেন একটা ছোট চিঠি তাতে শুধু দু' লাইন লেখা ছিল, ভবিষ্যতে সুকুমারের বদলে ভূমিকম্প আমার এখানে পাঠিও—

আবার হাসি! আর কারুর দিকে দেখলো না স্বকুমার, শুধু দেখলো পামেলা হেসে যেন গড়িয়ে পড়ছে।

এত দুষ্টু ছিলে তুমি!

গম্ভীর হয়ে গালে হাত দিয়ে বসে রইলো স্বকুমার। সে যেন আজ সন্ধ্যার এই জলসার নায়ক। এবার নানারকম খেলা আরম্ভ হলো—কোন খেলাই জানতো না স্বকুমার—পামেলার কাছ থেকে সব খেলা শিখে নিলো। কিছুক্ষণের মধ্যে খেলাও ফুরোলো। তখন যে-যার গল্প করতে লাগলো। কেউ কেউ গেল বাড়ীটা ঘুরে দেখতে।

তুমি তো এ বাড়ী দেখ নি পামেলা?

না।

চলো, ঘুরে দেখবে?

আপত্তি নেই।

ওরা দু'জনে উঠে দাঁড়ালো। কেউ দেখছে না কিন্তু ওদের দিকে।

আমার ঘরটাই আগে দেখা যাক্ কি বল?

চল।

স্বকুমারের ঘরে এসে পামেলা জানলা দিয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো আলেকজান্দ্রা প্যালেসের দিকে। অন্ধকার জমা হয়েছে আর জ্বলে উঠেছে প্রাসাদের আলোর সারি।

ও বাড়ীটা কি স্বকুমার?

আলেকজান্দ্রা প্যালেস—টেলিভিশন হয় ওখানে—ওদিকে কখনও যাও নি তুমি?

না, এদিকে এর আগে আসি নি—ভেতরে যাওয়া যায় নাকি?

হুঁ, আমি যদিও যাইনি এখনো।

কী সুন্দর দেখাচ্ছে না?

আমি রোজ ওর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকি।

যাহোক্, পামেলা মুখ ফিরিয়ে বললো, কই তোমার বেহালাটা দেখি ?

বেহালা ? অবাক হ'য়ে স্বকুমার বললো, বেহালা কোথায় পাবো ?

সে কি ? এই না বললে মহারাজার সামনে বাজিয়েছিল—এখানে বেহালা আননি বুঝি ?

হো হো ক'রে হেসে স্বকুমার বললো, আরে তুমি সেই গল্প সত্যি ভেবেছ নাকি, ও বাংলা পত্রিকায় প্রকাশিত তু'টো হাস্য-কৌতুক, হঠাৎ মনে পড়ে গেল তাই নিজের নামে চালিয়ে দিলাম ।

কী মিথ্যাবাদী তুমি ।

যাক্‌গে একটু ব'সো—গল্প করা যাক্ ।

ব'সে প'ড়ে পামেলা বললো, কোথায় ক্লাশ করতে যাও তুমি ?

এখনও ক্লাশ খোলেনি—যেতে হবে ফ্যারাডে হাউসে, রাসেল্ স্কোয়ারে।

আমারও লেখাপড়া করবার এত ইচ্ছে ছিল—

করলে না কেন ?

ইচ্ছে থাকলেই সব কাজ তো করা যায় না—আর একদিন বলবো তোমাকে যদি শুনতে চাও ।

নিশ্চয়ই, আবার কবে দেখা হবে তোমার সংগে ?

শনি-রবিবার আমি লণ্ডনে আসি না—ও তু'দিন আমার ছুটি—বাকি দিন লণ্ডনে আসতেই হয়, ন'টা থেকে সাড়ে পাঁচটা অবধি কাজ করি—সাড়ে সাতটা থেকে ফোনে আমাকে যে কোনদিনই পাবে—

বেশ আমি তোমাকে শীগ্‌গীরই ফোন করবো—বল তোমার ফোন নম্বর ?

কই কোথায় লিখবে ?

মাথায়, আমি কিছু ভুলি না পামেলা, তুমি বল ।

হেসে পামেলা বললো, বড় অহঙ্কার তোমার—আমার ফোন নম্বর হ'লো, গ্রীনিচ ১১১২—

বাঃ, এতো ভোলবার নয়—গ্রীনিচ এগারো-বারো!

ঠিক্!

ঝলমল করছে আলেক্জান্ড্রা প্যালেসের আলোর সারি। সেইদিকে তাকিয়ে ওরা দু'জন অনেকক্ষণ বসে রইলো। কেউ কোন কথা বললো না।

শুধু উরসুলার সংগে এখনও ভালো ক'রে আলাপ হয় নি সুকুমারের। সে বেচারী কাজ করে অক্সফোর্ডে—শনি-রবিবার এখানে এসে ছেলের সংগে কাটিয়ে যায়। ছেলে ছাড়া আর কেউ যেন থেকেও নেই উরসুলার। ওকে দেখলে মায়া লাগে সুকুমারের। এবার এলে ভালো করে আলাপ করতে হবে ওর সংগে। কত লোকের সংগে আলাপ করতে হবে যে।

রবিবার টেলিফোনের সামনে কয়েক মিনিট ধ'রে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবলো সুকুমার। ঠিক হবে কি? কি ভাববে ও? এখনও পুরো একদিনও হয় নি আলাপ হয়েছে। মন্ত্রচালিতের মতো ও ডায়েল্ করলো, গ্রীনিচ্ এগারো-বারো!

উত্তর এলো, গ্রীনিচ্ এগারো-বারো!

পামেলা?

সুকুমার?

হ্যাঁ।

কেমন আছো?

ভালো—তুমি?

সুকুমার শুধু হাসলো, কি করছ এখন?

লাঞ্চের বন্দোবস্ত করছি।

তারপর ?

নিজের কয়েকটা মোজা সেলাই ক'রে বাবার সার্টে বোতাম টাকতে হবে—

তারপর ?

তারপর ? হেসে পামেলা বললো, কেন সুকুমার ?

লণ্ডনে আসবে ?

আজ ?

না না, তোমার যদি অসুবিধা হয় তা হ'লে—

অসুবিধা কিছু হবে না তবে একটু দেরী হবে—ধ'রো সন্ধ্যে ছ'টা—

ঠিক আছে।

কোথায় দেখা করবো—তোমার বাড়ীতে ?

না না, এদের কিছু জানতে দিতে চায় না সুকুমার, ছবি দেখতে যাবো আজ—অক্সফোর্ড সার্কাস টিউব ষ্টেশনে ?

বেশ—ঠিক ছ'টায়—

ঠিক ছ'টায়, তারপর আমার সংগে খাবে—বুঝলে পামেলা।

অনেক ধন্যবাদ, সুকুমার।

সুকুমারের ক্লাশ আরম্ভ হ'লো অক্টোবরের প্রথমেই। নিশ্বাস ফেলবার সময় নেই তার এখন। সকাল বেলা ব্রেকফাষ্ট খেয়ে ২১২ নম্বর বাস ধরে ফিন্‌স্‌বেরী পার্ক টিউব ষ্টেশন থেকে চার পেনির টিকিট কেটে আসে রাসেল স্কোয়ারে। টিউব ষ্টেশন থেকে মিনিট দু'তিন হেঁটে সে আসে সাউদাম্পটন্ রো'র ওপর ফ্যারাডে হাউসে—এটা হ'লো তার কলেজ। ইণ্ডিয়া হাউস তার কলেজের খুব কাছে, কিন্তু সেখানে বড় একটা লাঞ্চ খেতে যায় না সুকুমার। ফ্যারাডে হাউসের সামনেই ভিক্টোরিয়া হাউস—সেখানে কাজ করে পিটার—সুকুমার প্রায়ই তার সংগে লাঞ্চ খায়। ছোট দিন, ক্লাশ শেষ করে বেরুতে বেরুতেই

অন্ধকার নামে—সুকুমার সোজা বাড়ী চলে আসে—সাতটায় ডিনারে হাজির থাকা চাই, যেদিন বাইরে খায় সেদিন কোন বউকে যথাসময়ে বলে দেয় আজ খাবো না, আর দেরী হলে বলে, খাবার ওভানে রেখে দিও—আজ দেরী হবে ফিরতে।

এতদিন পর সুকুমার বুঝতে পারলো কেন সব সময় ছুটে চলে লণ্ডনের লোক। এক মিনিটও সময় থাকে না—এত কাজ যে লোকের সংগে দেখা করতে হ'লে ঘড়ি ঘণ্টা দিনক্ষণ ঠিক ক'রে যেতে হয়।

অনেক পড়তে হবে সুকুমারকে। কলকাতার অনার্স গ্র্যাজুয়েট হয়ে সে ভেবেছিল খুব কঠিন হবে না তার পক্ষে কিন্তু কয়েকটি লেক্‌চার শুনে সে বুঝলো তাকে আরও পড়তে হবে।

এত পড়তে হবে যে বাইরের অন্যান্য বই পড়বার বড একটা সময় থাকবে না তার। মহা মুস্কিল—সুকুমারের হলো দুঃখ। বেশ ছিল কলেজ খোলবার আগে অবধি—এখন স্বাধীন পড়াশুনো বন্ধ তার। অথচ মাঝে মাঝে পামেলার সংগে দেখা না করলে চলে না—আরও কত কাজ আছে কিন্তু সময় কই? সময় নেই।

সকাল থেকে প্রায় সন্ধ্যে অবধি ক্লাশ—তারপর ছুটে বাড়ী আসা—খাওয়া-দাওয়ার পর পড়াশুনো—কিন্তু সে কতক্ষণই বা! চিঠি লেখার সময় পায় না সুকুমার। কিন্তু তবু যেন খুশীই হলো সে—ভারতীয় হলেও এবার সে ইংরেজের মতোই ব্যস্ত হয়ে উঠতে পেয়েছে।

পাসপোর্ট হাতে নিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ায় সুকুমার। সে—ছবির সংগে নিজের চেহারা মিলিয়ে দেখে। কী পরিবর্তন হয়েছে তার এই কয়েক মাসে—কত বদলে গেছে চেহারা। মুখে এসেছে দীপ্তি—সমস্ত দেহে কোথাও ক্লান্তির চিহ্নমাত্র নেই। সিগ্রেটে টান মেরে কিছুক্ষণ আয়নার সামনে সে দাঁড়িয়ে থাকে।

আর্থার, একদিন রাত্তিরে খাবার সময় সুকুমার বললো, ভালো ইংরেজী শিখতে চাই।

শেখো!

উচ্চারণ ভালো করবো কেমন ক'রে?

হেসে পিটার বললো, খুব সাবধান আমার উচ্চারণ কিন্তু কক্‌নি—

মারজোরী বললো, থাকতে থাকতে সব ঠিক হয়ে যাবে সুকুমার—

তুমি তো বেশ ভালো ইংরেজী বল, হেলেন সুপ্‌-প্লেট এগিয়ে দিল সুকুমারের সামনে। খোসামোদে কে না খুশী হয়—তাই তো হেলেনকে অত ভালো লাগে সুকুমারের!

আমি ইংরেজী আদব-কায়দাও পুরোপুরি শিখতে চাই?

এইবার কথা বললো অড্রি, তা হলে তুমি হতাশ হবে—ওটা আমরা একেবারেই জানি না—

নোয়েল কম কথার লোক। সে শুধু বললো, যুদ্ধের পর খুব কম লোক আদব-কায়দা মানে, যারা যুদ্ধে গিয়েছিল তারা তো কোন কিছুরই ধার ধারে না—

তোমরা নাচতে যাও না?

খুব জোরে হেসে হেলেন বললো, সময় কোথায়—ঘরের কাজ করে মেয়ের ঝক্কি ঘাড়ে নিতে হয়—

কিন্তু অড্রি?

পয়সা নেই সুকুমার, বিয়ের আগে অনেক নেচেছি বন্ধু-বান্ধবের সংগে, এখন স্বামীর পয়সা জমানো ভালো গৃহিনীর একমাত্র কাজ।

দেশে থাকতে শুনেছিলাম ডিনারের সংগে তোমরা মদ খাও—

মারজোরী বললো, যারা খুব বড়লোক তারা হয় তো খায়, ঠিক জানি না, আমরা মদ খাই বছরে একবার—বড়দিনের সময়—

সুকুমার চুপ ক'রে ল্যাম্ব্‌রোষ্টে ছুরী চালাতে লাগলো। তারপর

হঠাৎ মাথা তুলে বললো, আচ্ছা আমার কোন বন্ধু-বান্ধব এখানে দেখা করতে আসতে পারে ?

নিশ্চয়ই, আর্থার বললো, আমাদের সকলেরই তো বন্ধু আসে !

সে যদি মাঝে মাঝে চা কিংবা সাপার খায় তার জন্যে আলাদা কত দিতে হবে ?

কি বলছো সুকুমার, হেলেন বললো, তোমার বন্ধু—

আর্থার জিজ্ঞেস করলো মুচকি হেসে, বন্ধুটি কে ?

সে ইণ্ডিয়ান নয়।

পামেলা নাকি ?

লজ্জায় মাথা নিচু করলো সুকুমার। যা ভয় করেছিল তাই হয়েছে—এরা সব জানে তা হলে।

তুমি লজ্জা পাচ্ছ কেন ? মারজোরী আর্থারকে তাড়া দিল, তুমি কোথায় কি বলতে হয় জানো না আর্থার।

কোন রকমে খাওয়া শেষ করে সুকুমার পালিয়ে এলো নিজের ঘরে।

একটু পরেই আর্থার এসে দরজায় টোকা মারতে মারতে চেঁচাতে লাগলো, হে সুকুমার, হেই সুকুমার, টেলিফোন—গলাটা পামেলার মতো মনে হচ্ছে যেন—

সুকুমারকে আবার নিচে নেমে আসতে হ'লো।

এডওয়ার্ডের বয়েস সতেরো। মা জার্মান বাবা ইংরেজ। দুই জাতের গুণগুলি নিয়ে বেড়ে উঠছে সে—একটি বান্ধবী আছে তার, নাম এলিজাবেথ—তার বয়েস কিন্তু কুড়ি। শনি কিংবা রবিবারে মা'কে চুম্বন ক'রে সতেরো বছরের এডওয়ার্ড যায় কুড়ি বছরের এলিজাবেথের সংগে প্রেম করতে। যাবার সময় উরসুলা

বেশ জোরে জোরে ছেলেকে বলে, হ্যাভ্ এ নাইস্ টাইম্। এলিজাবেথকে উরসুলাও ভালবাসে খুব। ছেলের সব কিছুই ভালো লাগে তার। আর কে-ই বা আছে তার—তাকে মানুষ করা ছাড়া আর কোন সাধ নেই উরসুলার।

ওর বয়স যখন আট, জানো সুকুমার তখন ওর বাপ আমাকে ছেড়ে যায়।

কেন?

সে এক লম্বা গল্প শুনবে?

যদি তোমার কোন আপত্তি না থাকে?

না না, আপত্তি থাকবে কেন? কাকেই বা বলি সে গল্প—সিগ্রেট খাবে সুকুমার?

আরে তুমি আমার সিগ্রেট খাও—সুন্দর ছেলে কিন্তু তোমার এডওয়ার্ড।

সত্যি ওকে ভালো লাগে তোমার? ওকে বড় করে দিয়েই আমি চোখ বুজবো সুকুমার, আবেশে উরসুলা সত্যি চোখ বোজে।

তারপর সিগ্রেটে দু একটা টান দিয়েই চোখ জ্বলে ওঠে তার, অথচ এত বড় বদমাইস ওর বাপ যে ছেলের কথা একবার ভাবলে না। আমার কথা ভাবা দূরে থাক—এক বার-মেডকে নিয়ে সব ভুলে গেল, আর জানো সুকুমার, একটু আস্তে বললো উরসুলা, ওর চোখ দু'টো ছিল ঠিক তোমার মতো—

হেসে সুকুমার বললো, তাই নাকি?

দেখ, আমি কিছুই জানতাম না বার-মেডের সংগে ওর এই নোংরা ব্যাপারের কথা। আমাদের পুরোণো বুড়ো দুধওলা আমাকে বললো, স্বামীকে সামলাও, ভেরোনিকাকে নিয়ে ও পাগল। আইভ্যান্ বললো, ওকে আমি বিয়ে করবো। আমার কথা ভাবলো না, ছেলের কথা

ভাবলো না, ভেরোনিকাকে সত্যি ও ভালবাসলো। একদিন, ছেড়ে চলে গেল আমাদের—খিল্ খিল্ ক'রে অনেকক্ষণ ধরে হাসলো উরসুলা, তারপর কি হ'লো জানো সুকুমার, ভেরোনিকা গাধটাকে কলা দেখিয়ে এক ইটালিয়ান হোটেলওয়ালার সংগে চম্পট দিলো—হা-হা-হা—এত বড় নির্লজ্জ যে তখন ও আবার ফিরে এসে বললো, আমি এসেছি—

তুমি কি করলে ?

দূর ক'রে দিলাম।

স্বামীকে দূর ক'রে দিলে ?

স্বামী ? মুখ্ বিকৃত করে বললো উরসুলা, ওর ভাগ্য ভালো যে আমার কাছে তখন পিস্তল ছিলো না—তা হ'লে সেদিন আমি ওকে গুলি করতাম—উরসুলার মুখ রাগে লাল হয়ে গেল।

এডওয়ার্ডকে মানুষ হতে হবে, ওরই জন্যে তো বেঁচে আছি আমি—বড় ভালো ছেঁলে না সুকুমার—

খুব ভালো ছেলে, ও বড় হবেই—

আহা, তোমার কথা সত্যি হোক্! চোখ বন্ধ করে উরসুলা বোধহয় এডওয়ার্ডের ভবিষ্যৎ কল্পনা করছিল।

এ বাড়ীর যে-ঘর এখনও খালি আছে অতিথির জন্যে সে-ঘর আর বেশী দিন খালি থাকবে না। নোয়েলের ফরাসী বন্ধু পলের মাসতুতো বোন ক্লোদ দু' চার দিনের মধ্যেই প্যারিস থেকে এসে পড়বে সে-ঘরে। হাইগেট স্কুলে ফরাসী শেখাবে সে—ওখান থেকে চাকরী ঠিক ক'রে আসছে। বছর খানেক লণ্ডনে থাকবে ক্লোদ। বাড়ীর সব ঘরগুলো ভরে যাবে তাহলে। এ বাড়ীতে থেকে সুকুমারের কেবলই দেশের একান্নবর্তী পরিবারের কথা মনে পড়ে।

সাড়ে পাঁচটায় ফ্যারাডে হাউস থেকে বেরিয়ে সাউদাম্পটন রো'র ওপর বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হ'লো সুকুমারকে—এত গাড়ী যায় এ সময় রাস্তা দিয়ে, পার হওয়া দায়! ব্লুমস্‌বেরী স্কোয়ারের পাশ দিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে সে এসে পড়লো টটন্‌হ্যাম কোর্ট রোড টিউব ষ্টেশনের কাছে। পৌনে ছ'টার সময় আজ আবার দেখা হবে পামেলার সংগে। এত ভীড় এখানে—হাজার লোক যে যার কাজে যাচ্ছে। পামেলার ছুটি হবে ঠিক সাড়ে পাঁচটায়, সোহো স্কোয়ারে অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস—সেখান থেকে এখানে আসতে বেশী সময় লাগে না—তবে যা ভীড়—টিউবে বেচারীর দম্ বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হবে। বেচারী পামেলা! হলদে জাম্পার আর নীল স্কার্টে এত সুন্দর দেখায় ওকে। ওর রেন্ কোটটিও নীল—পছন্দ আছে পামেলার। টানা টানা চোখ—সব সময় মুখে হাসি—ঠোঁটে একটু রঙ্—গলায় সরু নেকলেস্—সার্থক নাম ওর—পামেলা সুইট।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছো, সুকুমার?

এই যে পামেলা!

উঃ যা ভীড়—

চলো এখান থেকে পালাই—চা খাওয়া যাক আগে—যা তেষ্টা পেয়েছে আমার—

ভীড় ঠেলে সাবধানে ওরা চলতে লাগলো। ওদের দু'জনেরই ভয় পাছে একজন আর একজনকে হারিয়ে ফেলে।

একটা স্ন্যাক্-বারের ভেতরে এসে সুকুমার বললো, কি খাবে, কেক্ না স্যাণ্ডউইচ ?

কিছু না, শুধু এক কাপ চা—

কেক খাও একটা—এলে খেটেখুটে।

হেসে পামেলা বললো, আচ্ছা বল একটা স্যাণ্ডউইচ—

সুকুমার অর্ডার দিলো, টু টিজ এণ্ড টু স্যাণ্ডউইচেস প্লিজ—

তারপর দাম চুকিয়ে বললো, চারদিকে ভীড়, বসবার জায়গা নেই—এসো, এই কাউণ্টারের কাছে দাঁড়িয়ে তাডাতাড়ি খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ি—

তাই চলো।

চা খেতে খেতে সুকুমার বললো, কোথায় যাবে আজ পামেলা?

তুমি কি করবে?

আমাদের বাডী যাবে?

ও বাবা, অনেক দূর যে, বড় দেরী হয়ে যাবে না?

আচ্ছা, চলো তো এখান থেকে বার হই, তারপর ঠিক করা যাবে কি করবো।

স্ন্যাক্-বার থেকে ওরা আবার টটনহ্যাম্ কোর্ট রোডের ওপর এসে পড়লো। তারপর বাঁ দিকে বেঁকে নিউ অক্সফোর্ড স্ট্রীট ধরে চলতে লাগলো ব্লুমস্‌বেরী স্কোয়ারের দিকে।

শির্‌শির্ ক'রে শেষ শরতের হাওয়া দিচ্ছে। দীর্ঘকাল স্থায়ী গোধূলি আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে—শুধু পথিকের পায়ের শব্দ—কণ্ঠস্বর কানে আসছে না। পামেলা খুব আস্তে আস্তে পথ চলছে—প্রত্যেকটি দোকানের সাজানো নানা রকম জিনিষ মন দিয়ে দেখতে দেখতে।

চলো পামেলা, ব্লুমস্‌বেরী স্কোয়ারে বসে আজ গল্প করি।

চলো।

তারপর আমার সংগে সাপার খাবে?

রোজ রোজ পয়সা নষ্ট করো না, সুকুমার—আমি বাড়ী গিয়ে খাবো।

কিন্তু আমি যে বলে এসেছি আজ বাড়ীতে খাবো না।

তা হলে তুমি যা খুশী খেও, আমি তোমার সংগে বসে শুধু এক কাপ চা খাবো।

সে কি হয় ?

খুব হয়।

ব্লুমস্‌বেরী স্কোয়ারে তখন অল্প অল্প অন্ধকার নামছে। খালি বেঞ্চি খুব কম—ফিস্ ফিস্ ক'রে কথা বলছে অসংখ প্রেমিকের দল। পামেলার সংগে তাদের দিকে তাকিয়ে আজ সুকুমারের হঠাৎ লজ্জা করতে লাগলো। অথচ পামেলার ভ্রুক্ষেপও নেই কোন দিকে।

এই যে সুকুমার, একটা খালি বেঞ্চি দেখতে পেয়ে পামেলা বললো, এসো এখানে বসি।

না না, ওটাতে যাই চলো, স্কোয়ারের মাঝখানে গাছের তলায় আর একটা খালি বেঞ্চি দেখিয়ে সুকুমার এগিয়ে গেল।

অন্ধকার নামলো এবার ব্লুমস্‌বেরী স্কোয়ারে। ওরা দু'জনে পাশাপাশি কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলো।

শীত লাগছে, পামেলা ?

একটুও না—তোমার ?

আমার শীত লাগে না।

ফেব্রুয়ারী মাস আসুক তারপর দেখা যাবে তোমার দিশি রক্ত কত গরম—

দেখে নিও।

আজ ইচ্ছে করেই ছবি দেখতে কিংবা অন্য কোথাও যায় নি সুকুমার। মাসের শেষ। হাতে টাকা ফুরিয়ে এসেছে প্রায়—এখন একটু সাবধানে চলতে হবে। কিন্তু কিছু লাভ হবে কি তাতে ? লণ্ডন শহরে রাস্তায় বার হলেই আট-দশ টাকা বেরিয়ে যায়। আর আজ কোথাও ব'সে পামেলার সংগে অনেক কথা বলতে চাইছিলা সুকুমার। ওকে খুব ভালো করে জানতে চায় সে। কিন্তু বেচারীর কষ্ট হচ্ছে বোধহয় শীতে। কি কথা বলবে সুকুমার !

আমার সংগে দেখা করতে তোমার ভাল লাগে, পামেলা ?

তা' না হ'লে দেখা করবো কেন ?

আরও বেশী দেখা ক'রো আমার সংগে।

সময় পেলে শুধু তো তোমারই সংগে দেখা করি।

কেন ?

আর কেউ নেই আমার দেখা করবার।

তোমার বয়স কত পামেলা ?

ঠিক উনিশ—তোমার ?

তেইশ।

তোমাকে অনেক ছোট দেখায় কিন্তু।

তোমাকেও।

দূর, সবাই বলে আমাকে অনেক বড় দেখায়।

তারা ভুল বলে।

বড় অহঙ্কার তোমার—ভারতীয়রা এমন অহঙ্কারী হয় বুঝি ?

সব ইংরেজ মেয়ে তোমাব মতো ভালো হয় বুঝি ?

ধন্যবাদ, আজ প্রথম একজন অহঙ্কারী ভাবতীয়র মুখে শুন যে আমি ভালো।

আরও ভারতীয় দেখেছ নাকি ?

কখনও নয়—তা হ'লে ভারতীয় ছাড়া মিশতাম না।

কেন ?

বলবো না, তো হলে তোমার অহঙ্কার আরও বেড়ে যাবে, ব হেসে পামেলা বললো, খুব বুদ্ধি ওদের।

সব ভারতীয়ই সুকুমার নয়—

তার চেয়েও বুদ্ধিমান বুঝি ?

বাঃ, আমার সংগে মিশে তোমারও বদ্ধি খুলছে দেখছি।

তোমার সংগে মিশে মানে? খবরদার আমাকে বোকা ব'লো না।

ওহো ভুলে গিয়েছিলাম, ছেলেবেলায় বাংলায় পড়েছিলাম কানাকে কানা বলো না—খোঁড়াকে খোঁড়া বলো না—

উঠে দাঁড়িয়ে রাগের ভান ক'রে পামেলা বললো, আমি চললাম।

তার হাত ধ'রে বসিয়ে দিয়ে সুকুমার বললো, ব'সো খুব বুদ্ধিমতী তুমি—

সুকুমারের গালে বেশ জোরে টোকা মারলো পামেলা।

এইবার একদিন আমাদের বাড়ী চ'লো, পামেলা?

মুখ দেখতে চাই না তোমার আর—

বেশ, পেছন ফিরে কথা বলো।

বড় দুষ্টু তুমি, পামেলা হাসতে লাগলো।

কবে যাবে বলো?

আসছে শনিবার হবে না—বাবার কয়েকজন বন্ধু আসবে—তার পরের শনিবার—

বেশ—

দাঁড়াও লিখে রাখি—

পামেলা, তুমি বড় বেশী ভোলো।

ভুলবো না ব'লেই তো লিখে রাখছি—কিন্তু তোমাকেও একদিন যেতে হবে আমাদের বাড়ী।

তোমার বাবা আমার কথা জানেন?

হ্যাঁ।

শুনে কি বললেন তিনি?

তিনিই তো বললেন তোমাদের খুব বুদ্ধি আর সুন্দর ইংরেজী বল তোমরা।

ঠিক কথাই বলেছেন তিনি—তোমার বাবা কি করেন পামেলা?

ডেলি টেলিগ্রাফ পত্রিকায় চাকরী করেন—কবে যাবে তুমি আমাদের বাড়ী?

আসছে শনিবারের পরের শনিবার তুমি যখন আসবে তখন সেটা ঠিক করবো।

না আজই ঠিক করো—আমি লিখে রাখি ডায়রীতে—ধর যে-শনিবার আমি তোমাদেব ওখানে যাবো তার পরদিন রবিবারে?

তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে, পামেলা।

আরও দু'জন এসে বসলো সে বেঞ্চে। একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক আর তার সংগে এক মহিলা—স্ত্রী কি না কে জানে।

ক্ষিধে পেয়েছে, পামেলা?

না—তোমার ক্ষিধে পেলে খেয়ে নাও, আমি তো বলেছি বাড়ী গিয়ে খাবো।

তোমাকে খেতেই হবে আমার সংগে।

না না না।

সুকুমার উঠে দাঁড়িয়ে পামেলার হাত টেনে বললো, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ—ওঠো!

ব্লুমস্‌বেরী স্কোয়ার থেকে বেরিয়ে ওরা আবার এলো টটনহ্যাম্‌ কোর্ট রোডে। লায়ন্‌স্‌ কর্ণার হাউসে সস্তায় বেশ ভালো খাওয়া দেয়।

সে-রাত্তিরে অনেকক্ষণ ঘুম এলো না সুকুমারের।

আজ আর কিছুতেই পড়তে ইচ্ছে করছে না। বার কয়েক চেষ্টা করে ক্যাল্‌কুলাসের বই বন্ধ করলো সুকুমার। সিগ্রেট খেতে খেতে কিছুক্ষণ পায়চারী করলো। দোতালায় ঘর সুকুমারের—তার পাশেই হেলেন-নোয়েলের ঘর। সুকুমার আস্তে আস্তে তাদের দরজায় টোকা মারলো।

এসো।

সুকুমার ভেতরে ঢুকে দেখে দুজনে মুখোমুখী চুপ করে বসে বই পড়ছে।

মণিকাকে দেখতে এলাম—ও জেগে আছে হেলেন?

না—কিন্তু তার কথা শেষ হবার আগেই ধড়্‌মড়্‌ করে কটের ওপর উঠে বসলো মণিকা, সুকুমার চকলেট প্লিজ্‌—

ছিঃ মণিকা, লজ্জায় মুখ লাল হয়ে গেল হেলেনের, ও রকম করে চকলেট চাইতে হয় না।

হেসে নোয়েল বললো, ওকে নষ্ট করে দিচ্ছ, সুকুমার—খালি চকলেট দিয়ে দিযে লোভ বাড়িয়ে দিযেছ।

ওদের কারুর কথায় কান না দিয়ে মণিকাকে আদর করে সুকুমার বললো, কা'ল তোমাকে এক বাক্স চকলেট দেব, মণিকা—

ঠিক দিও—ভুলো না কিন্তু।

ঠিক দেব।

ছি ছি, মণিকা কী ভীষণ অসভ্য হয়েছে দেখছ, নোয়েল—

শোন, সুকুমার।

শুনছি, হেসে সুকুমার বললো, ও শুধু আমার কাছেই চায় আর কারুর কাছে চায় না—আমি ওর বয়-ফ্রেণ্ড, কি-না!

এবার হাসতে আরম্ভ করলো স্বামী-স্ত্রী!

বাড়ীতে সুকুমার লক্ষ্য করেছে নোয়েলকে সবাই বেশ সমীহ করে। এদের মধ্যে তার অবস্থা সব চেয়ে ভালো, মাসে তার আয় নাকি দেড় হাজার টাকা। সেই জন্যে হেলেনেরও খাতির এ বাড়ীতে একটু বেশী। নোয়েল চার্টার্ড একাউণ্টেণ্ট—তাই বাড়ীর হিসাব পত্র রাখে। সংসার খরচের সমস্ত টাকা প্রত্যেকে সপ্তাহে তার হাতেই দেয়। সুকুমারকেও ভাড়া দিতে হয় নোয়েলকে। মোটা একটা

খাতা করেছে নোয়েল—সেখানে লেখা আছে এদের সকলের নাম।

ওদের ঘর থেকে বেরিয়ে তেতালায় উঠলো সুকুমার। এ-তালায় দু'টো বড় বড় ঘর—একটাতে অড্রি-পিটার, অন্যটাতে আর্থার-মারজোরী আর জন-চার্লস।

দরজায় টোকা মেরে সুকুমার বললো, আসতে পারি অড্রি? দু'জনে একসংগে ব'লে উঠলো, এসো এসো সুকুমার।

এঘরেও একটা রেডিও আছে। পশমের কি একটা বুনতে বুনতে অড্রি তাই শুনছে। আর খবরের কাগজ খুলে চুপ করে বসে পিটার মুচকি মুচকি হাসছে।

কি সুকুমার, কক্‌নি উচ্চারণে পিটার বললো, আজ পড়াশুনো নেই তোমার?

ইচ্ছে করলো না।

অত প'ড়োনা সুকুমার, অড্রি বললো, একটু রোগা হ'য়ে গেছ যেন!

ও কিছু না, স্মার্ট হচ্ছি।

কলেজ কেমন লাগছে তোমার?

ভালো, কিন্তু জানো অড্রি, এত কাজ এদেশে—এতো দেখবার যে পড়াশুনো করবার সময় বড় কম—

পিটার তো তো ক'রে বললো, আমি তো এখানে কিছুই দেখিনি—অথচ এতদিন আছি এদেশে—

আঃ থামো তুমি—তোমার মতো কুনো মানুষ হয় নাকি? বাড়ী থেকে বেরোবার নামে ওর জ্বর আসে।

সুকুমার পিটারের পক্ষ নিয়ে বললো, বেচারা সারাদিন বাইরে থাকে কি-না তাই একটু সুযোগ পেলেই ঘরে থাকতে চায়।

বল তো, বল তো সুকুমার—আমার মনের কথাটা বলে দিলে তুমি।

একথা শুনে অড্রি জিজ্ঞেস করলো, তুমি হাত দেখতে জানো সুকুমার?

খুব ভালো, গণক সাজবার লোভ দমন করতে পারলো না সুকুমার।

দেখনা আমার হাতটা একটু?

অড্রির হাতে চাপ দিয়ে সুকুমার বললো খুব নরম তোমার হাত।

হাসতে লাগলো পিটার, বাঃ বেশ বলেছ—

না না সত্যি ভালো ক'রে দেখ, তোমাদের দেশের লোক খুব ভালো হাত দেখতে জানে শুনেছি।

এবার খুব গম্ভীর হ'য়ে সুকুমার মন দিয়ে অড্রির হাত দেখতে লাগলো, আলোর ঠিক তলায় এসো—সব রেখাগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না—সে আড়চোখে একবার পিটার আর অড্রির মুখের দিকে তাকিয়ে নিল। পিটার অড্রির চেয়ে বয়সে অনেক বড়। পিটার কুৎসিৎ—অড্রি সুন্দরী। সম্ভবত এদের বিয়ে বিশী দিন প্রেম ক'রে হয়নি আর বিয়েতে একটু পারিবারিক গোলযোগও বেধেছিল নিশ্চয়ই। পদার্থ বিজ্ঞানের মাথা সুকুমারের—এ হিসেবে হয়তো তার ভুল হবেনা। চোখ বুজে ঢিল ছুঁড়ে দেখা যাক্না কি হয়।

তোমাদের বিয়ের কিছুই ঠিক ছিল না—হঠাৎ হুপ ক'রে হ'য়ে যায়—

ঠিক বলেছ, সুকুমার—আরও বল।

কিন্তু, হাসতে হাসতে পিটার বললো, আমি যেন তোমাকে সাউদাম্পটন্ রোডে লাঞ্চ খেতে খেতে কথাটা বলেছিলাম মনে হচ্ছে।

সুকুমার তাড়াতাড়ি বললো, বলেছিলে নাকি, কই শুনিনি তো।

আঃ তুমি চুপ কর, পিটার—নাও আরো বল, সুকুমার ?

তোমাদের বিয়েতে অড্রি, তোমার বাড়ীর লোক খুব রেগে যায় আর —

ঠিক বলেছ, সুকুমার, মা বাবার সংগে আজও আমার মিটমাট হয় নি।

হবে হবে—ঘাবড়িও না।

হবে ? কবে মিটমাট হবে, সুকুমার ?

খুব শীগগিরই—

তবু কবে ?

পিটার সিগ্রেটে একটা টান মেরে বললো, খুব সাবধান তারিখ বলতে যেওনা তাহ'লে বিদ্যে ধরা পড়ে যাবে।

ইচ্ছে করলেই বলতে পারি, মাতব্বরী চালে সুকুমার বললো, তবে তাহ'লে হোম করতে হবে।

অধৈর্য হয়ে অড্রি বললো, তাই তুমি কর—কিন্তু হোম কি ?

হাসি চেপে সুকুমার বললো, হোম কি সেকথা বলা বড় মুস্কিল, আর সেটা করায় হাঙ্গাম অনেক—খরচও বড় বেশী।

ঠিক বলেছ, কাগজ নামিয়ে রেখে পিটার বললো, বেশ চালাক ছেলে তুমি—

ঘাবড়িও না অড্রি, শীগগিরই সব ঠিক হয়ে যাবে।

তোমার কথা সত্যি হোক্, সুকুমার !

অড্রি-পিটারের ঘরের সামনেই আর্থার-মারজোরীর ঘর। সেখানে এসে সুকুমার দেশের গন্ধ পেল যেন। আর্থার জনকে ঘুম পাড়াবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে আর মারজোরী দিশেহারা হ'য়ে কি করে চার্লসের চিল-চীৎকার থামাবে তাই ভাবছে।

ক্ষমা কর সুকুমার, এই হট্টগোলে কিছু মনে ক'রোনা, মারজোরী একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে তাকে বসতে বললো।

এখন তোমরা ব্যস্ত—আমি বরং পরে আসবো।

বসো, আর্থার তার হাত ধ'রে তাকে বসিয়ে দিল, লিবারেল্ দলের লোক সব সময় ব্যস্ত, দেশের চিন্তায় তাদের নিশ্বাস নেবার সময় নেই।

তাই নাকি ?

নিশ্চয়ই।

আর্থার-মারজোরী লিবারেল। অড্রি-পিটার লেবার। হেলেন-নোয়েল কনজারভেটিভ। আর সতেরো বছরের এডওয়ার্ড কম্যুনিষ্ট —তাই চোখ বুজে উরসুলাও কম্যুনিষ্ট-ছেলে যা বলে সবই সত্যি। খাবার টেবিলে যখন তর্ক হয়—সে এক শোনবার জিনিশ। স্কুমারকে প্রত্যেকেই নিজের দলে ভেড়াতে চায়। কিন্তু সে বলে, দাঁড়াও আগে ভালো ক'রে হাল চাল বুঝি।

সতেরো বছরের এডওয়ার্ড বলে, তুমি নির্ঘাত কনজারভেটিভ, স্কুমার।

কাঁটা দিয়ে আলু বিঁধতে বিঁধতে নোয়েল আস্তে আস্তে বলে, স্থির-মস্তিষ্কের লোক মাত্রেই কনজারভেটিভ।

চেঁচিয়ে বলে সতেরো বছরের এডওয়ার্ড, আর বুদ্ধিমান মাত্রেই কম্যুনিষ্ট।

লিবারেল আর্থার হেঁকে ওঠে, আর যাদের বুদ্ধি আছে আর মাথা ঠাণ্ডা তারা হ'লো লিবারেল্।

যার যা' খুশী হও, তো তো ক'রে পিটার বলে, দুদিন পরে সবাইকে লেবারে নাম লেখাতেই হবে।

মারজোরী হঠাৎ বলে ওঠে, এই রে চার্লসটা আবার কাঁদছে—যাও শীগগিরই আর্থার দেখ কি হ'লো।

লিবারেলের জয়, লিবারেলের জয়—আর্থার ছুটে বেরিয়ে যায়।

উরসুলা নিজের থেকেই কথা বলে যায়, আমি জার্মান জানো সুকুমার—তবু আমার কোন সংস্কার নেই, ইংরেজকে আমি ভালো বেসেই বিয়ে করেছিলাম—আর ইংলণ্ডকে আমি ভালোবাসি খুব।

আমিও ইংলণ্ডকে ভালোবেসেছি, উরসুলা।

যুদ্ধ যতই ক্ষতি করুক না কেন অনেক লাভও হয়েছে আমাদের—ধরো, আমরা সকলে একসংগে এক বাড়ীতে যে-ভাবে আছি যুদ্ধের আগে সেটা কেউ কল্পনাও করতে পারতো না।

অথচ তোমাদের মতামত একেবারে আলাদা।

তবু আমরা মানুষ—যুদ্ধ আমাদের সেটা ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছে—আর এভাবে থাকলে কত কম খরচে—কত সুখে থাকা যায়—এভাবে না থাকলে, আমি অক্সফোর্ডে কাজ করি—কে এডওয়ার্ডের দেখা শোনা করবে—হস্‌টেলের খরচ চালাবার আমার ক্ষমতা নেই। আর মারজোরীকে দেখ, নিজের ছেলে নেই তার, হবেও না বোধ হয়, অথচ কী ভালোবাসে ওই নিগ্রো ছেলে দু'টোকে—যুদ্ধের আগে নিগ্রো পুষ্যি নিলে আত্মীয়দের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে প্রাণ বেরিয়ে যেতো, তারপর একটু থেমে বললো, তুমি কম্যুনিষ্ট হয়ে যাও সুকুমার আর দেরী ক'রো না—এডওয়ার্ডএর বয়স সতেরো হলে হবে কি, ও যা বলে একেবারে খাঁটী কথা—অমন ছেলে হয় না, কি বল সুকুমার?

তা ঠিক!

যথা সময় প্যারিস থেকে ক্লোদ এসে পৌঁছলো। ফরাসী ছেলে কিংবা মেয়ে আজ অবধি দেখে নি সুকুমার—তাই ক্লোদের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলো। অবশ্য দেখবার বিশেষ কিছুই নেই—ক্লোদকে দেখেই তার ভারতীয় মেয়ের কথা মনে পড়ে গেল—তার মুগ্ধ লাবণ্যে ভরা।

আজ তাড়াতাড়ি সাপার খেয়ে সবাই বেরিয়ে গেল ছবি দেখতে, ক্লোদ ক্লান্ত তাই গেল না—আর স্বকুমার বললো, পড়তে হবে। আসলে তার হাতে পয়সা নেই—মাসের শেষ—ইচ্ছে থাকলেও এদের সংগে যেতে পারলো না। খাবার ঘরে রেডিও খুলে ক্লোদের সংগে খবর শুনতে লাগলো।

তুমি ইণ্ডিয়া থেকে আসছো?

চেহারা দেখে তোমার অন্য কিছু মনে হচ্ছে নাকি?

ইণ্ডিয়ান আমি কখনো দেখিনি।

আমিও ফরাসী কখনও দেখিনি।

তোমার দুর্ভাগ্য।

মানে ফরাসী মেয়ে দেখে—

হেসে ক্লোদ বললো, কি শিখতে এসেছ এখানে?

রসিকতা করবার ইচ্ছে হ'লো স্বকুমারের, বললো, ম্যাজিক।

কি?

ম্যাজিক শিখতে এসেছি।

বল কি, ম্যাজিক জানো তুমি?

জানলে আসবো কেন, শিখতে এসেছি, একটু একটু শিখেওছি।

দেখাবে?

নিশ্চয়ই, স্বকুমার উঠে দাঁড়িয়ে বললো ঘাবড়ে যেওনা যেন—ব'লে রেডিও বন্ধ করলো, আলো নিবিয়ে দিল।

এই, ভয়ে ব'লে উঠলো ক্লোদ, কি করবে তুমি?

আঃ, বিরক্তির ভান করে স্বকুমার বললো, বললুম ম্যাজিক দেখাচ্ছি ঘাবড়ে যেও না—চুপ করে থাকো। ক্লোদ চুপ করেই রইলো অগত্যা।

তারপরে চেঁচিয়ে উঠলো স্বকুমার, Let there be light বলেই স্বইচ টিপলো। আলো জ্বলে উঠলো।

দেখলে ? সুকুমার বললো, দেখলে ম্যাজিক ? আলো ছিল না—যেই বললাম, অমনি আলো হ'লো।

এ আবার ম্যাজিক নাকি ? এতো সবাই পারে।

এখন পারে—আগে পারতো না—এই শিখতেই এসেছি আমি।

অবাক হ'য়ে ক্লোদ বললো, এ আবার শিখতে হয় নাকি ?

খুব হয়, ওহে মূর্খ ফরাসী মেয়ে, আমি ইলেক্‌ট্রিক্যাল এনজিনীয়ারিং এর ছাত্র।

য়্যাঁ, এতক্ষণ পর রসিকতা উপলব্ধি ক'রে খিল্ খিল্ ক'রে হেসে ক্লোদ বললো, তুমি খুব বুদ্ধিমান।

তাই তো এদেশে আসা সম্ভব হলো।

আমি কিন্তু এসেছি শেখাতে—শিখতে নয়।

শেখাবে বটে তুমি—

তার মানে ? জানো আমার এগ্রাগ্র্যাসিও ডিগ্রি আছে।

কোথাকার ?

ও ডিগ্রি প্যারী বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া আর কেউ দিতে পারে না।

প্যারী বিশ্ববিদ্যালয় ? হা হা করে হেসে সুকুমার বললো, শোন একটা মজার গল্প তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে—আমাদের দেশে এক ভদ্রলোকের ফরাসী ডিগ্রি আছে—ধরো তার নাম ডাঃ সেন। তার সেই ডিগ্রি তিনি কেমন ক'রে পেলেন জানো ? শোন তবে মজার গল্প। তিনি যখন প্যারিসে ছিলেন তখন তার একটা ঘোড়া ছিল—ঘোড়াটাকে ভয়ানক ভালবাসতেন তিনি। একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে যখন তিনি ঘোড়ায় চড়ে বেড়াচ্ছেন তখন দেখলেন কাছেই কাগজ-কলম-কালি নিয়ে গাছের তলায় একটি লোক চুপ করে বসে আছে। ডাঃ সেনের ভয়ানক কৌতুহল হলো। তিনি ঘোড়া থেকে নেমে লোকটার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার জানতে পারি ?

আমি ডিগ্রি বিলোবার জন্যে বসে আছি।

সে কি, কি ডিগ্রি?

ডক্টরেট—চাই নাকি একটা?

হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি পেতে পারি কি?

নিশ্চয়ই, তোমার মতো লোকের জন্যেই তো আমি ডিগ্রিগুলো নিয়ে বসে আছি—নাম বল তোমার? নাম শুনে লোকটি খস্ খস্ করে ডিগ্রিতে লিখে বললে, এই নাও—ধরো।

বাঃ, ধন্যবাদ, এবার আমি নামের পরে ডাক্তার লিখতে পারি?

আহা হা, পরে কেন, নামের আগেই ডাক্তার লেখার অধিকার আমি এইমাত্র তোমায় দিলাম।

অনেক ধন্যবাদ—অনেক ধন্যবাদ। খুশী হয়ে ডাঃ সেন ঘোড়ার কাছে ফিরে এলেন। হঠাৎ তার কি মনে হ'লো, আবার লোকটার কাছে ফিরে গিয়ে বললেন দেখুন—

হ্যাঁ, কি হ'লো?

দেখুন, আমি আর একটা ডিগ্রি পেতে পারি?

আবার কি, এই তো দিলুম তোমায় একটা—

না না আমার জন্যে নয়, আমার জন্যে নয়—আমার ঘোড়াটার জন্যে—ওকে আমি খুব ভালবাসি কি-না—

লোকটি বিনীতভাবে বললো, আমি খুব দুঃখিত ডাঃ সেন—তোমার ঘোড়ার জন্যে ডিগ্রি দিতে পারলাম না, কেন না আমার ডিগ্রি শুধু গাধাদের জন্যে, ঘোড়াদের জন্যে নয়।

গল্প শেষ করে সুকুমার খুব জোরে হেসে উঠলো। ক্লোদ কিন্তু একেবারেই হাসলো না। ছল ছল ক'রে উঠলো তার চোখ, ম্লান মুখে শুধু বললো, প্যারী বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে তোমাদের দেশের লোকের

এই ধারণা বুঝি, ছি ছি ছি—জানো ওটি হলো পৃথিবীর একটি প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়।

ওকে আবার বিশ্ববিদ্যালয় ব'লে নাকি? যে যায় সেই তো ডক্টরেট ডিগ্রি পায় শুনি।

না অত সোজা নয়—দু' রকম ডক্টরেট ডিগ্রি আছে প্যারী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের—একটার নাম হ'লো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট—সেটা সবাই পায়—বেশীর ভাগ বিদেশীরা, আর একটাকে বলে ষ্টেট্ ডিগ্রি—সেই ডিগ্রি পাওয়া রীতিমত কঠিন।

প্যারিসের আবার শক্ত ডিগ্রি—ওদের পড়াশুনো করবার সময় কোথায়—নাচ গান আর হৈ-হল্লা নিয়েই তো আছে ওরা।

এবার এক কাণ্ড হ'লো। ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেললো ক্লোদ, যা ভাবো তা নয়—তোমরা বিদেশীরা প্যারিসকে—সমস্ত ফ্রান্সকে বড় ছোট ক'রে দেখ কিন্তু গেলে বুঝতে পারবে—আমাদের দেশ যা ভাবো তা নয়—তা নয়—তা নয়—

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল সুকুমার। ঠাট্টা করতে করতে এ কি করে বসলো সে। বেচারী এসেছে আজ প্রথম দিন। বাড়ীর লোক শুনলে কি ভাববে সুকুমারকে। বড় ফাজিল হয়ে গেছে সে—কাণ্ডজ্ঞান নেই একেবারে—জিবের রাশ দমন করতে হবে এবার থেকে।

ছি ছি, ক্লোদ তুমি কাঁদছো, আমি ঠাট্টা করছিলাম তোমার সংগে—আমি কি এতই বোকা যে তোমাদের দেশ সম্বন্ধে কিছুই জানি না—ফ্রান্সের গৌরবময় ইতিহাস কোন জাত না জানে।

তবু থামেনা ক্লোদ। সুকুমার আস্তে আস্তে উঠে রেডিও খু লো—তারপর কাঁটা ঠিক জায়গায় এনে ধরলো প্যারিস ষ্টেশন।

ও কি গান হচ্ছে, ক্লোদ?

এবার ও চোখের জল মুছে কথা বললো, অনেক পুরোনো রেকর্ড ওটা—

গানের কথাগুলো কি ?

পার্লে মেয়ো দু' আমুর!

তার মানে কি ক্লোদ ?

আমাকে প্রেমের কথা বল !

কি মিষ্টি সুর, ঠিক আমাদের বাংলা গানের মতো ?

সে-গান সত্যি ভালো লাগলো সুকুমারের !

বড় চেঁচায় সতেরো বছরের এডওয়ার্ড, এই সুকুমার চীজের প্লেটটা এগিয়ে দাও, যাঃ ছুরি গেল পড়ে—কই আরও রুটি নিয়ে এসো, হেলেন —চুপ ক'রে দেখছ কি এলিজাবেথ্—আর এক কাপ্ চা চাই নাকি তোমার। আহাহা, পামেলা ওই বড় কেকের টুকরোটা আমাকে দাও—

বাড়ন্ত ছেলে তাই ওর হাঁ একটু বড়, আস্তে আস্তে বলে কুড়ি বছরের এলিজাবেথ।

সুকুমার মনে মনে ভাবে, একটু নয় বেশ বড় হাঁ। খেতে পারে বটে সতেরো বছরের এডওয়ার্ড।

আজ টেবিল বেশ ফাঁকা। উরসুলা আসতে পারেনি অক্সফোর্ড থেকে এ-শনিবার। ক্লোদ গেছে কোন বন্ধুর বাড়ী। মণিকা আর জনকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে গেছে নোয়েল। হেলেন যায়নি কেন না আজ বিকেলের চা করবার পালা তার। অড্রি-পিটার, মারজোরী-আর্থার গেছে কোন দূরে সস্তায় কার্পেট কিনতে। চার্লসকে প্যারেম্বুলেট্যারে শুইয়ে হেলেন চোখ রেখেছে।

আজ পামেলার চা খাবার কথা—তাই সুকুমার যায়নি কোথাও। সতেরো বছরের এডওয়ার্ডের কুড়ি বছরের এলিজাবেথকে এই প্রথম দেখলো সে। বেশ দেখতে এলিজাবেথ—কোন অপিসে টাইপিষ্টের কাজ করে।

হেলেন জিজ্ঞেস করলো, আর কি নেবে, পামেলা?

কিছু না ধন্যবাদ—আমার খাওয়া হয়ে গেছে।

সুকুমার?

চা আছে আর?

নিশ্চয়ই, একটু দাঁড়াও, গরম জল ঢেলে দি আরও—

হেঁকে উঠলো সতেরো বছরের এডওয়ার্ড, সুন্দর টার্ট করতে পার তুমি হেলেন—দাও দেখি আমাকে আরও গোটা দুই-তিন?

হেসে পামেলা টার্টের প্লেট এডওয়ার্ডের দিকে ঠেলে দিয়ে বললো, সবগুলিই তুমি খেয়ে নাও, আর কেউ খাবে না বোধ হয়।

কেউ নয়, পামেলার দিকে তাকিয়ে হেসে বললো সুকুমার।

ঘরের কি অবস্থা করে রেখেছ সুকুমার—বড় অগোছাল তুমি, খোলা বইগুলো বন্ধ করে গুছিয়ে রাখতে রাখতে পামেলা বললো, এখনও বিছানাটা করবারও সময় পাওনি?

শনি-রবিবার এরা ঘর পরিষ্কার করে না।

কিন্তু তুমি নিজে তো ক'রে নিতে পারো—কি করছিলে এতক্ষণ?

ঘরের এ অবস্থার জন্যে আমি খুব দুঃখিত, পামেলা, বড় ব্যস্ত ছিলাম আজ সারাদিন—রাত্তিরে পড়া হবে না বলে দিনের বেলা—

পরীক্ষা কবে তোমার?

তিন মাস পরপর পরীক্ষা—প্রথম ডিসেম্বরে—ভালো রেজাল্ট করতে চাই।

বিছানা ক'রে পামেলা বললো, ঠিক করবে, যা বুদ্ধি তোমার!

কিছুই বলা যায় না—বড় শক্ত কোর্স।

আমি প্রার্থনা করবো তোমার জন্যে।

হেসে সুকুমার বললো, ভগবানে বিশ্বাস কর তুমি?

করি বৈকি—তুমি ?

না, ভুলে যেওনা আমি বিজ্ঞানের ছাত্র।

তাই বলে ভগবানে বিশ্বাস না করবার কি আছে ?

সর্বনাশ, আজ কি তুমি আমার সংগে ধর্ম আলোচনা ক'রে সময় নষ্ট করবে ?

ধর্ম আলোচনা করলে সময় নষ্ট হয় না।

সেটা রবিবারে করাই ভালো—আজ শনিবার।

অত সিগ্রেট খেওনা সুকুমার, দাও এগুলো আমি নিয়ে যাবো—আর খেতে পাবে না তুমি—

আরে রে রে কর কি, কাল রবিবার কোথাও সিগ্রেট কিনতে পাবো না—

কাল তো আমাদের বাড়ী যাচ্ছ ?

বলেছি না, আমি কিছু ভুলি না, কখন যাবো ?

পাঁচটা-ছ'টায় গিয়ে পৌঁছও, ডিনার খাবে আমাদের সংগে—

ধন্যবাদ—কেমন ক'রে যাবো বলে দাও ?

চেয়ারিং ক্রস্ থেকে সাদার্ণ রেলওয়ে নেবে—মিনিট পনেরো-কুড়ি লাগবে ব্ল্যাক্‌হিথ্ ষ্টেশনে পৌঁছতে, সেখান থেকে যে কোন বাস্—কিংবা হেঁটেও আসতে পারো—বাড়ীর নম্বর ৩৫ স্টারস্ হিল্ রোড—লিখে নাও সব—

আমার নাম সুকুমার—আমি সব মাথায় লিখে নিয়েছি।

ঘুরে মরবে কাল, যা' খুশী হবো আমি তাহ'লে—

বসো পামেলা, খাটের ওপর পামেলাকে পাশে বসিয়ে সুকুমার বললো, আমি জব্দ হলে তুমি খুব খুশী হও না ?

না গো না, সুকুমারের একটা হাত কোলে নিয়ে পামেলা বললো, কী সুন্দর তোমার আঙুল! নখ পরিষ্কার কর না কেন ?

রূপচর্চা করবার আমার সময় নেই, পামেলা।

কত ব্যস্ত লোক তুমি! আমি শুধু তোমার সময় নষ্ট করি, না সুকুমার?

ও হাসলো, আমার মূল্য আরও বাড়িয়ে দাও!

আমি কি আর দিতে পারি তোমায়?

তাতো জানি না কিন্তু—

বল—

ওই দেখ পামেলা—

জ্বলে উঠেছে আলেকজান্দ্রা প্যালেসে সারি সারি আলো। সমস্ত প্রাসাদ ঝলমল করছে আর আস্তে আস্তে যেন কাছে সরে আসছে।

চল একদিন দু'জনে গিয়ে দেখে আসি কেমন করে জ্বালায় ওরা অত আলো।

চল—আজ যাবে সুকুমার?

আজ নয়—আজ দূর থেকে—পা-মে লা—

না না—

জীবনে প্রথম চুম্বনের স্বাদ পেল সুকুমার। আর ঠিক সেই মুহূর্তে কে দরজায় টোকা দিল, টক্ টক্ টক্। লাফিয়ে উঠে দরজা খুলে সুকুমার ক্লোদকে দেখলো।

আমি খুব দুঃখিত—পামেলাকে দেখে ও বললো, আমি পরে আসবো।

এসো ক্লোদ—পামেলা সুইট—আমার বন্ধু—আর ক্লোদ—আমাদের অতিথি—

ওরা কথা বলতে লাগলো। আর সুকুমার তাকিয়ে রইলো প্যালেসের সেই মুখর আলোগুলির দিকে। অনেকক্ষণ জানলার পর্দা সে ইচ্ছে করেই টানলো না। তার রক্ত যেন চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে—

আবেশে কাঁপছে সমস্ত শরীর—এ শিহরণ কেমন করে থামাবে সে!

কড়া সিগ্রেটের একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে মিঃ উইলিয়াম স্থইট বললেন, তুমিই স্থকুমার, তোমার কথা প্যামের কাছ থেকে প্রায়ই শুনি, কিন্তু তোমাকে দেখে তো ঠিক ইণ্ডিয়ান বলে মনে হয় না, এই স্পেন কিংবা ইটালীর লোক যেন—তোমার মা বাবা দু'জনেই কি ইণ্ডিয়ান?

খাঁটী ইণ্ডিয়ান, মিঃ স্থইট।

বাঃ বেশ, বোসো স্থকুমার—কেমন লাগছে এদেশ?

ভালো।

কিছুদিন আগে তোমাদের দেশের কয়েকজন জার্ণালিষ্টের সংগে আমার আলাপ হয়—খুব চমৎকার লোক তারা—এদেশ কিন্তু তাদের মোটেও ভালো লাগে নি—তারা প্রায়ই আমাকে বলতেন, বিশ্রী ওয়েদার—বিশ্রী খাওয়া-দাওয়া, খাওয়া কেমন লাগে তোমার?

আমার তো কোন অস্থবিধা হয় না মিঃ স্থইট।

তুমি গরু খাও?

এখানে মাঝে মাঝে খেতে হয় বৈকি।

তোমাদের দেশের লোক ওটা খায় না শুনি।

সকলে নয়—হিন্দুরা খায় না, কারণ ধর্মের দিক থেকে তারা গরুকে মায়ের মতো মনে করে।

আস্তে আস্তে উঠে মিঃ স্থইট সেলার খুললেন। ঝলমল্ করে উঠলো মদের নানারকম বোতল, কি খাবে স্থকুমার, হুইস্কি?

আমি মদ খাই না, মিঃ স্থইট।

বিয়ার্? গিনেস্? একটু সাইডার?

তাও না—ধন্যবাদ।

ভালো, সেলার বন্ধ করে মিঃ স্থইট স্থকুমারের কাছে এসে সিগ্রেটের কেস্ খুলে বললেন, সিগ্রেট খাও তো?

খাই, কিন্তু আপনার সামনে খাবো না।

অবাক হয়ে মিঃ স্থইট জিজ্ঞেস করলেন, কেন?

আমাদের দেশে গুরুজনদের সামনে সিগ্রেট খাওয়া অশোভন—

খোলা কেস্ হাতে নিয়ে স্থকুমারের মুখের দিকে মিঃ স্থইট তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর তার কপালে আস্তে চুম্বন করে বললেন, মাই বয়! বলেই চেঁচিয়ে ডাকলেন, প্যাম্—প্যাম্—

পামেলা ছুটে এসে বললো, কি বলছো?

কি রান্না করেছিস স্থকুমারের জন্যে?

স্থপ্, ল্যাম্ব চপ আর রাইস্-পুডিং।

বাঃ বেশ, আর শোন্, ভীষণ কুয়াশা হয়েছে বাইরে—আরও বাড়বে মনে হয়, স্থকুমার এখানেই থেকে যাক্ আজ—লাউঞ্জের ডিভানে ওর বিছানা ক'রে দে—বালিশ আছে তো? দেখিস ওর যেন কোন অস্থবিধা না হয়—তুমি বাড়ীতে ফোন্ করে বলে দাও স্থকুমার—

স্থকুমারের ফোন করে রাত্তিরে এখানে থাকবার কথা জানাতে লজ্জা করতে লাগলো। তাই সে বললো, পামেলা, তুমি ওদের কাউকে বলে দেবে দয়া করে? আমার ফোন নম্বর, মাউণ্টভিউ —

আমি জানি, হেসে পামেলা বেরিয়ে গেল।

সংসারের পাট চুকিয়ে শোবার আগে আর একবার পামেলা জানতে এলো স্থকুমারের কিছু চাই কিনা।

কিচ্ছু না, এসো প্যাম্, সোফায় গা এলিয়ে স্থকুমার বললো, একটু গল্প করি!

ঘুমোবে না? অনেক রাত হয়েছে যে, ধপ করে পামেলা ডুবে গেল সোফায়।

এখানে কি ঘুমোবার জন্যে রয়ে গেলাম?

তবে?

বোকা মেয়ে—তাও জানো না?

না।

তোমার সংগে সারারাত গল্প করবার জন্যে।

অসম্ভব, আমি কিছুতেই তা পারবো না।

তোমাকে পারতেই হবে।

আঃ ছাড়ো সুকুমার, বাবা রয়েছে পাশের ঘরে।

থাকলেই বা, তিনি তো সব জানেন।

আমি কিছুতেই রাত্তিরে তোমার সংগে এক ঘরে থাকতে পারবো না।

তা' হলে আমি চলে যাই?

যাও।

এই কুয়াশায়, সত্যি তুমি আমাকে চলে যেতে বলছো—এত নিষ্ঠুর তুমি, প্যাম্—তোমাকে এ ঘরে থাকতেই হবে—

আচ্ছা, এক ঘণ্টা থাকবো—তারপর চলে যাবো, বড় দুষ্ট, তুমি—আর কখনও তোমাকে এ বাড়ীতে থাকতে দেবো না।

উঃ, যেন উনি থাকতে দেয়ার মালিক, কে আমার থাঁকার বন্দোবস্ত করলেন আজ?

তুমি বড় চালাক, সুকুমার।

আর তুমি—বেহালা!

সে আবার কি?

বেহালা বাজানোর গল্প বলেই তো তোমাকে জয় করলাম—আরো কাছে এসো প্যাম্—

আমি যাই, সুকুমার—

না—

আমাকে যেতেই হবে—

না—না—না—

সু—কু—মার আমাকে যেতে দাও!

আমাকে ছেড়ে তুমি যেও না, প্যাম্—

সুকুমার পামেলার সোনালী চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। সে বাধা দিলো না।

জেগে জেগেই রাত ভোর হলো।

ভুলে থাকতে চাইলেই ভুলে থাকা যায় না। পিছনে না তাকিয়ে সামনে এগিয়ে গেলেও পিছন কি সহজে ছ'ড়ে! মা'র লেখা বিজয়ার চিঠি!

কল্যাণবরেষু

সুকুমার,

আমার বিজয়ার আন্তরিক আশীর্বাদ জানিবে। মন্টু, ঘুনু, রাণু, ছায়া তাহারাও তোমাকে প্রণাম জানাইলো। আলাদা করিয়া তাহারা তোমাকে লিখিতে চাহিয়াছিল কিন্তু তাহাদের জন্য ছ' আনা খরচ করিবার অবস্থা আমার এক্ষণে নাই। আর এ চিঠিতে আমিও তোমাকে অনেক কথা লিখিতে চাই বলিয়া তাহাদের কিছু লিখিতে দিয়া জায়গা নষ্ট করিলাম না।

বিজয়ায় আমিও তোমার কাছ হইতে দু'লাইন আশা করিয়াছিলাম কিন্তু তুমি কি সুকুমার? বিলাতে গিয়াই এত বড় বাঁদর হইয়া গেলে! আজকাল আমাকে চিঠি লিখিবারও তোমার অবসর হয় না। মাসের শেষে ছোট একটি চিঠি দাও—তাহাতে শুধু টাকার কথা থাকে—

যেন প্রথম সপ্তাহে নিশ্চয়ই করিয়া তোমার টাকা পাঠাই। যাইবার সময় তো খুব বড় মুখ করিয়া বলিয়াছিলে যত কমে পারো চালাইবে। এই কি তোমার কমে চালানো হইল? প্রথমে দু'শো—তারপর আড়াইশো—তারপর তিনশো টাকা—এখন টাকা ছাড়িয়া আবার পাউণ্ডে উঠিয়াছ—গত চিঠিতে লিখিয়াছ তিরিশ পাউণ্ডের কমে কিছুতেই চালাইতে পারিবে না। তিরিশ পাউণ্ডে কত হয় সে খেয়াল আছে তোমার? চারশো টাকা! অত টাকা আমি কোথা হইতে দিব?

তুমি কি সব ভুলিয়া গেলে সুকুমার? আমার কথা না-হয় ছাড়িয়া দিলাম—কিন্তু ভাইবোনগুলি—তাহাদের শীর্ণ মুখের কথা মনে করিয়া দামী জামা-কাপড় পরিয়া টাই বাঁধিয়া সাহেব সাজিতে তোমার লজ্জা করে না? কি দরকার ছিল অত জামা করাইবার? ইচ্ছা থাকিলে যা লইয়া গিয়াছিলে তাহাই যথেষ্ট হইত। লিখিয়াছ সাহেব পরিবারে খুব সুখে আছ—অত সাহেব-মেমসাহেব লইয়া নবাব-পুত্তুর সাজিবার দরকার কি তোমার? শুনিয়াছি খুব অল্প খরচে ফ্ল্যাট লইয়া অনেক বাঙালী ছাত্র নিজেরা রাঁধিয়া-বাড়িয়া খায়—তুমি তেমন করিতে পারো না? নাকি মেমসাহেব লইয়া মদের পিপায় ডুবিয়া আছ আর ভাইবোনগুলির অন্ন মারিয়া খুব ধেই ধেই করিয়া নাচিতেছে। কিন্তু আমি স্পষ্ট বলিয়া দিলাম সুকুমার—তিনশো টাকার বেশী আমি কিছুতেই তোমাকে পাঠাইব না—পাঠাইতে পারিব না—পারো—চালাইও—না পারিলে উপোস করিও—এমন হতচ্ছাড়া বাঁদরের মতো ব্যবহার করিবে জানিলে কিছুতেই আমি তোমাকে বিলাত যাইতে দিতাম না।

তুমি কেমন করিয়া সব ভুলিয়া গেলে? আমার অবস্থা জানো না? খবর রাখো যে বাচ্চাদের তোমার জন্য আজকাল ভালো করিয়া খাওয়া জোটে না। যাহা হউক আমি তোমাকে স্পষ্ট জানাইয়া দিতেছি যে, বেশী টাকা চাহিলেই হুপ করিয়া পাঠানো আমার পক্ষে

অসম্ভব। ভবিষ্যতে টেলিগ্রাফ পাঠাইয়া পয়সা নষ্ট করিও না—ফল হইবে না। মনে রাখিও তুমি নবাব-পুত্তুর নও—বিধবা মায়ের ছেলে।

আমার আশীর্বাদ লইও। ইতি— মা

চিঠি পড়ে সুকুমার মাথায় হাত দিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলো। ওর শিরায় শিরায় জ্বলছে মায়ের লেখা লাইনগুলো। কয়েক মুহূর্তের জন্যে সব অন্ধকার হয়ে গেল যেন। সমুদ্রের ওপার থেকে মণ্টু, ঘুনু, ছায়া, রাণু কথা বলে উঠলো।

বিলেতে এসে ভুল করেছে সুকুমার—যৌবনের এই চঞ্চল সমারোহে তাল মেলাবার কোন অধিকার নেই তার। দেশে ফিরে প্রত্যেককে সাবধান করতে হবে—তার মতো অবস্থার কেউ যেন কোনদিনও এখানে না আসে। বিলেতে হয়তো আসা হয় কিন্তু দেখা হয় না, জানা হয় না, শোনা হয় না, তাহ'লে এসে কি লাভ! এসে যদি প্রতি পদে বাধা পাই, প্রতি কাজ করতে গিয়ে মনে হয় পারবো না, আমি গরীব—তাহ'লে নতুন দেশে এসে কি লাভ! নতুন দেশে এসে নতুন শিক্ষায় নতুন মানুষ যদি না হতে পারি তাহ'লে শুধু শুধু পাথেয় নষ্ট করে কষ্ট পাওয়ার মানে কি?

ভুল করেছ, সুকুমার—কেন এলো সে? তাকে মানায় না—সাজে না এদেশে। এখন না পারবে ফিরতে—না পারবে কিছু গ্রহণ করতে—বেদনাই সার হবে তার—শুধু মর্মান্তিক বেদনা পেয়ে—না-পাওয়া, দেখে—না-দেখা, কাছে এসে ছোঁয়া বাঁচিয়ে দূরে স'রে থাকা!

অভিমানে সুকুমার মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো, মাকে আর চিঠি লিখবে না, কোন খবর দেবে না—ম'রে গেলেও না!

কখনও কুয়াশা, কখনও তুষারপাত, কোন দিন ভারী ঠাণ্ডা, কোন দিন

ফুরফুরে হাওয়া, মাঝে মাঝে এই রোদ, এই বৃষ্টি—এমনি ক'রেই নভেম্বর মাস শেষ হলো।

ভারী ঠাণ্ডা পড়লো ডিসেম্বরের প্রথমেই। একদিন ঘুম থেকে উঠে জানলার পর্দা সরিয়ে সুকুমার দেখে শাদা হয়ে গেছে বাগান—গাছের মাথায় জমাট বেঁধে আটকে আছে তুষার-কণা। এতদিন পর লণ্ডনের চিরপ্রসিদ্ধ শীত টের পেলো সুকুমার।

ঠাণ্ডা আর কিছুতেই কমে না—গ্যাসের আগুন সারাদিন জ্বলে। বিকেলে লাউঞ্জে জ্বলে কয়লার আগুন আর দু'টো ইলেকৃট্রিক ফায়ার—রাত্তিরে গরম জলের ব্যাগ দিয়ে বিছানা গরম না করলে মনে হয় দেহ কেটে যাচ্ছে।

রাস্তায় বেরিয়ে জমা তুষারের ওপর ধুপ্‌ধাপ্‌ আছাড় খায় সুকুমার। স্কাফ, ওভারকোট, গ্লাব্‌স, হাঁটু অবধি তোলা গরম মোজা—তবু নাকের ডগা আর কান লাল হয়ে যায় সুকুমারের, তার ওপর হাওয়ার দাপটে কথা বেধে যায় তার। লোকে বলছে, এবার নাকি আরও বেশী ঠাণ্ডা পড়বে। জানুয়ারী ফেব্রুয়ারীতে আরও কত ডিগ্রী নামবে বলা যায় না। যা-হয় হোক্, সুকুমার গ্রাহ্য করে না কিছুই। কয়েক-দিনের মধ্যেই তার শীত সয়ে গেল। তুষারপাত হলে সে বিরক্ত হয়—হাঁ ক'রে তাকিয়ে থেকে কবিত্ব করে না মোটেই।

এই শীতের মধ্যেই তার পরীক্ষা হ'য়ে গেল—কিছুই শক্ত মনে হয়নি। মনে হ'লো ফল খুবই ভালো হবে। বড়দিনের ছুটি হ'য়ে গেল।

এর মধ্যে কয়েকজন বাঙালী ছাত্রের সঙ্গে আলাপ হয়েছে সুকুমারের। একজনের নাম সুবিকাশ মিত্র—সে-ও ইলেকৃট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ে—তবে ফ্যারাডে হাউসে নয়—ইম্পিরিয়াল কলেজে—ছেলেটি ভদ্র। থাকে গোল্ডার্স গ্রীণে, ডাঃ রায়ের বোর্ডিং হাউস। সুকুমার কয়েকবার গেছে তাঁর বাড়ী।

ডাঃ রায় মেম বিয়ে ক'রে এদেশেই থেকে গেছেন—তাঁর আইরীশ স্ত্রী সকলকে যত্ন করেন খুব—ছেলেরা বড ভালোবাসে তাঁকে। তবে সেখানে সকলেই ভারতীয়—দিশি খাওয়া হয় রোজ রাত্তিরে। বেশীর ভাগ ডবল্ ঘর—ভাগ্যক্রমে সুবিকাশ একটা সিংগল্ ঘর পেয়েছে।

প্রথম দিন সুবিকাশের ঘরে গিয়ে চমকে গেল সুকুমার। নানা ভঙ্গীতে একটি বাঙালী মেয়ের অনেক ছবি চারদিকে সাজানো রয়েছে।

ইনি কে?

লজ্জিত হ'য়ে সুবিকাশ বললো, আমার স্ত্রী।

আপনি বিয়ে ক'রে এসেছেন?

হ্যাঁ। বিয়ে না দিয়ে বাবা কিছুতেই আসতে দিতে রাজী হলেন না।

তাহলে চার বছর থাকতে আপনার খুব কষ্ট হবে বলুন?

ম্লান হেসে সুবিকাশ বললো, বিরহের একটা চার্ম আছে, সুকুমার বাবু।

সেটা আপনিই ভালো বুঝবেন।

আপনি বিয়ে করেন নি?

—না—ভাগ্যিস!

কেন?

ওতে কান দেবেন না—ও আমার একটা উচ্ছাস।

এদেশে প্রেমে পড়েছেন?

কি ভেবে সুকুমার বললো, হ্যাঁ।

কি জাত?

ইংরেজ।

বিয়ে করবেন নাকি?

দেশ থেকে সবে এসেছে তাই সুবিকাশের কৌতূহল বড় বেশী।

সুকুমার হেসে বললো, বোধ হয়।

একদিন নিয়ে আসুন এখানে, বৌদির সংগে আলাপ করি।

আনব বৈ কি!

সৌভাগ্য আপনাদের—যাকে ভালোবাসেন তার কাছে রয়েছেন, স্ত্রীর ছবিগুলির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো সুবিকাশ।

এখানে কত খরচ পড়ে আপনার?

তিন গিনি—কেন থাকবেন এখানে?

না, আমি ইংরেজ পরিবারে আরও কম দি!

আর কিছুক্ষণ সুবিকাশের সংগে গল্প করে সে-রাত্রে ডাঃ রায়ের বোর্ডিং হাউসেই গেল সুকুমার। এবং তখুনি তার সেখানে থাকবার ইচ্ছে একেবারেই উড়ে গেল।

ভীড়ে-ভীড়! বেশীর ভাগ বাঙালী—কয়েকজন দিল্লী-বম্বের ছেলেও রয়েছে। কে বলবে এটা বিলেত।

সুকুমারকে দেখতে পেয়ে একজন বললো, এই যে স্যার্, নমস্কার।

নমস্কার, আপনার সংগে কোথায় আলাপ হয়েছে বলুন তো?

আলাপ হয়নি স্যার্, তবে আপনাকে হেথায়-হোথায় দেখেছি অনেকবার, সংগে আপনার বান্ধবীও ছিলেন।

তাই নাকি? আর একজন বলে উঠলো, লাকি লোক, অথচ আমাদের দিকে আজও কেউ ফিরেও তাকালো না।

মিসেস রায় হঠাৎ বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, ওহো দাঁড়াও, সুবিকাশের গেষ্ট্ খাচ্ছে আজ—লিখে রাখি নয়তো বিল্ দেবার সময় ভুলে যাবো।

হেসে ডাঃ রায় বললেন, আমি আগেই লিখে রেখেছি, ডার্লিং!

দিশি ব্যাপারের মধ্যে দিয়ে দিশি খাওয়া শেষ হলো!

এ বাড়ী ছেড়ে দিতে হলে বুক ভেঙে যাবে সুকুমারের। তবু যদি খরচ কমানো যায়। ফিলসফির ছাত্র মোহিত মুখার্জির সংগে একদিন সে তাদের বাড়ী ঘুরে এলো। শুনেছিল তারা কয়েক বন্ধু নাকি ফ্ল্যাট্ নিয়ে থাকে। নিজেরাই রান্না করে খায়, খরচ খুব কম পড়ে তাদের—দরকার হ'লে সুকুমারকে তারা খুশী হ'য়েই জায়গা দিতে পারে।

রাসেল্ স্কোয়ারের কাছেই তাদের ফ্ল্যাট্। তিনখানি ঘর। এক একটি ঘরে দু'জন করে থাকে। ঘরের চেহারা দেখে সুকুমারের গা ঘিন্ ঘিন্ করে উঠলো। নোংরা মোজার গন্ধ—বিছানা কতদিন করা হয়নি কে জানে—এদিকে-ওদিকে পড়ে আছে এঁটো চায়ের কাপ্। সকলে বাড়ী ছিল না, যারা ছিল তারা সুকুমারের সংগে আলাপ করতে এলো।

খুব সুখে আছি আমরা জানেন সুকুমার বাবু, যখন খুশী রান্না করে খাই।

বাজার-টাজার করবার সময় হয় আপনাদের?

ওতো মশাই শনিবারে একদিন। আর কোন নিয়ম-কানুন নেই মশাই এখানে।

আর একজন বললো, ইচ্ছা হলে দাড়ি সাতদিন না কামান কেউ কিছু কইবো না—ড্রেসিং গাউনের কোন দরকার নাই—আপনি এখানে কি পড়েন মশাই?

ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং।

ভালই হইবো, আসেন চইলা, এই ঘরেই দিমু অখন আর একখান্ ক্যাম্প্ খাট ফালাইয়া—বাত্তি-বুত্তি খারাপ হইলে আপনি সারাইয়া দিবার পারবেন।

আমার অনেক বই—সেগুলো রাখবো কোথায়?

ওই খাটের তলে—আমরা সকলে তাই রাখছি।

মোহিতের দিকে তাকিয়ে সুকুমার বললো, কয়েকদিন ভেবে দেখি।

সেই ভদ্রলোক বললো, ভাবনার কি আছে মশাই—আসেন চইলা, ইংরেজ পরিবারের টাইম মাফিক্ খাওয়ায় কি আমাগো প্যাট্ ভরে— এখানে ফ্যালাইয়া ছড়াইয়া খাওন মশাই—আর বাত্তি-বুত্তি খারাপ হইলে—

তবু কয়েকদিন ভেবে দেখি!

মুখে ওদের এড়াবার জন্যে ওকথা বললেও স্বকুমার জানতো এখানে এদের সংগে এমনভাবে কিছুতেই সে থাকতে পারবে না—অমনি থাকতে দিলেও না!

নিজের ঘরে আজকাল বেশী থাকে না স্বকুমার। তার ঘর বেশ বড আর সেখানে শুধু গ্যাসের আগুন। এখন তার পডাশুনোর বেশী চাপ নেই, তাই যতক্ষণ বাড়ীতে থাকে হয় সে লাউঞ্জে না হয় রান্নাঘরে এদের সংগে গল্প করে কাটায়।

বাইরে ঠাণ্ডা হলেও ঘরে আনন্দের বিরাম নেই। পূজো-পূজো মনে হচ্ছে স্বকুমারের। সকলেই ব্যস্ত, নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই কারুর। জিনিষে-জিনিষে ঘর ভরে যাচ্ছে। লাল, নীল, হলদে কাগজে মেয়েরা তৈরী করছে শিকল—লাল রাংতার ওপর শাদা রাংতায় লেখা হচ্ছে—হ্যাপি খ্রীষ্টমাস্। কার্ডে কার্ডে ভরে গেছে ম্যাণ্টেল পিস্— বাচ্ছাদের জন্যে এসেছে কত খেলনা। স্বকুমারও একদিন জন্, চার্লস্ আর মণিকার জন্যে খেলনা কিনলো। পামেলার জন্যে কি কিনবে এখনও ঠিক করতে পারলো না সে।

ওসব হ্যাপি খ্রীষ্টমাস-টাস্ চলবে না, নতুন কিছু লিখতে হবে, চীৎকার করে উঠলো সতেরো বছরের এডওয়ার্ড, মারজোরী ওটা ছিঁড়ে ফেল—

এত কষ্ট করে করলাম আমি, এখন ছিঁড়ে ফেললেই হ'লো!

কি লিখতে চাও তুমি এডওয়ার্ড? উরসুলা উৎসুক চোখে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

টেবিলে ঘুসি মেরে সতেরো বছরের এডওয়ার্ড জানালো, রেভ্যুলশনরি খ্রীষ্টমাস্!

হাসির ধূম পড়ে গেল। হাসতে হাসতে নোয়েল বললো, যীশু শান্তিপ্রিয় লোক—অতবড় প্রেমিক, তাকে রেভ্যুলশনরি বানাতে চাও?

যীশুকে কেন? ওই দিনটাকে, তো তো করে কক্‌নি পিটার বললো, ঠিক কথাই বলেছে এডওয়ার্ড!

এডওয়ার্ড সব সময় ঠিক কথাই বলে, উরসুলার চোখ ছেলের গর্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

আচ্ছা, আচ্ছা, দু'দিক বজায় রেখে আর্থার বললো, আসছে বছর থেকে আমরা রেভ্যুলশনরি খ্রীষ্টমাস্ করবো খ'ন—এখন 'হ্যাপি' তৈরী হয়ে গেছে কি না—ছিঁড়ে ফেললে মারজোরীর মন খারাপ হ'য়ে যাবে—

বেশ, শান্ত হ'য়ে সতেরো বছরের এওয়ার্ড বললো, টার্কির কি করলে তোমরা—এখনও তো এসে পৌঁছল না—

যা-দাম এ বছর টার্কির, আগুন একেবারে—তুমি ঘাবড়িও না এডওয়ার্ড, হেসে বললো হেলেন, ঠিক সময় নোয়েল টার্কি হাতে ঝুলিয়ে বাড়ি ফিরবে—আর্থার মদ কবে আনছো তুমি?

মারজোরী উত্তর দিলো, এর মধ্যেই এনে ফেলেছে, বোতলগুলো সাবধানে ওপরে রেখেছি, পাছে বাচ্চারা ভেঙে ফেলে ব'লে!

যাক্, সতেরো বছরের এডওয়ার্ড বললো, এখন টার্কি এসে পড়লেই সব আয়োজন পূর্ণ হয়—ওহে সুকুমার, পালাচ্ছ কোথায়? রোজ রোজ ফাঁকি দেয়া চলবে না তোমার—প্লেট ধুতে হবে।

নিশ্চয়ই, তোমরা তো কিছুই করতে দাওনা আমাকে—এখনি ধোব?

হ্যাঁ গো—এই মুহূর্ত্তে—

আহা, হেলেন বাধা দিয়ে ব'লে উঠলো, ও বেচারীকে খাটানো কেন? ওর পড়াশুনো আছে—শক্ত কোর্স—

এখন বড়দিনের ছুটিতে আবার পড়াশুনো কি? আবার চেঁচাতে আরম্ভ করলো সতেরো বছরের এডওয়ার্ড, আর আমার পড়াশুনো নেই? আমার বুঝি খুব সোজা কোর্স?

হেসে হেলেন বললো, তুমি তো পুচকে ছোকরা—ইস্কুলের পড়া আর সুকুমারের বিজ্ঞান—ফুঃ—

সুকুমার উঠে দাঁড়িয়ে বললো, সেই প্রভেদ দেখাবার জন্যে আমি এখুনি বৈজ্ঞানিক ভাবে সমস্ত প্লেট ধোব—এডওয়ার্ড যা সময় নেয়, তোমরা সকলে দেখ তার চেয়ে কত কম সময়ে ধুয়ে ফেলি আমি— প্লেট নিয়ে সুকুমার রান্নাঘরে এসে গরম জলের কল খুলে দিলো। কিন্তু বেশীক্ষণ নয়, একটু পরেই শব্দ ভেসে এলো, ঝন্ ঝন্ ঝন্!

হাঁ হাঁ ক'রে উঠলো অড্রি, মারজোরী, হেলেন, কি হ'লো সুকুমার?

একটা বোধ হয় ভাঙলো।

বোধ হয়? নিশ্চয়ই ভেঙেছে, সতেরো বছরের এডওয়ার্ড জোরে হেসে বললো, বৈজ্ঞানিক কায়দা যদি সুকুমার আরও দেখায় তাহ'লে বাড়িতে আর একটি জিনিষও থাকবে না কিন্তু—

খুব হয়েছে সুকুমার, অড্রি তার পাশে দাঁড়িয়ে ভাঙা প্লেট হাতে নিয়ে বললো, সরো, আমি ধুয়ে দিচ্ছি—

আমি খুব লজ্জিত—আর ভাঙবো না।

না বাপু, মারজোরী-হেলেন এক সংগে বললো, আমরা থাকতে তুমি কষ্ট ক'রে প্লেট ধোবে, সে-কি হ'তে পারে!

সুকুমারের রকম দেখে ওরা সকলে হাসি চাপছিল।

লাউঞ্জে বসে বড়দিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে ক্লোদ মাকে লম্বা

চিঠি লিখছিল। কয়লার আগুন জ্বলছে গম্ গম্ ক'রে—ত্ব'পাশে ত্ব'টো ইলেকৃট্রিক ফায়ার। বাইরে অবিশ্রাম বরফ পড়ছে। জানলার পুরু কাঁচ আর পর্দা ভেদ করে ঘরে ছুটে আসছে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলক। স্থকুমার জানতো না ক্লোদ লাউঞ্জে রয়েছে, তাহলে দরজায় ধাক্কা দিয়ে আসতো।

ওঃ দুঃখিত —

এসো স্থকুমার!

বিরক্ত করলাম না তো?

মোটেই না, চিঠি লেখা শেষ হ'লো আমার—তোমার কিছু কাজ নেই তো, তাহ'লে এসো গল্প করি?

ধন্যবাদ, অনেকদিন গল্প করা হয়নি তোমার সংগে।

পামেলা কেমন আছে?

ভালো।

স্থন্দর মেয়ে তোমার বন্ধু পামেলা।

ধন্যবাদ, ক্লোদ!

আচ্ছা স্থকুমার, একটু থেমে দু' এক মিনিট ওপরে তাকিয়ে থেকে ক্লোদ জিজ্ঞেস করলো, মায়া কি?

মায়া? অবাক হ'য়ে স্থকুমার বললো, মায়া কি?

ভারতীয় দর্শন পড়া নেই তোমার?

ও মায়া, তুমি কোথা থেকে জানলে, ক্লোদ?

আমি যে ফরাসী, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশীর ভাগ ছাত্র-ছাত্রী তোমাদের দর্শনের কথা জানে।

তাই নাকি?

কিন্তু তুমি ভারতীয়, তাই তোমার কাছ থেকে মায়ার কথা আরও শুনতে চাই?

সুকুমার বিপদে পড়লো, দেখ, আমি বিজ্ঞানের ছাত্র—দর্শন তো আমার একেবারেই পড়া নেই, শুধু এইটুকু জানি যে, মায়া মানুষের এক রকম ভ্রান্তি, যার জন্যে মিথ্যা জগতকে সত্য ব'লে মনে হয়।

শঙ্করাচার্যের কী গভীর দর্শন, একটু থেমে ক্লোদ বললো, আর বুদ্ধদেব! তোমাদের রাজপুত্র সিংহাসন তুচ্ছ ক'রে জ্ঞানের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছিলেন—

তুমি এত জান, ক্লোদ!

ফরাসীরা এ সব কথা খুব ভালো ক'রে জানে, সুকুমার—

অথচ আমাদের ধারণা যে, তারা শুধু ফুর্তি করে।

আমার অনুরোধ, সুকুমার, তুমি দয়া করে একবার ফ্রান্স ঘুরে এসো—যৌবনকে তারা দাবিয়ে রাখে না বটে, তবে সংগে সংগে সাধনাও করে। যৌবন আর সাধনা এই দুই নিয়ে ফ্রান্স—নিজেদের স্বার্থকে তারা কোন দিনও বড় করে দেখে না, তাই বারবার পৃথিবীর কাছে তাদের ঠকতে হয়, তবু চৈতন্য হয় না—আর এইখানেই তোমাদের ভারতবর্ষের সংগে ফ্রান্সের সবচেয়ে বড় মিল—

আর একবার সুকুমার বললো, তুমি এত জানো, ক্লোদ!

কই আর জানলাম—আরও কত জানতে চাই। তবে আজ আমার কেন জানিনা, সুকুমার, শুধু মনে পড়ছে বুদ্ধকে। তোমাদের রাজপুত্র প্রথম শুনিয়েছিলেন শান্তি আর অহিংসার বাণী। তবু আমরা সামান্য স্বার্থ ছাড়তে পারি না কেন? ত্যাগের মধ্যে যে আনন্দ তার তুলনা নেই—সেকথা মানুষ বোঝে না কেন!

মিঃ উইলিয়াম স্মইটকে সুকুমার পাঠালো একটা দামী কার্ড আর পামেলাকে একটা ভালো পুতুল। পোষ্ট আপিস থেকে বাড়ী ফিরে দেখলো পামেলা তাকে পাঠিয়েছে একটা হাতে বোনা নীল স্কার্ফ।

সেটাকে যত্ন করে নিজের ঘরে রেখে দিল সুকুমার। সেই দিন সন্ধ্যায় পামেলা এলো হেসেলমেয়ার রোডের বাড়ীতে।

তোমার উপহারের জন্যে ধন্যবাদ, পামেলা।

আমি জানতাম ওটা তোমার পছন্দ হবে।

তুমি ছাড়া আমার পছন্দ-অপছন্দ আর কে জানবে? কিন্তু তোমার বাবার সংগে বড়দিনের আগে দেখা করতে চাই—

যতই ছুতো কর আমাদের বাড়ীতে তুমি আর যেতে পাবে না—

হেসে সুকুমার বললো, এত ভয়?

সে-কথার উত্তর না দিয়ে পামেলা বললো, বাবা কিন্তু ভয়ানক পছন্দ করে ফেলেছেন তোমাকে, প্রায়ই তোমার খবর নেন।

করবেনই, বুদ্ধিমান লোক তো।

যাই বল, বাবাকে দু'চোখে দেখতে পারি না—ওকে সহ্য করতে পারি না আমি—

কেন?

দেখান যেন উনি কত বড় ভালমানুষ—ওঁর জন্যে মা মারা গেল—ওঁর জন্যে লেখাপড়া ছেড়ে আমাকে চাকরীতে ঢুকতে হ'লো—কোন কাণ্ডজ্ঞান আছে ওঁর?

পামেলার এমন রাগ কখনও দেখেনি সুকুমার, ও শুধু বললো, ছিঃ পামেলা, বাবার কথা অমন ক'রে বলতে হয় না—

কেন বলি সেকথা তুমি বুঝবে না—মাত্র একদিন দেখেই ওঁর স্বরূপ বোঝা যায় না, সুকুমার।

সুকুমার তাড়াতাড়ি কথা ঘুরিয়ে বললো, যাক্ বড়দিনে কি করবে—তুমি এখানে আসবে, না আমি তোমাদের বাড়ী যাবো?

আমি এখানে আসবো—বাবা চ'লে যাচ্ছে আপিসের কাজে হল্যাণ্ড!

ভালই হবে, পামেলা—তুমি থাক না এখানে এসে ও দু'দিন।

দেখি, কি হয়।

অত গম্ভীর হ'য়ে থেকোনা, ছোট মেয়ে নাকি তুমি ?

সুকুমারের কোলে মাথা রেখে পামেলা বললো, মার কথা মনে পড়েছে, বড়দিনের সময় তিনি মারা যান, আমাকে শক্ত ক'রে ধরো সুকুমার—যত জোরে পারো—

সেই রাত্রে পামেলা চ'লে যাবার পর নিজের মাকে মনে পড়লো সুকুমারের। না, এমন অভিমান ক'রে থাকার সত্যি কোন মানে হয় না। সুকুমার একটু বেশী খরচ তো করেছেই। মা তো কিছুই ভুল বলেন নি—মেয়ে হ'য়ে কেমন ক'রে পারবেন তিনি সমস্ত চালিয়ে নিতে। সব কথা সুকুমার তখন মা'কে খুব বড একটা চিঠি লিখলো —ছ' পেন্সের এয়ার-লেটারে নয়—শিলিং-এর টিকিট লাগিয়ে খামে।

মা-মণি,

বিজয়ার প্রণাম জানাইনি ব'লে রাগ হয়েছে! এখানে পাঁজি পাওয়া যায় না, মা-মণি—তারিখের কথা কেমন ক'রে জানবো! তবু তুমি কেমন ক'রে ভাবতে পারলে যে আমি ইচ্ছে করেই করিনি—তুমি কেমন ক'রে ভাবতে পারলে তোমার সুকু বাঁদর হয়েছে—মদের পিপেয় ডুবে আছে। তোমার বিজয়ার চিঠি প'ড়ে আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল! তাই এতদিন চিঠি লিখিনি—লিখতে পারিনি। তুমিও কেন আমাকে চিঠি লিখলে না। আমি নেই ব'লে তোমার কি একটুও কষ্ট হয় না—আমার কিন্তু তোমাদের ছেড়ে থাকতে খুব কষ্ট হয়।

কাপড-জামা করাবার কথা তুমি আজও ভুলতে পারনি। সত্যি বলছি, যদি দরকার না হ'তো তাহ'লে আমি কিছুতেই ওগুলো করাতাম না। এদেশের সংগে আমাদের দেশের তফাৎ অনেক—তাই আমরা এদেশে এসে একটু ঘাবড়ে যাই—বোকার মতো চলাফেরা করি। ঠিক তাল রাখতে বেশ অসুবিধা হয়।

একেই এদের ধারণা আমাদের দেশ গরীব—তার ওপর কালো রঙে, বাজে পোষাকে ক্যাবলার মতো ঘুরে বেড়ালে ভারতবর্ষের ওপর এদের ধারণা আরও খারাপ হয়ে যায়—যস্মিন দেশে যদাচার। সেটা না মানলে হাস্যাস্পদ হ'তে হয়, তাতে জাতের দুর্ণাম—দেশের দুর্ণাম।

জার্মাণ—আমেরিকান অন্য যে কোন জাত ঠিক তাল রেখে যায় অথচ মুস্কিল শুধু ভারতীয়দের। আমাদের যতই দোষ থাক সে-দোষ বাইরের লোককে জানতে দেব কেন · সুরুচির মূল্য এরা সব চেয়ে আগে দেয়—তাই সব দিক ভেবে আমাকে নতুন পোষাক, যা' এদেশে মানায়, করাতেই হয়েছিল—তা' না হ'লে কোথাও যেতে পারতাম না—লোকে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতো।

সাহেব-পরিবারে সুখে আছি ব'লে তুমি খুশী হও নি—লিখেছ সস্তায় বাঙালীদের সংগে ফ্ল্যাট নিয়ে থাকতে। তাতে ইংরেজ পরিবারের চেয়ে খরচ কিছুই কম পড়ে না মা, তার ওপর রান্না—বাজার করা এই সব হাঙ্গামা আছে—আমাকে একবারে পাশ করতেই হবে—ক্লান্ত হয়ে কলেজ থেকে এসে যদি একপাল লোকের সংগে রান্না করতে হয় তাহ'লে শক্ত কোর্সের ঠেলা সামলাবো কেমন করে—রান্নার পর আবার বাসন মাজা আছে। আরও একটা কথা, এসে যখন পড়েইছি তখন এদের মধ্যে থেকে এদের বিষয় জানা আরও কাজের কথা নয় কি? তুমি বলবে, ওদের কথা জেনে কি হবে? তাই যদি বল, তাহ'লে এত টাকা খরচ ক'রে এদেরই দেশে এদেরই পরীক্ষায় পাশ করতে এলাম কেন? তার ওপর অসুখ-বিসুখ নানা বিপদ-আপদ আছে—তখন এদেশের লোকের বাড়ীতে থাকলে এরা অনেক সুবিধার কথা ব'লে দিতে পারে—ক'রেও দিতে পারে—আমারও ভরসা হয়—সাহস হয়। এখন যেখানে আছি তারা আমাকে সংসারের একজন মনে করে—আত্মীয় ব'লে ধরে। আজকাল এমন পরিবারে থাকার সুযোগ কেউই পায় না—আমার ভাগ্য

ভালো, তাই পেয়েছি। তবু তুমি যদি বল, এ বাড়ী ছেড়ে দিতে, তোমার যা ইচ্ছে তাই আমি করবো।

এইবার খরচের কথা। খরচ এখানে যে কত বেশী সেকথা আমি তোমাকে এতদূর থেকে লিখে বুঝিয়ে বলতে পারবো না। শীতের দেশ—মোজা, গেঞ্জি, নানারকম জুতো—ওগুলো তো প্রায় কিনতে হয়—তার ওপর লণ্ড্রি খরচ—বাস-টিউবের খরচ—ভারতবর্ষের চেয়ে এখানে বাস-টিউবের অনেক বেশী। এক পয়সা বাজে খরচ না করলেও তিনশো টাকার কমে কিছুতেই চ'লে না—তাতে শুধু খাওয়া-থাকা ইত্যাদি হয়—এর ওপর বই খাতা আছে, কলেজের মাইনে আছে—লৌকিকতাও আছে। বন্ধু-বান্ধবকে বড়দিনের সময় ছোটখাটো উপহার না দিলে মান থাকে না—কেননা, তারাও উপহার দেয়—আমি সেগুলো কি কষ্টে কত সাবধানে পয়সা জমিয়ে করি তোমাকে বোঝাতে পারবো না। একটু ভদ্র ভাবে থেকে দু' একবার সিনেমায় গেলে চাই সাড়ে তিনশো টাকা—তার কমে বিলেতে থেকে কোন লাভ নেই—সারাদিন ঘরে বসে বন্দী-জীবন কাটাতে হয়।

আমি তোমার কাছে চারশো পাউণ্ড বরাবর চাইনি—বড়দিন ব'লে, নিজের সার্ট, জুতো, মোজা কিনবো ব'লে একবারই চেয়েছিলাম।

এদের দেশে থেকে—এদের মধ্যে থেকে আমি যদি সব সময় আলাদা থাকি—সব সময় মনে করি আমি বিদেশী--তাহ'লে মনের অবস্থা কতদূর খারাপ হবে—তোমাদের কথা মনে প'ড়ে কি ভাবে দিন কাটবে, সেকথা সহজেই বুঝতে পারবে। তাহ'লে পড়াশুনো করবো কেমন ক'রে। মন খারাপ হ'লেই তো ফিরে যাওয়া যাবে না—আর পাশ না ক'রে গেলে তোমার মুখের দিকে তাকাবো কেমন ক'রে?

তোমাকে বেশী চিঠি লিখিনা কারণ সত্যি সময় কম। সকালে শীতের দেশে একেবারে সময় থাকে না—কলেজ থেকে ফিরে খাওয়া-

দাওয়া সেরে পড়তে বসি। আজ লিখবো—কাল লিখবো ক'রে দেরী হ'য়ে যায়—তুমি কেন ভাবলে তোমার কথা ভাবি না।

যাহোক্, আর রাগ করো না মা-মণি—চিঠি পেয়েই উত্তর দিও। তা না হ'লে সত্যি বাঁদর হবো কিন্তু বলে দিলুম।

তারপর সুকুমার মণ্টু, ঘণ্টু, ছায়া, রাণুকে সেই একই খামে চিঠি লিখে খাম বন্ধ ক'রে এয়ার মেল লেবেল লাগিয়ে ঘুমোতে গেল।

বড় দিন হ'য়ে গেল। পয়লা জানুয়ারী কলেজ খুললো সুকুমারের। প্রথম পরীক্ষার ফল খুব ভালো হয়েছে—এত ভালো যে সে নিজেও অবাক হ'লো। ক্লাশে সব ছাত্রদের মাঝে প্রফেসার রবিনসন খুব প্রশংসা করলেন সুকুমারের। তাই শুনে অনেক ছাত্র আলাপ করলো সুকুমারের সংগে—যারা আগে তার সংগে কোন দিন কথা বলেনি—ইণ্ডিয়ান বলে প্যাট প্যাট ক'রে তাকিয়ে থাকতো শুধু। সুকুমারও এবার সুযোগ পেয়ে মাতব্বরী চালে হাসলো—যেন এতে সে আশ্চর্য হয়নি মোটেই—এটা তার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। প্রফেসার রবিনসন্ আরও জানালেন যে গরমের সময় তাকে যন্ত্রপাতি দেখে কাজ শেখবার জন্যে কারখানায় কাজ করতে যেতে হবে—হয় তো লণ্ডনের বাইরে যেতে হবে। মাস কয়েক থাকতে হবে সুকুমারকে। থাকবার জায়গার জন্যে যেন কিছু ভাবনা না ক'রে—সে সব বন্দোবস্ত কলেজ করবার চেষ্টা করবে। লণ্ডনের বাইরে যাবার কথা শুনে মন খারাপ হ'য়ে গেল সুকুমারের—পামেলাকে ছেড়ে কেমন ক'রে থাকবে সে।

জানো পামেলা, সেই দিনই বিকেলে বললো সুকুমার, গ্রীষ্মকালে আমাকে লণ্ডনের বাইরে চ'লে যেতে হবে কয়েক মাসের জন্যে—

কেন ?

কারখানায় কাজ করতে।

বাঁচবো আমি—কত দিনের জন্যে ?

তা প্রায় আট মাস।

বাঃ, আমার তাহ'লে হবে লম্বা ছুটি—কিন্তু অমন মুখ ক'রো না সুকুমার, গ্রীষ্মের এখনও অনেক দেরী—এটা তো সবে শীত !

ফ্যারাডে হাউসের কাছে 'জলি' চায়ের দোকানে ঢুকতেই মিঃ বিজন ঘোষের সংগে দেখা—সেই সুকুমারকে মার্চমণ্ট ষ্ট্রীটের গ্রীণ কাফেতে যে ঠাট্টা করেছিল। সুকুমার তাকে যেন চেনেনা, এমন ভাব ক'রে এগিয়ে যাচ্ছিল, কারণ অনেকবার রাস্তায় দেখা হ'লেও মিঃ বিজন ঘোষ তাকে যেন দেখেও দেখতো না। আজ কিন্তু এক গাল হেসে সে সুকুমারদের টেবিলে এসে ব'সে পড়ে বললো, বসতে পারি ? আপনি তো আমাকে চিনতেই পারেন না, স্যার—আমার নাম মিঃ বিজন ঘোষ—

সুকুমার অগত্যা আলাপ করিয়ে দিল, পামেলা সুইট।

ভারী মিষ্টি নাম তো—তা' সুকুমারবাবু একদিন আসুন আমাদের বাড়ী—মাছের ঝোল ভাত খাওয়াবো—

বেশ—

হেঁ হেঁ, এঁকেও নিয়ে আসবেন—ভারী মিষ্টি নাম—মিঃ বিজন ঘোষ পামেলাকে মোলায়েম গলায় জিজ্ঞেস করলো, দিশি খাওয়া খেতে কোন আপত্তি আছে নাকি, মিস্ সুইট ?

মোটেও না—খুব খুশী হবো।

বেশ হেঁ হেঁ হেঁ, শীগগিরই বলবো আপনাদের, নোট বুক বের ক'রে মিঃ বিজন ঘোষ বললো, তোমার ফোন্ নম্বর কত, মিস্ সুইট—ফোনেই নেমন্তন্ন করবো কিন্তু—

পামেলা বললো, গ্রীনিচ ১১১২।

সেটা লিখে মিঃ বিজন ঘোষ বললো, ওঁকে খবর দিলেই তো আপনিও খবর পাবেন ওঁর কাছ থেকে—তাই আপনার নম্বর লিখলাম না, সুকুমারবাবু—আচ্ছা আজ চলি, শীগ্‌গিরই খবর দেবো, বিদায় মিস্ সুইট—আমার নাম মিঃ বিজন ঘোষ।

সে চ'লে যেতেই পামেলা বললো, এত ইচ্ছে আমার ইণ্ডিয়ানদের সংগে আলাপ করবার অথচ তুমি কারুর সংগে আলাপ করিয়ে দাও না আমার—

আমি তোমাকে ছাড়া কাউকে চিনিনা, পামেলা।

অনেক লোকের সংগে মিশে তোমাদের দেশের আচার-ব্যবহার আমি খুব ভালো করে জানতে চাই—

সে-যখন আমার সংগে ভারতবর্ষে যাবে তখন জানবে কিন্তু তোমার বন্ধু-বান্ধব কারুর সংগে তুমিও তো আমার আলাপ করিয়ে দাওনি আজও?

দু'টি তো মোটে বন্ধু আমার, ডায়না আর জ্যাকলীন। তারা এত দেখতে চায় তোমাকে অথচ তাদের যখন সময় তোমার তখন সময় হয় না, আর তারা যখন ব্যস্ত তোমার তখন অবসর, কেমন ক'রে আলাপ করাবো বল?

আমার কথা ওদের সকলকে বলেছ বুঝি?

ওরা কোথা থেকে খবর পেয়েছে আমার সংগে নাকি আজকাল একজন ভারতীয় রাজকুমারের আলাপ হয়েছে।

হেসে সুকুমার বললো, আমাকে রাজকুমার বানালে?

কিন্তু তুমি কি তাতো আমি আজও জানলাম না, দেশের কথা কিছুই তুমি আমাকে ব'লতে চাও না—

কি জানতে চাও, পামেলা?

তোমার মা দেখতে কেমন, তোমার ভাইবোনেরা কেমন?

আর আমি কেমন সেটা জানতে চাও না ?

একটুও উৎসাহ নেই আমার তোমার সম্বন্ধে, বল কবে তুমি আমাকে তোমার আত্মীয়দের ছবি দেখাবে ?

সুকুমার বললো, মা'র ছবি তোমায় দেখাতে পারবো না, কারণ তিনি কখনও ছবি তোলান না, ভাইবোনদের ছবি পাঠিয়ে দিতে বলবো।

তাদের ব'লো আমায় চিঠি লিখতে।

ওরা তো অত ইংরেজী জানে না, পামেলা।

যা-হয় লিখতে বলো তবু।

বলবো, গম্ভীর হ'য়ে সুকুমার বললো।

যতই দিন যেতে লাগলো শীত ভারী হ'তে লাগলো তত। একদিন এত বরফ পড়ল যে দু'শো বারো নম্বর বাস বন্ধ হ'য়ে গেল। বাড়ী থেকে বেরিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপ্টায় সুকুমারের নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে যাবার উপক্রম হ'লো। তুষার-পিছল পথে বার কয়েক আছাড় খেয়ে ফিনস্‌ব্যারী পার্ক টিউব স্টেশনে হেঁটে আসতে হ'লো সুকুমারকে। এমন প্রায়ই করতে হ'লো তাকে আর ইচ্ছের বিরুদ্ধে কয়েকটা ক্লাশ প্রকৃতির বিপক্ষতায় কামাই করতে হ'লো। নাঃ, সুকুমার অবশেষে ধ'রে নিলো, ইংল্যাণ্ডের সব কিছু হয় তো সে জয় করতে পারে কিন্তু শীত? অসম্ভব। বড় কাবু ক'রে ফেলেছে তাকে এরই মধ্যে। ফেব্রুয়ারী মাসে নাকি ঠাণ্ডা আরও বেড়ে যাবে। আর কেমন ক'রে বাড়তে পারে সেকথা ভেবে পেল না সে। আর এমনি এক হাড়-কাঁপানো শীতের রাত্তিরে এক ভীষণ বিপদে পড়লো সুকুমার।

লাউঞ্জে অনেক আগুন আর সব কটা এক সংগে জ্বলে, তাই শোবার আগে সকলে অনেকক্ষণ সেখানে ব'সে থাকে। সাপারের পর সুকুমারও

আজকাল বই হাতে নিয়ে সেখানে থাকে। যথা রীতি আজও নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে ছিল। এমন সময় ওরে বাবা, ঘটলো অকস্মাৎ সেই ভীষণ বিপদ।

আর্থার প্রথমে কথা তুললো, কি সুকুমার হুঁ ?

কি ? কিছু বুঝতে না পেরে সুকুমার জিজ্ঞেস করলো।

কি ? হুঁ ? খুব যে বলেছিলে—

কি বলেছিলাম ?

যে শীতকালে রোজ চান করবে ?

করি তো—আমি তো প্রায়ই চান করি।

প্রায়ই চান কর—শেষ চান কবে করেছ, বাছাধন ?

এই তো কাল করলাম।

কাল ? হুঁ ?

হুঁ কাল।

ঠিক বলছো ?

মানে কাল কি পরশু—

হেলেন হেসে বললো, পরশু তো তুমি রাত এগারোটায় বাড়ী ফিরে ছিলে, সুকুমার ?

তাতে কি হয়েছে, ফিরেই চান করলাম।

কই, অড্রি বললো, আমি তো বারোটা অবধি জেগেছিলাম, চান করার শব্দ পাই নি তো ?

কি বল অড্রি, তুমি নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছিলে, আমি হুস্ হুস্ ক'রে এক ঘণ্টা ধরে চান করলাম—শব্দ পাওনি ?

আর্থার এবার উঠে এসে সুকুমারের হাত ধ'রে বললো, দেখ সুকুমার, ওসব গুল-তাল রাখো, আমরা সকলে মিলে আজ দু' মাস ধ'রে তোমার ওপর চোখ রাখছি আর আমি ডাইরীতে লিখে রেখেছি তুমি শেষ চান

করেছ তেসরা নভেম্বর, আজ হ'লো দশই জানুয়ারী বুঝেছ? কাজেই ওঠো, আর্থার তার হাত ধ'রে টানলো।

উঠবো কেন?

ওঠো ওঠো, চান করতে চ'লো!

আজ এই শীতে--কি যে বল আর্থার!

সুকুমারের অবস্থা দেখে সকলে হাসছে।

ওঠো, সুকুমার—

কাল ঠিক করবো।

কাল আরও ঠাণ্ডা হবে।

না না, কাল ঠিক চান করবো, যতই ঠাণ্ডা হোক।

মানে কাল তুমি তাহ'লে দেরী ক'রে বাড়ী আসবে, মারজোরী বললো, আজই ওকে জোর ক'রে বাথরুমে নিয়ে যাও, শেষে কি চান না ক'রে রোগে পড়বে।

হাঁ্যাচ্চো ক'রে সুকুমার হাঁচলো, দু'একবার রুমালে নাক ঝেড়ে বললো, আজ শরীরটা ভালো নেই, সর্দি হচ্ছে, একটু জ্বরও হয়েছে—

চান করলে সব ঠিক হ'য়ে যাবে এসো সকলে, আমাকে সাহায্য করো—

এইবার এক কাণ্ড হ'লো। মারজোরী অড্রি আর্থার আর পিটার চ্যাং-দোলা ক'রে সুকুমারকে এনে ফেললো বাথরুমে। তারপর তোয়ালে সাবান ইত্যাদি এনে বললো, নাও, আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছি, শুধু মাথায় জল দিয়ে বেরিয়ে এসোনা, খুব শব্দ ক'রে চান করবে শব্দ না হ'লে আমরা গিয়ে তোমাকে চান করিয়ে দেবো।

আর সুকুমারের মনে হ'লো এ একটা মনে রাখবার মতো রাত বটে। কি কুক্ষণে যে মুখ ফুটে এদের সামনে বলেছিল, শীতকালে রোজ চান করবে।

রাত্তির প্রায় সাড়ে দশটায় সুকুমারের দরজায় কে যেন খুব জোরে বার বার টোকা মারলো—ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্। এমন ক'রে আজ অবধি কেউ দরজায় শব্দ করে নি। ব্যস্ত হ'য়ে তাড়াতাড়ি ড্রেসিং গাউন ঠিক ক'রে সুকুমার দরজা খুললো।

পামেলা। তুমি—এত রাত্রে? পামেলা তার মুখ দেখে ভয় পেল সুকুমার। কোথায় গেল ওর হাসি। সুকুমারের বুকে মাথা রেখে দুই হাত দিয়ে শক্ত ক'রে ওকে ধ'রে পামেলা কাঁপছিল।

কি হয়েছে, প্যাম? তুমি এমন করছ কেন?

কার সংগে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলে সুকুমার—এ কেমন বন্ধু তোমার?

কে আমার বন্ধু, পামেলা?

ওই মিঃ বিজন ঘোষ—আমাকে ফোন ক'রে দিশি খাওয়াবে ব'লে নেমন্তন্ন করে—আমি ভাবলাম তুমিও আসবে—ওর ঘরে তোমাকে না দেখে জিজ্ঞেস করলাম, সুকুমার কই? ও বললো, ছোট ঘর, দু'জনকে খাওয়াতে অসুবিধা—সুকুমারকে অন্য আর এক দিন বলবো—

তারপর?

তারপর এক সময় খাটে ও আমার পাশে এসে বসলো, ঘাড়ে হাত রাখলো—তারপর—হঠাৎ চুমু খেয়ে বললো, আমি তোমাকে ভালবাসি—এ রকম ভারতীয় বন্ধু তোমার আর ক'টি আছে যারা ভদ্র ব্যবহার জানে না?

লজ্জিত হয়ে সুকুমার বললো, ও আমার বন্ধু নয়, পামেলা। আমি ওকে একেবারেই চিনি না, মাত্র একদিন দেখেছিলাম। ও রাস্তায় আমাকে দেখেও দেখতো না। সেদিন 'জলি'তে তোমাকে দেখে বোধহয় দেখালো যেন আমার বন্ধু।

ছি ছি, নির্লজ্জ!

ওকথা তুমি ভুলে যাও পামেলা, সুকুমার ওকে ধরে খাটে বসালো, তারপর বললো, বল কি কি খেলে তুমি ?

খাবো ? আমি লোকটাকে ধাক্কা মেরে তোমার কাছে ছুটে এলাম, যা রাগ হয়েছিল আমার তোমার ওপর—

বাঃ, আমি কি করলাম ?

আমি ভেবেছিলাম ও তোমার বন্ধু—

হেসে সুকুমার বললো, কেমন ক'রে ভাবলে তুমি সেকথা ? আমার বন্ধু তোমার অসম্মান করতে পারে কখনও—যাক্ রাগ পড়েছে তো ?

না।

আমাকে দেখে ?

তোমাকে দেখতে চাইনা আমি।

তাহ'লে এই রাত্তির সাড়ে দশটায় এত দূরে কাকে দেখতে এলে তুমি ? আর কোন বন্ধু আছে নাকি তোমার এ-পাড়ায় ?

সুকুমার, তুমি একটা পশু।

যাক্, তোমার খাওয়া হয়নি এখনও, কি খাবে বল ?

কিচ্ছু না, আমাকে বাড়ী যেতে হবে এখুনি, পামেলা উঠে দাঁড়ালো।

না খেয়ে তুমি যেতে পাবে না প্যাম্, উপবাসীকে অন্ন না দেয়া ভারতীয় রীতিবিরুদ্ধ !

এটা ভারতবর্ষ নয়—ইংল্যাণ্ড।

কিন্তু তুমি উপবাসী আর আমি ভারতীয়—তোমাকে আমি অন্ন দেবোই।

রাত্তির হ'য়ে গেলে আমি ট্রেন পাবো না, বাস্ মিস্ করবো।

কিন্তু হে আমার রাণী, তুমি তো মাঝ-সমুদ্রে পড়ে নেই, তুমি আছো তোমার শ্রেষ্ঠ বন্ধুর ঘরে—মিস্ করলে ক্ষতি কি ?

তার মানে ?

মানে, এখানে আজ তোমাকে থেকে যেতেই হবে।

কখ্খনো না, ডোণ্ট বি সিলি।

আমি তোমাকে যেতে দেবো না। এই রাত্তিরে একা একা, অভিনয়ের সুরে সুকুমার বললো, কোন প্রাণে আমি তোমাকে ছেড়ে দেবো বল ? বল তো সংগে যাই ?

না, অত দয়ায় আমার কাজ নেই—এক অভদ্র ইণ্ডিয়ানের হাত এড়িয়ে পড়লাম আর এক ইণ্ডিয়ানের খপ্পরে—

কিন্তু বন্ধু, এ ইণ্ডিয়ান হঠাৎ ক'রে তোমার ঘাড়ে পড়ে কোন দিনও বলে নি, আমি তোমাকে ভালবাসি—

কারণ এটি গভীর জলের মাছ—তার চেয়ে মিঃ বিজন ঘোষ অনেক ভালো।

কিন্তু কেন তার দাম তুমি দিলে না, অভিনয়ের সুর বজায় আছে সুকুমারের, সত্যি কথাটা সহজ ভাবে সে প্রকাশ করতে সাহস পেয়েছে, তোমাকে দেখলে কার না ভালবাসতে ইচ্ছে হয়? তুমি যে যুগ-যুগান্তরের ভালোবাসার ধন, পামেলা—

আচ্ছা আমি চললাম—

আমি তোমাকে যেতে দেবো না—দেবো না—আমাকে একা ফেলে তুমি যেও না, পামেলা—

তোমার একটা কাণ্ডজ্ঞান নেই, সুকুমার—আমার মান-সম্মানের কথা খুব ভাবো তুমি—এ-ঘরে তোমার সংগে থাকলে কি ভাববে তোমার বাড়ীর লোক ?

উঃ, কী ছোট মন ! আমি কি একবারও বলেছি যে তুমি আমার ঘরে থাকবে ?

তবে ?

উরসুলার ঘরে—তার ঘর শনি-রবিবার ছাড়া সব সময় খালি—

হেসে পামেলা বললো, একথাটা আগে বলনি কেন?

ইচ্ছে করে। ভেবেছিলাম আমার ঘরে থাকতে রাজী হবে।

বদমাইস—পশু—

কিন্তু সুকুমার তখন ঘর থেকে বেরিয়ে খুব আস্তে হেলেনের দরজায় টোকা মারছে।

নীল ড্রেসিং-গাউন পরে হেলেন মুখ বাড়ালো, কি ব্যাপার্ সুকুমার?

আমি ভয়ানক দুঃখিত হেলেন, তোমাকে বিরক্ত ক'রে—কিন্তু আমার ভয়ানক বিপদ।

তাড়াতাড়ি নোয়েল এসে বললো, কি বিপদ?

মানে, পামেলা ট্রেন মিস্ করেছে—উরসুলার ঘরে ও আজ থাকতে পারে?

ওরা হেসে বললো, এই বিপদ?

আর এক বিপদ—ওর কিছু খাওয়া হয় নি।

খুব বড় বিপদ বল তোমার—হেলেন বললো, আমি রান্নাঘরে যাই—চীজ রুটি অনেক কিছু আছে—

আহা হেলেন, তুমি কষ্ট করে নিচে যাবে কেন? সে কিছুতেই হতে পারে না—আমি যাচ্ছি।

হেসে হেলেন বললো, না বাপু কাঁচের থালা-বাসন তোমাকে আর ছুঁতে দেয়া হবে না—তুমি ঘরে গিয়ে ব'সো, আমি পামেলার খাবার ওপরে নিয়ে আসছি—কি খাবে ও? চা না কফি।

যা—হয়—শুধু শুধু তোমাকে কষ্ট দিলাম হেলেন।

কিছু না, সুকুমার।

একটু পরে হেলেন ওপরে এলো—সুকুমারের জন্যেও এনেছে কফি আর চকলেট-বিস্কুট।

পামেলার ঘরে গ্যাস্ জ্বেলে দিয়েছি, একটু গরম হোক ঘরটা—পামেলা জানো কোনটা উরস্থলার ঘর ?

হ্যাঁ।

আচ্ছা খাও তোমরা, তারপর এগুলো আমি নিচে নিয়ে যাবো।

সে কি ? পামেলা বললো, আমরা রেখে দেবো—তুমি শুতে যাও হেলেন—অনেক রাত্তির হয়েছে।

কিন্তু সাবধান—স্থকুমারের হাতে প্লেট দিও না যেন—ও যদি বৈজ্ঞানিক কায়দায়—হেলেন হেসে পামেলাকে বললো সে-গল্প।

আর একটু থাকো, প্যাম্ !

আর এক মিনিটও নয়।

ওই দেখ পামেলা, স্থকুমার জানলার পর্দা সরিয়ে দিলো, সারা রাত ওরা জ্বলে।

কবে যাবো আমরা আলেকজান্দ্রা প্যালেস দেখতে ?

যাবে আজ ?

হেসে পামেলা বললো, এই রাত্তিরে—বড় শীত যে—ওই যাঃ, বাবাকে ফোন করা হ'লো না—তুমি ব'লে দেবে স্থকুমার ?

কি বলবো ?

যে আমি আজ এখানে থাকবো।

তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, পামেলা ? তোমার বাবাকে আমি বলবো যে, মশাই আপনার মেয়ে আজ আমার সংগে রাত্রিবাস করবে—ওরে বাবা—আমি কিছুতেই তা পারবো না।

কী ভাবা তোমার ! আমিই যাই তাহ'লে, দরজার কাছে গিয়ে পামেলা বললো, গুড নাইট স্থকুমার, আমি আর ওপরে আসবোনা।

সুকুমার তখনো তাকিয়েছিল সেই আলোগুলির দিকে। বিদ্যুৎবেগে ফিরে বললো, ফিরে এসো, প্যাম্!

গুড নাইট!

কী নিষ্ঠুর তুমি!

গুড নাইট।

শুভরা—আত্রি!

দিন যেন ভেসে যায়। ঝড়ো হাওয়ায় উড়ে যায় মাস। শীত চলে গেল। ফুল ফুটলো এপ্রিলে। নতুন পাতারা ঝলমল করে উঠলো। সুরু হলো কত রাবনের আনাগোনা। হাল্কা রোদ্দুরের ছোঁয়ার দিশা হারালো লণ্ডনবাসী।

খুব ভোরে ঘুম ভেঙে যায় সুকুমারের। চোখ খুলে চুপ করে শুয়ে থাকে সে। একটু পরে জানলার পর্দা সরিয়ে দেয়—উঠোন ভরে গেছে ঘাসে ঘাসে আর সবুজ মখমলের ওপর তবুও ঝরেছে মৃদু শিশির। হেমন্তের কথা মনে পড়ে যায়।

এমনি এক নতুন গ্রীষ্মের ভোরে কলিংবেল্ বাজলো। কারুর হয়তো ভাঙেনি ঘুম। বার বার বাজলো বেল্ কিন্তু সাড়া দিলো না কেউ। সুকুমার উঠলো। ড্রেসিং-গাউন গায়ে জড়িয়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে নিচে নেমে এসে দরজা খুলল। দু'জন পুলিশ—গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে তাদের ভ্যান্।

সুকুমারকে দেখে বেশ অবাক হ'লো তারা। কিন্তু সে কয়েক মুহূর্ত মাত্র—সুপ্রভাত জানিয়ে একজন জিজ্ঞেস করলো, তোমাকে কষ্ট দেবার জন্যে আমাদের মাপ ক'রো, এ বাড়ীতে পিটার সিনক্লেয়ার বলে কেউ থাকে?

হ্যাঁ।

তাকে দয়া করে একবার নিচে আসতে বলবে ?

নিশ্চয়ই, তোমরা ভেতরে এসো, লাউঞ্জের দরজা খুলে সুকুমার তাদের বসতে বললো। তারপর সোজা তেতালায় এসে ধাক্কা মারলো অড্রি-পিটারের দরজায়।

পিটার যে-অবস্থায় ছিল ঠিক সে-অবস্থায় ভ্যানে চড়ে চলে যেতে হলো তাকে। তার নামে বেরিয়েছে বডি ওয়ারেণ্ট। গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল ওরা তাকে।

সুকুমার ছাড়া কারুর মুখ দেখে বোঝা গেল না যে তাদের এ বিষয়ে কোন কৌতূহল আছে। সংসারের কাজ যেমন চলে ঠিক তেমনি চলতে লাগলো।

সেদিন ব্রেকফাষ্ট তৈরী করার পালা ছিল অড্রির। হেলেন বললো, আজ আমি বরং ব্রেক্‌ফাষ্ট করি, অড্রি ?

না, গম্ভীর মুখে বললো অড্রি, আমার যখন পালা তখন আমিই করবো।

একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেল সুকুমার। এ কেমন মেয়ে! স্বামীকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল অথচ অড্রির মুখ দেখে কিছু বোঝবার উপায় নেই।

ব্যাপারটা জানা গেল দিন কয়েক পর। যুদ্ধের আগে পিটার কিছুদিন ছিল ডেনমার্কে। কোপেনহেগেনে রুথ্ ট্যাক্‌লারসন ব'লে একটি মেয়েকে সে বিয়ে করে। বিয়ের কিছুদিন পর কি একটা কাজে পিটার চলে এলো আবার লণ্ডনে। বাধলো যুদ্ধ। আর ডেনমার্কে ফিরে যাওয়া সম্ভব হলো না পিটারের—ইচ্ছেও ছিল না ফিরে যাবার। বিয়ের ব্যাপারটা ও ইচ্ছে করেই ভুলে গেল। যুদ্ধের পর বিয়ে করলো অড্রিকে। কেউ জানতো না তার ডেনমার্কে বিয়ের খবর। কিন্তু রুথের বাবা খোঁজ আরম্ভ করলো পিটারের। একমাত্র মেয়ে তার, আর

সে পিটারকে ভালওবাসে খুব। সমস্ত ব্যাপার খোঁজ নিয়ে জানা গেল। রুথের বাবা রেগে আগুন—খুব সহজেই প্রমাণ পাওয়া গেল। মস্ত বড় অপরাধ। পিটার হ'লো গ্রেপ্তার—জেলে হ'লো তার স্থান। বেশ কিছুদিন তাঁকে থাকতে হবে সেখানে।

খবর পেয়ে অড্রির মা বাবা মিঃ ও মিসেস হল্ মেয়েকে তাদের কাছে ফিরিয়ে নিতে এলেন। কিন্তু অড্রি গেল না কিছুতেই। বললো, বাড়ীর শেয়ার আমার নামে—আমি এখানেই থাকবো। শর্টহ্যাণ্ড জানতো সে। কোন এক আপিসে টাইপিষ্টের চাকরী নিলো অড্রি।

সুকুমারের সংগে রোজ সকালে একসংগেই বাড়ী থেকে বার হয় অড্রি। দুশো বারো নম্বর বাস ধরে ফিনস্‌বেরী পার্কে আসে—একই ট্রেনে চড়ে ওরা দু'জনে। সুকুমারের পরের ষ্টেশন হবোনে নেমে অড্রি ব্যাগ দুলিয়ে আপিস যায়? কে দেখলে বলবে যে তার স্বামী জেলে পচছে?

সুবিকাশকে একদিন রাত্তিরে খেতে বললো সুকুমার। পামেলাকেও বলেছিল কিন্তু সে আসতে পারলো না—মিঃ স্মইটের শরীর ভাল নেই—তার জন্যে কি সব আলাদা রান্না করতে হবে। সুকুমারের বাড়ীর হালচাল দেখে সুবিকাশের চক্ষু ছানাবড়া। বললো, বড় সুখে আছেন মশাই, আমাকেও একটা দেখে দিন না এ রকম জায়গা—

কিছুদিন আগে হলে আমারই ঘরটা আট মাসের জন্যে আপনাকে দিয়ে যেতে পারতাম!

আপনি কোথায় যাবেন?

আমি যাবো ফ্যাক্টারীতে ট্রেনিং নিতে—বেশ দূর—ল্যাঙ্কেশায়ারের একটা শহর—নাম প্রেষ্টন।

আপনার ঘরে কে আসছে?

এদেরই এক আত্মীয়—আমি ফিরে আসবার দিন পনেরো আগে চলে যাবে।

আর একবার বললো সুবিকাশ, খুব সুখে আছেন মশাই।

আপনার খবর বলুন, সুবিকাশ বাবু, কেমন লাগছে এদেশ?

খুব ভালো—তবে আমার দুর্ভাগ্য আমি যেন এদেশে থেকেও নেই।

কেন?

আর বলেন কেন, করুণ চোখে সুকুমারের দিকে তাকিয়ে বললো সুবিকাশ, কি যে ছেলেমানুষী করেন বাপ-মা! আমার জীবন নিয়ে তারা ঠিক ছেলেখেলা করেছেন। বিয়ে দিয়ে কাউকে পাঠাতে হয় এদেশে?

কেন তাতে ক্ষতিটা কি?

ম্লান হেসে সুবিকাশ বললো, সেকথা আপনার পক্ষে বোঝা মুস্কিল হবে সুকুমার বাবু, আপনি বুঝতে পারবেনও না, একটু থেমে আবার আরম্ভ করলো সে, উঃ কী করুণ অবস্থায় ঠেলে ফেলে দিয়েছেন আমাকে আমার বাবা—বিয়ে করে আমি কিছুতেই আসতে চাই নি। আর বিয়ে করে এসে কি লাভ আমার হলো? না পারি পড়াশুনোয় মন দিতে—না পারি প্রাণখুলে এদেশের মেয়েদের সংগে মিশতে। অথচ আপনারা সবাই সুখী—চারপাশে আনন্দ—এত যৌবন—অথচ আমার যেন বার্দ্ধক্য এসেছে—কিছুতেই তাল মেলাতে পারি না।

বিয়ে ক'রে এলেও তাল মেলাতে আপনার ক্ষতিটা কি?

সে হয় না সুকুমার বাবু, মনের কোণায় কোথায় যেন একটা কাঁটা বিঁধে থাকে—মনে হয় অপর পক্ষ বিরহে কাল কাটাচ্ছে আর আমি এখানে ফূর্তি করছি। কিন্তু এই যে বিয়ে দিয়ে বাপ মা দায় মুক্ত হয়েছেন—অথচ আমি যদি এখন এখানে আর একটা বিয়ে করি—তা'হলে একটি নিরীহ মেয়ের জীবন নষ্ট করে দেয়ার জন্যে কে দায়ী হবে? আমি না আমার বাপ-মা?

কথাটা ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করে সুকুমার বললো, যাবার আগে ভেবেছিলাম পামেলার সংগে আপনার আলাপ করিয়ে দেব, কিন্তু আজ আসতে পারলো না ও—যাকগে ইংল্যাণ্ডে দিন কত তাড়াতাড়ি কাটে জানেন তো—আট মাস দেখতে দেখতে কেটে যাবে—তখন ভালো করে আলাপ হবে এখন।

ডিনারের ঘণ্টা পড়লো। সুবিকাশকে সংগে নিয়ে নিচে নেমে এলো সুকুমার। আজ ডিনারের ভার মারজোরীর।

সাপারের পর কোন এক সন্ধ্যায় অড্রি এল সুকুমারের ঘরে। ও যেন চোরের মতো এসেছে—বারবার পিছন ফিরে দেখলো কেউ ওকে এঘরে আসতে দেখেছে কি-না।

সুকুমার, আর একটা কথা ঠিক করে বলবে?

কিছু বুঝতে না পেরে বেশ অবাক হয়ে সুকুমার বললো, কি কথা, অড্রি?

তার প্রায় কানের কাছে মুখ এনে বললো অড্রি, তুমি ঠিক বলেছিলে, একেবারে ঠিক যে খুব শীগগির আমার মা বাবার সংগে মিটমাট হয়ে যাবে—তাঁরা আমাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছিলেন। সুকুমারের সামনে হাত মেলে দিয়ে সে বললো, কাউকে ব'লো না কিন্তু, চুপে চুপে আমার হাত দেখে বল তো পিটার কার কাছে ফিরে আসবে? আমার কাছে না ওর আগের স্ত্রীর কাছে?—ওকি সুকুমার—চুপ করে আছো যে—বল—

বিদ্যুৎ-শিহরণ খেলে গেল সুকুমারের শিরায়-শিরায়। অড্রির হাত ছেড়ে দিয়ে ও দু'পা পিছিয়ে এলো। বলতে যাচ্ছিল, আমি হাত দেখতে জানি না—তোমার সংগে সেদিন ঠাট্টা করেছিলাম, সব বাজে। কিন্তু অড্রির মুখের দিকে তাকিয়ে সে কথা বলতে পারলো না সুকুমার। শুধু বললো, পিটার তোমারই কাছে ফিরে আসবে, অড্রি!

দ্বিতীয় বছর

শুধু কারখানার একঘেয়ে শব্দ। কাছেই রিবল্ নদী। ইংল্যাণ্ডের উত্তরে ল্যাঙ্কেশায়ারের শহর—প্রেষ্টন্।

মিস্ ফিসারের বাড়ীতে সুকুমারের জায়গা হলো। দোতালায় তার ছোট ঘর। মনের মতো করে ঘর সাজিয়ে ফেললো সে। ম্যাণ্টেল্‌পিসে ফটো ফ্রেমে রাখলো পামেলার ছবি। কারখানার বেশ কাছে মিস্ ফিসারের বাড়ী। তাকেও খুব ভালো লাগলো সুকুমারের। থুরথুরে বুড়ি—সংসারের সমস্ত কাজ নিজে করে আর তার রান্নার হাত চমৎকার।

যথাসময়ে সুকুমার কারখানার ম্যানেজার মিঃ জেফ্রি কার্টিসের সংগে দেখা করলো। অত বড় কারখানার ম্যানেজার—খুব সেজেছে সুকুমার। অষ্টিন্ রীডের পনেরো গিনির নীল স্যুট, ক্লাসিক সার্ট, ম্যাচ করা ভালো টাই, বুক পকেটে দামী রুমাল, পায়ে দু'পাউণ্ড পনেরো শিলিংএর কালো জুতো—স্যুটের সংগে রঙ মেলানো মোজা।

সুকুমারের নাম শুনে উঠে দাঁড়িয়ে তার সংগে হাত মেলালো মিঃ জেফ্রি কার্টিস্, বসো!

সুকুমার লক্ষ্য করলো তার টেবিলে শুধু টাইমস্ পত্রিকা খোলা। আড়চোখে সুকুমারের দামী স্যুটের দিকে তাকিয়ে হেসে বললো ম্যানেজার, স্যুটটা বাঁচাতে চাও তো ওভারঅল্ পরতে হবে—আছে তোমার?

হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাকে কি আজ থেকেই কাজ করতে হবে?

আজ বড় দেরী হয়ে গেছে, কাল ঠিক সকাল সাড়ে সাতটায় তোমাকে কাজ সুরু করতে হবে—আর কতগুলো ফর্ম ভরতে হবে তোমায় আজ।

বেশ!

কিন্তু চলো, মিঃ কার্টিস্ উঠে দাঁড়ালো, আজ তোমায় কারখানাটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে আনি!

চলুন!

বিরাট কারখানা। নানা বয়সের ছেলেমেয়েতে ভরা। ছেলেরা পরেছে শাদা ওভারওল্ আর মেয়েরা সবুজ। অনেক বিভাগ—তাকে বলা হয় শপ্। ম্যানেজার সুকুমারকে বুঝিয়ে দিচ্ছিল, তোমাকে কাজ করতে হবে মেসিন্ টুল্ শপে। আগে চাই তোমার মেকানিক্যাল ট্রেনিং, তোমাদের শপের ফোরম্যানের নাম মিঃ ওয়াল্টার টমাস্—তার সংগে আলাপ করিয়ে দিই তোমার—

মিঃ জেফ্রি কার্টিসের সব কথা শুনতে পাচ্ছিল না সুকুমার। কারখানার শব্দে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছিল তা'র কথা। কিন্তু চারপাশে তাকিয়ে খুব ভালো লাগছিল সুকুমারের সে শব্দ। ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্—ঠক্—ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্—ঠক্! ঘচ্চা—ঘচাং! দূরে উঠছে আগুনের শিখা—আর মাঝে মাঝে ঠেলে বেরিয়ে আসছে আগুনের ফুল্কি—শব্দ হচ্ছে, চিড়—চিড়িক্, চিড় চিড়িক—ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্—ঠক্—ঘচ্চা—ঘচাং—চিড় চিড় চিড় চিড়িক—চিড়িক্—ঘঙ্!

মিঃ ওয়ালটার টমাসের বয়স হয়েছে। তার সংগে সুকুমারের আলাপ করিয়ে দিয়ে জেফ্রি কার্টিস্ বললো, ফ্যারেডে হাউসের ছাত্র।

রাইট্ মিঃ কার্টিস্, তারপর সুকুমারের দিকে তাকিয়ে একগাল হেসে, কিন্তু এই স্যুট পরে—হি হি হি—

হাসি চেপে কার্টিস্ বললো, ও কাল থেকে কাজ আরম্ভ করবে

রাইট্, স্যার্—

প্রত্যেকেই, বিশেষ করে মেয়েরা ঘুরে ঘুরে দেখছিল সুকুমারকে। কারখানার এই শব্দ ছাড়িয়েও লাউড্ স্পীকারে বাজছিল রেডিও—কখনও গান কখনো নাচের বাজনা।

জীবনে প্রথম রোজগার করবে সুকুমার। কারখানা থেকে সপ্তাহে সপ্তাহে কিছু মাইনে পাবে। বাঁচা যাবে। বড় হাত টান করে চলতে হয়েছে তাকে এতদিন।

প্রেষ্টন্ শহর ঘুরে দেখতে একদিনও লাগলো না সুকুমারের। লোকগুলো বড় সরল আর তাদের কৌতূহলও বড় বেশী। মাঝে মাঝে নানা বাজে প্রশ্ন করে জ্বালিয়ে মারে সুকুমারকে। বাসে চড়ে খুব ঘুরে বেড়ালো সে।

লণ্ডনের লোক তুমি, আমাদের ছোট শহর কেমন লাগছে, সুকুমার? ইয়র্কশায়ার্ পুডিংএর প্লেট তার দিকে এগিয়ে দিয়ে মিস্ ফিসার জিজ্ঞেস করলেন।

চমৎকার, ইংলণ্ডের শীত ছাড়া আর সবই আমার ভালো লাগে।

যাই বল, চটে যেওনা যেন, তোমাদের লণ্ডনের লোকের চেয়ে আমরা অনেক ভালো, আতিথেয়তা জানেনা ওরা—যেন সুকুমারেরও জন্মভূমি লণ্ডন।

তা ঠিক।

খুশী হয়ে মিস্ ফিসার্ বললেন, তুমি স্বীকার করছ সেকথা?

হ্যাঁ।

খাসা ছেলে তুমি! আচ্ছা দেখ, একটু থেমে তিনি আবার বললেন, তোমার ঘরে যে মেয়েটির ছবি—ও-ও কি ইণ্ডিয়ান্?

অবাক হয়ে সুকুমার বললো, ইণ্ডিয়ান কেন হবে, খাঁটী ইংরেজ—ওর নাম পামেলা সুইট।

তোমার বন্ধু?

হ্যাঁ।

এনগেজড্ নাকি তোমরা?

প্রায়।

ওকে বিয়ে করবে তুমি?

হেসে সুকুমার বললো, নিশ্চয়ই।

কিন্তু তাহ'লে যে বড় মুস্কিল হবে তোমার ছেলেমেয়েদের।

কেন?

কারণ বাবা ইণ্ডিয়ান মা ইংরেজ—তোমাদের ছেলেমেয়েরা হবে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। তোমাদের দেশে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের বড় অসুবিধা শুনি—আর এদেশে আমরাও ওদের বিশেষ—হি হি হি সুকুমার—

সুকুমার তখন বুড়ির ভুল ধারণা শুধরে দিল, আমাদের দেশে বাবা দিশি আর মা ইংরেজ হলেই লোকে ছেলেমেয়েদের অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বলে না—তাদের ইণ্ডিয়ানই বলে। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের একটা ইতিহাস আছে, ধরো সিলোনের এক কুচকুচে কালো লোক মিশনারীদের পাল্লায় পড়ে পুরো ইংরেজ হতে চাইলো আর সংগে সংগে সে ক্রীশ্চান হয়ে নাম নিলো লেজলী আরউইন। সে হয়তো বিয়ে করলো মাদ্রাজের রুক্মিনী মেননকে—সে ক্রীশ্চান হ'য়ে হয়েছে ধরো ক্যাথরীন মিলফোর্ড। অনেক সময় তারা মগ, আর্মেনিয়ান্ এমন কি ইংরেজকেও বিয়ে করে। তারা কখনও নিজেদের ইণ্ডিয়ান বলে স্বীকার করে না—তাই দেশের লোকও তাদের ধার ধারে না—তাদের আমরা বলি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। আমার ছেলেমেয়েরা তো আমার পদবী পাবে—যেমনই দেখতে হোক তারা হবে খাঁটী ইণ্ডিয়ান।

বুড়ি ড্যাবড্যাবে চোখ মেলে সুকুমারের দিকে তাকিয়ে বললেন, যাই বল বাপু, নিজের দেশের মেয়ে বিয়ে করাই ভালো।

প্রেম জাত মানেনা, মিস্ ফিসার্।

তা বটে, মিস্ ফিসার কিছুক্ষণের জন্যে আনমনা হয়ে গেলেন।

পামেলার চিঠি গভীর রাত্তিরে আর একবার পড়লো সুকুমার।

প্রিয় সুকুমার,

তোমার চিঠির জন্যে ধন্যবাদ। ল্যাঙ্কেশায়ার তোমার ভালো লেগেছে জেনে খুশী হলাম। আমারও খুব ইচ্ছে করে সমস্ত ইংল্যাণ্ড ভালো ক'রে দেখতে কিন্তু লণ্ডনের বাইরে আর কিছুতেই যাওয়া হয় না। এ বছরে ছুটিতে ভাবছি ওয়েল্‌স্ ঘুরে আসবো। বাবা আবার শীগগিরই কয়েক মাসের জন্যে সাউথ্ আফ্রিকা চলে যাবেন। আমার এক মাসী (তাকে তুমি দেখনি) এসে আছেন এখন আমাদের সংগে। তার গলা খুব ভালো—এককালে তিনি নাকি খুব ভালো গাইতে পারতেন।

ডায়নার সংগে তার ছেলে-বন্ধুর ঝগড়া হয়ে গেছে। আমার সংগে আজকাল ওর প্রায়ই দেখা হয়। বিকেলে আমরা দু'জন অনেকক্ষণ এক সংগে থাকি। জ্যাকলীন একটা বেড়াল পুষছে—নাম দিয়েছে ফিগারো। তুমি বেড়াল একেবারেই ভালোবাসনা—আমার কিন্তু ফিগারোকে খুব ভালো লাগে। আমিও ভাবছি একটা বেড়াল পুষবো।

তোমার লণ্ডনে ফিরে আসতে এখনো অনেক দেরী—তোমার কথা ভেবে খুব মন খারাপ হয়ে যায়—তুমি চলে যাবার পর লণ্ডন আমার কাছে বিস্বাদ হয়ে গেছে। তুমি কবে আসবে, সুকুমার?

ভালো হ'য়ে থেকো। বেশী সিগ্রেট খেওনা। আশা করি তুমি খুব ভালো আছো।

ইতি—

তোমার

প্যাম

*　　*　　*

ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্—ঠক্!—ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্—ঠক্! ঘচ্চা-ঘচ্—ঘচ্চা-ঘচ্—ঘচাং! ঘচাং! চিড়্-চিড়িক্—চিড়্ চিড়্ চিড়্ চিড়িক্—চিড়িক্—ঘঙ্!

মাইণ্ড্ হ্যারী—ঘচাং—

মোর্ ক্লুস্—মোর্ ক্লুস্, আইডা হারী আপ্—ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্ ঠক্! হেই জো, টেলিফোন্ ফর্ ইউ—চিড়িক্ চিড়িক্—কাম অন মাই লভ্ কুইক্—ঘঙ্!

সবুজ ওভারওল্ পরে উইনি সুকুমারের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল। একটু দূরে দাঁড়িয়ে কনি ইসারা করলো উইনিকে, ফিস্ ফিস্ করে জিজ্ঞেস করলো, কোন দেশের লোকরে ছোঁড়া?

জানি না, ফ্রান্স-টান্স হবে বোধ হয়।

দুর—চুলগুলো দেখছিস না—কালো, আফ্রিকান্—নিগ্রো।

সুকুমার ফস্ ক'রে ব'লে দিলো, আমি ইণ্ডিয়ান।

লজ্জা পেয়ে কনি বললো, আই বেগ্ ইওর পার্ডন! বলেই পালিয়ে গেল চা খেতে।

হেড মেট ফোরম্যান্ ওয়ালটার টমাস্ পিট চাপড়ে বললো সুকুমারকে, ক্লান্ত? চা খাবে? বলেই উত্তরের অপেক্ষা না করে অন্যদিকে আর একজনকে লক্ষ্য করে, বার্ট, কুইক্ কুইক্ কুইক্—

ফাঁকে ফাঁকে কাগজ পড়ে প্রত্যেকে। এত মন দিয়ে পড়ে যে মনে হয় প্রত্যেকটি লাইন গিলে খাচ্ছে। বেশীর ভাগ পড়ে ডেলি মিরর্—

কেউ কেউ দু'টো তিনটে কাগজ পড়ে—ডেলি হেরাল্ড্, নিউজ ক্রনিক্ল্—আর কেউ কেউ ডেলি এক্সপ্রেস—তারপর কাগজ বদলে বদলে ভাগ করে পড়ে তারা।

সুকুমার ভেবেছিল এর মধ্যেই বেশ ভালো ইংরেজী শিখে নিয়েছে সে। যে কোন লোকের কথা বুঝতে পারে। কিন্তু কারখানায় এসে অথৈ জলে পড়লো সে। কান খাড়া করে থেকেও বুঝতে পারে না এরা কি বলছে!

কারখানায় সুকুমারকে দেখলে কে বলবে যে সে ফ্যারাডে হাউসের ইলেক্‌ট্রিক্যাল এনজিনীয়ারিংএর ছাত্র! ওভারঅল্ পরে কালি ঝুলি মেখে মেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে কাজ করতে করতে ক্লান্তিতে অবশ হ'য়ে যায় তার সমস্ত শরীর—তবু সে দমে না! একেবারে খাঁটী দিনমজুর হয়ে গেছে সে!

সকাল ঠিক সাড়ে সাতটায় কারখানার বাঁশী বাজে। সংগে সংগে আরম্ভ হয় কাজ—বয়লার জ্বলে, মেসিন্ চলে—আর নানারকম আওয়াজে কাঁপে কারখানা। দশটায় দশ মিনিটের জন্যে চা খাবার ছুটি। তারপর আবার কাজ। বারোটা থেকে একটা অবধি লাঞ্চ্। কারখানার ক্যানটিনে সস্তায় ভালো লাঞ্চ্ পাওয়া যায়।

মিস্ ফিসার বলেছিলেন, ইচ্ছে হ'লে বাড়ীতে লাঞ্চ্ খেতে আসতে পারো, সুকুমার—

না না, বড় অল্প সময়, ক্যানটিনই ভালো, নিজে রোজগার করছে সে—পয়সার ভাবনা কি তার!

কী ভীড় ক্যানটিনে লাঞ্চের সময়! লম্বা কিউ। কেউ সার্ভ করে না—কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে চেয়ে নিতে হয় যা চাই। দু'জন মেয়ে থাকে

সেখানে—একজন থালা এগিয়ে দেয় আর একজন হিসেব ক'রে পয়সা গুনে নেয়। প্রথম দিন ক্যান্‌টিনে এসে মহা মুস্কিল হ'লো সুকুমারের। ক্যানটিনের মেয়ে তাকে খাবার দেবে কি, সব ভুলে হাঁ করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো—ভাবটা, এ আবার কে!

হেই লভ্, কি হ'লো তোমার? সুকুমারের পেছন থেকে হেঁকে উঠলো ফ্র্যাঙ্ক্, দাওনা ও যা চায়—ও হ'লো আমাদের ইণ্ডিয়ান বন্ধু, নতুন ঢুকেছে কারখানায়—

মেয়েটি এবার মিষ্টি হেসে বললো, কি চাই, স্যার্?

সুকুমার বললো, এ চাই ও চাই তা চাই—

কিন্তু কিচ্ছু না বুঝে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে মেয়েটি বললো, পার্ডন?

আবার হেঁকে উঠলো ফ্র্যাঙ্ক্, আহা, ও মাংস চায়, আলু চায়, আইসক্রীম্ চায়—চা চায়—দাওনা ওকে ছাই, বলি হলো কি তোমার আজ, হেই লভ্ অ্যাঁ?

থালা নিয়ে সুকুমার পড়লো আর এক মুস্কিলে। পাশের মেয়েটি হিসেব করে সুকুমারকে বললো, এত হয়েছে। কিন্তু কত সেটা বুঝতে বোধহয় সুকুমারের রাত ভোর হযে যাবে। তাড়াতাড়ি সে একটা দশ শিলিং এর নোট বের করে দিল—তারপর চেঞ্জ না গুনে পকেটে রেখে 'কিউ' থেকে বেরিয়ে খালি চেয়ারের আশায় এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলো।

হেই মেট্, সুকুমারকে ডাকলো একজন, ইদিকে এসো, রোষ্ট বীফ্ নিয়েছ দেখছি, খাসা বেঁধেছে, আইসক্রীম নিলে কেন? হরিড্। ব'সো ব'সো – ওই যে ব্লাডি জো এসেছে—হেই জো—

নানা রকম খাবারের গন্ধ চারপাশে—বেশ জোরে ক্যানটিনের রেডিও বাজছে—ছেলেমেয়ের আলাপ-আলোচনায় গম্‌গম্ করছে ক্যানটিন্। সুকুমার বসে পড়ে রোষ্ট বীফে ছুরী চালালো।

দেখ দেখ স্কুমার, বেশ দেখাচ্ছে ছুঁড়ি দু'টোকে—ব্লাডি বার্ট ঠিক আছে ওদের পেছন পেছন—এদিকে হ্যারির বউ আইডার সংগে ব্লাডির ঘন ঘন সিনেমায় যাওয়া চাই—

বকছো কি টেড, অ্যাঁ? বার্ট এসে বসলো সেই টেবিলে আর তার সংগে এলো তিনটি মেয়ে নেলি, উইনি, কনি।

বলি হেই লড্, তোরা তিনটে মিলে কি এর প্রেমে পড়ছি—জানিস না ব্লাডি বিয়ে করবে আইডাকে—আইডা হ্যারিকে ডিভোর্স করলো ব'লে—

খিল্ খিল্ ক'রে হেসে নেলি উইনি কনি বললো, বড় পরচর্চা কর তুমি টেড্—বউ কেমন আছে তোমার?

হঠাৎ রেগে গেল টেড বললো, কেন? বলি ইয়াকি হচ্ছে আমার সংগে? আমার বউএর খবরে তোদের দরকার কিরে ছুঁড়িগুলো, বলেই চোঁ চোঁ ক'রে কফি শেষ ক'রে পালালো সেখান থেকে। যাবার সময় ফিরেও দেখলেন না কারুর দিকে। টেড্ বেরিয়ে যেতেই এদের সবলের সে কি হাসি!

বউকে বড় ভয় ক'রে বেচারী, মাংসের টুকরো চিবোতে চিবোতে উইনি স্কুমারের আরও কাছে ঘেঁসে বসলো।

টেড্ ড্রিঙ্ক্ ক'রে বড় বেশী—দু' দুটো ছেলে মেয়ে ওর দায়িত্বজ্ঞান নেই একেবারে—

তা ঠিক, সায় দিল বার্ট, ধার ক'রে মদ খাবার দরকারটা কি, তা বাপু কি তোমার নাম, স্কুমারকে ঠেলা মেরে, এর আগ কোন ফ্যাক্টারীতে কাজ করেছ?

এই প্রথম, চায়ে চুমুক দিয়ে হেসে বললো স্কুমার।

বল কি, নেলির চোখ বড় হ'লো কিন্তু খুব ভালো কাজ করতে পারো তো তুমি—ও মেসিনে হাত লাগানো কি সোজা কথা!

সুকুমার কথা না বলে হাসলো। বাঁশী বাজলো আবার। আবার কাজ। বিকেল তিনটেয় চা খাবার জন্যে দশ মিনিট ছুটি — তারপর সাড়ে পাঁচটায় বাজে ছুটির বাঁশী। ওভারওল্ খুলে কারখানাতেই রেখে যায় সুকুমার—বাড়ী যাবার সময় মুখ ধুয়ে পরে স্যুট—মেয়েরাও নিজেদের পোষাক পরে রঙ মেখে বাইরে বেরোয়।

কারখানার কাছেই কাউন্সিলের তৈরী করা বিরাট বাড়ী—অনেক ফ্ল্যাট তাতে—বিবাহিত মজুররা নাম মাত্র ভাড়ায় সেখানে থাকে। বাড়ী যেতে যেতে সেদিকে তাকিয়ে সুকুমার ভাবে, মাঝে মাঝে সন্ধ্যেবেলা ওখানে গিয়ে আড্ডা মারতে হবে। এখন পড়াশোনার চাপ নেই একেবারে—পামেলাও নেই—রোজ সন্ধ্যেবেলা বুড়ী ফিসারের সংগে গল্প করতে ভালো লাগে না তার। একা একা ঘুরে বেড়াতেও ইচ্ছে করে না—এদের সংগে ভালোভাবে আলাপ করে লণ্ডনের স্মৃতি সে ভুলে থাকতে চায়—মাতৃভূমি মনে হয় লণ্ডনকে সুকুমারের।

বৃহস্পতিবারে মজুরদের প্রত্যেকে ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে ওঠে—বেশ অনেকক্ষণের জন্যে কাজে মন লাগে না তাদের—পকেট থেকে কি একটা ফর্ম বের করে গুজ্ গুজ্ ফুস্ ফুস্ করে—তারপর কলম বের করে খুব সাবধানে সেটা ভর্তি করে।

হেই মেট্, সুকুমারকে ঠেলা মেরে বললো টেড্, ফুটবল্ পুল্ পাঠাও না তুমি ?

ফুটবল্ পুল্ কি ?

কি, কি বললে ছেলে ?

ফুটবল পুল্ কি আমি তো জানিনা।

নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারলো না টেড—অনেকক্ষণ

চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইলো তার দিকে। তারপর ঘোর কাটলে চীৎকার ক'রে বললো অন্য সংগীদের ওহে শোন শোন—লণ্ডনের ছেলে বলে ফুটবল পুল্ কি—নামই শোনেনি হে —

কনি নেলি মে উইনি আইডা হ্যারী ফ্রাঙ্ক্ বার্ট জো ঘিরে দাঁড়ালো সুকুমারকে, সে কি—যাঃ—ঠিক বলছ ?

সুকুমার যেন মস্ত একটা অপরাধ করেছে এমন মুখ করে বললো, মানে-এই আর কি—

তখন ওরা সবাই মিলে সুকুমারকে বুঝিয়ে দিল ফুটবল পুল্ কি। আর বড বাজি মারতে পারলে রাতারাতি ভাগ্য চক্র ঘুরে যাবে সুকুমারের—এই তো সেদিন জিমি পেল চল্লিশ হাজার পাউণ্ড—পেয়েই আমেরিকায় চলে গেল ব্যবসা করতে।

অনেক টিম্ আছে ফুটবলের। ফর্মে নাম আছে প্রত্যেক টিমের।

কোন টিমের সংগে কোন টিম ক' গোলে হারবে কিংবা জিতবে এইসব লিখে পাঠাতে হয়। সব একেবারে অক্ষরে-অক্ষরে ঠিক না হ'লেও মাঝে মাঝে বেশ কিছু নাকি পাওয়া যায়। আর ফর্মের সংগে সামান্য পয়সা দিতে হয়।

নেমে পড সুকুমার, মে তার কাছে এসে বললো, কপাল ফিরে যেতে পারে তোমার।

বেশ, সোৎসাহে বললো সুকুমার, দাও একটা ফর্ম আমাকে।

আরে আজ ফর্ম কোথা থেকে দেব তোমাকে ? সে আনাতে হবে। আসছে সপ্তাহে হবে খ'ন।

বেশ।

আসলে এসব ব্যাপারে সুকুমারের একেবারেই উৎসাহ নেই। কিন্তু সেকথা এদের সামনে মুখ ফুটে বললে হয়েছিল আর কি! হয়তো মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে যেত এরা।

পরের সপ্তাহে কারখানার ঠিকানায় সুকুমারের নামে এলো ফুটবল পুলের ফর্ম। সকলেই এলো তাকে সমস্ত বুঝিয়ে সাহায্য করতে। কিন্তু সুকুমার কারুর কথা না শুনে আন্দাজে-আন্দাজে যা মনে এলো তাই বসিয়ে দিল।

আহা হা হেই ভগবান, করেছ কি তুমি সুকুমার, তার ফর্ম পড়তে পড়তে বার্ট চেঁচিয়ে উঠলো, দেখ দেখ আইডা, ব্যারোর সংগে ম্যাঞ্চেষ্টার ইউনাইটেড পারে কখনো? সুকুমার দু'গোল খাইয়ে বসে আছে ব্যারোকে—হিহি হি—প্রেষ্টন্‌কে জিতিয়েছে আরসিনেলের সংগে—একটি পয়সাও পাবেনা তুমি, শুধু শুধু পয়সা নষ্ট করলে এবার।

আইডা তার ঘাড়ে হাত দিয়ে ফর্ম দেখতে দেখতে বললো, আমাকে জিজ্ঞেস করলে না কেন? আগে ভালো করে টিমের নাম গুলো জেনে নাও তারপর তো বসাবে, একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে আইডা বলে গেল, নাম করা টিম হলো, প্রেষ্টন্, ব্যারো, ম্যাঞ্চেষ্টার ইউনাইটেড, আরসিনেল্ চেলসী, কুইনস্‌পার্ক রেঞ্জার্স—এদের খেলার কথা খুব সাবধানে ভেবে ভেবে বসাবে—বুঝেছ মেট?

সুকুমার বললো, ঠিক আছে, ঠিক বসিয়েছি এবারেও, তোমরা দেখনা মোটা টাকা পেয়ে গেলাম বলে।

খিল্ খিল্ করে হেসে আইডা বললো, দুর ছেলে!

অথচ আশ্চর্য কাণ্ড! সুকুমার সত্যি বাজি মারলো। প্রথম বারেই পেয়ে গেল সাত পাউণ্ড দশ শিলিং—মানে একশো টাকা। হৈ হৈ কাণ্ড ফ্যাক্টারীতে।

ওহে শোন শোন, ছেলে পেয়েছে সাত পাউণ্ড দশ—

কি ক'রে পেল ব্লাডি?

ইণ্ডিয়ানের বরাত ভালো!

সুকুমার গম্ভীর হয়ে বললো, বলেছিলাম না যে ঠিক পাবো—আমার ক্যাল্‌কুলেশন অব্যর্থ।

গালে হাত দিয়ে আইডা বললো, অবাক কাণ্ড!

আবার সুকুমার কারুর সংগে পরামর্শ না করে আন্দাজে-আন্দাজে ডুড়ুম-দাম্‌ যা মনে এলো বসিয়ে পাঠিয়ে দিল ফর্ম।

এবারে পেল ও ডু' পাউণ্ড। আর যাবে কোথায়! চাকা গেল ঘুরে। এবার সকলে ঘিরে ধরলো সুকুমারকে, বল দেখি মেট্‌ ক'গোলে প্রেষ্টন হারবে আর কুইনস্‌ পার্ক রেঞ্জার্সএর কি হবে এবার?

সুকুমার হেসে বললো, ইচ্ছে করলেই বলতে পারি—কিন্তু বলবো কেন শুধু শুধু? আগে বল কত কমিশন দেবে?

হেসে বললো হ্যারী, ওহে ছেলে চালাক আছে।

এ সপ্তাহে কিন্তু কেউই পেলনা ফুটবল পুলের টাকা।

এতদিন পর সুকুমার এদের অতগুলো কাগজ পড়বার আসল কারণ বুঝতে পারলো। যদিও এদের বেশীর ভাগ লেবার দলের লোক, তবু রাজনীতি অথবা অন্য কোন খবরের জন্যে কাগজ পড়ে না এরা। এদের কৌতূহলের বিষয়বস্তু হ'লো দু'টি—বক্সিং ও ফুটবল পুল্‌। বক্সিংএর খবর আর ফুটবল পুল সম্পর্কে নানা উপদেশের জন্যেই এদের কাগজ পড়ায় অত উৎসাহ। ঘুসোঘুসির খবর নিয়ে এদের মধ্যেই ঘুসোঘুসির উপক্রম হয় মাঝে মাঝে।

জ্যাক্‌ গার্ডনার বেদম পিটবে এবার ব্রুস্‌ উডকক্‌কে।

পিটলেই হ'লো তুমি একটা গাধা জো, উডকক্‌কে হারাতে পারে এমন ঘুসি মারনেওয়ালা পৃথিবীতে নেই।

থাম্‌ থাম্‌ ব্লাডি, গার্ডনারের সংগে উড্‌ককের তুলনা।

তুমি তো সব জানো, ফ্রেডি মিলসের বেলায়ও তুমি খুব লাফিয়েছিলে—নক্‌ আউট হ'য়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গে

তারপর রেডিওর সামনে ওরা হাঁ করে বসে শোনে ঘুসোঘুসির খবর।

কারখানার মধ্যেও প্রেমের গন্ধ পেল সুকুমার। অবশ্য সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে ওর একটু সময় লেগেছিল। মোড়ল হচ্ছে টেড্। সকলের সব খবর রাখে ও।

হ্যারীর স্ত্রী আইডা। যদিও ওদের দু'জনকে স্বামী-স্ত্রী বলে মনে হয়না মোটেই। ছুটির পর বার্টের হাত ধরে আইডা সেজেগুজে বেরিয়ে যায়। হ্যারীও একা যাবার পাত্র নয়, ও বার হয় কনির সংগে। ফ্র্যাঙ্কের সংগে ভাব হ'লো উইনির আর নেলীর বন্ধু এডি।

কি হে সুকুমার, পিট পিট করে তাকিয়ে টেড্ বললো, গার্ল-ফ্রেণ্ড্ জোটালে একটা?

না।

কেন? কেন? ইয়াংম্যান তুমি।

সে-লণ্ডনে আছে।

আরে লণ্ডন তো এখান থেকে অনেক দূর।

আমি প্রায় এনগেজ্ড্ কি-না।

রাখো তোমার এনগেজ্ড্—একটা জুটিয়ে নাও, তা না হ'লে বড্ড ডাল্ লাগবে।

দেখি।

ওই শালিটাকে ধরো তুমি, কিন্তু খুব সাবধান; সত্যি প্রেমে পড়ো না যেন—ও বড় ছেলে ভক্ত, একটাকে নিয়ে বেশীদিন থাকেনা।

সুকুমার হেসে বললো, আমার গার্ল-ফ্রেণ্ডের ভাবনা থাক—চলো একদিন তোমার স্ত্রীর সংগে দেখা করে আসি টেড্।

বেশতো বেশতো, তবে ওর মেজাজটা বড় তিরিক্ষি—তাই আমি বুঝলে স্থকুমার, ওকে একটু ভয় করি, হি হি হি।

মেয়েদের কে না একটু ভয় করে ?

ঠিক বলেছ, টেড্ স্থকুমারে পিঠ চাপড়ে দেশলাই চায়।

একরাত্রে স্থকুমার শুনলো মিস ফিসারের অতীতের ইতিহাস। বুড়ী আরম্ভ করে আর শেষ করতে চায়না কিছুতেই। বুড়ীও একদিন ভালোবেসেছিল। অনেক—অনেকদিন আগে তখন বুড়ীর যৌবন ছিল। ১৯১৪ সালের যুদ্ধের আগে তার সংগে আলাপ হয় রবার্ট হাডসনের।

কি স্থন্দর দেখতে ছিল সে, দেখবে স্থকুমার, তার ছবি ? স্থকুমারকে কোন উত্তর দেয়ার অবসর না দিয়ে মিস ফিসার নিয়ে এলো ছবি। হাডসন্ পাইপ মুখে দিয়ে হাসছে।

বাঃ স্থন্দর ! ছবিটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো স্থকুমার।

আমি একে ভালোবেসেছিলাম। স্থকুমার—ওর পর কত লোক দেখলাম জীবনে কিন্তু অমনটি আর কেউ নয়।

ইনি এখন কোথায় ?

ওপরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বুড়ি বললো, ওইখানে। জানো স্থকুমার আমাদের এনগেজমেন্টের ঠিক আগে বাধলো যুদ্ধ। রবার্ট আমাকে কথা দিল ফিরে এসে বিয়ে করবে—আমি তার পথ চেয়ে বসে রইলাম—রবার্ট এলোনা—আমার নামে এলো এক টেলিগ্রাম। তাতে শুধু লেখা, রবার্ট চলে গেছে। সে টেলিগ্রাম আজও আমি রেখে দিয়েছি, দেখবে স্থকুমার ? এবার স্থকুমারকে দেখালো সে টেলিগ্রাম। ঝাপসা হয়ে গেছে অক্ষরগুলি—ক্ষয়ে এসেছে কাগজের সমস্ত অংশ—মিস্ ফিসার সযত্নে আজও রেখে দিয়েছে সে-টেলিগ্রাম।

আমার সঙ্গে তার আবার দেখা হবে, বুড়ি স্থকুমারের কানের কাছে

মুখ এনে বললো, স্বর্গে তো আর যুদ্ধ নেই—আর জানো সুকুমার, আমি তো কোন পাপ করিনি—স্বর্গে যাবো ঠিকই—রাত্তিরে মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি, রবার্ট ঠিক তেমনি করে পাইপ মুখে দিয়ে আমাকে বলছে, এসো মিলি, আমার কাছে এসো—

বেশ সাজানো টেডের ফ্ল্যাট। টেডের সঙ্গে সুকুমার একদিন এলো ওদের বাড়ী।

চারখানি ঘর। একটি বসবার দু'টি শোবার, একটি খাবার—রান্নার আয়োজনও সে-ঘরেই। গ্যাসের উনুন। রান্না করতে বেশী সময় লাগেনা। টেডের স্ত্রী জিন্ বেশ অবাক হলো সুকুমারকে দেখে। অনেকক্ষণ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইলো তার মুখের দিকে।

এত অল্প বয়সে, এত দূর দেশে কারখানায় কাজ করতে এসেছো তুমি? তোমাদের দেশে বুঝি চাকরী-বাকরী পাওয়া যায়না—খুব দুরবস্থা লোকের?

আমি পড়তে এসেছি।

তোমাদের দেশে বুঝি ইস্কুল নেই?

আছে, সেখানকার পড়া শেষ করে এখানে চলে এলাম, তোমাদের কারখানার সংগে আমাদের কাজ মিলিয়ে দেখবার জন্যে।

গবর্ণমেণ্ট তোমার আসবার খরচ দিয়েছে বুঝি?

না, আমি নিজেই—মানে মা দিয়েছেন।

জিন্ কিছুই বুঝতে পারলো না। শুধু শুধু এমন করে অত পয়সা নষ্ট করে কেউ!

এক ছেলে আর এক মেয়ে টেডের। ছেলের নাম শ্যাম আর মেয়ের নাম শ্যালী। সুকুমার ভালো করেই জানে কেমন করে ছেলেমেয়েদের হাত করতে হয়। তার জন্যে প্রস্তুত হয়েই এসেছিল সে। দু'জনকে দু'বাক্স চকলেট বের করে দিলো।

তার হাত থেকে চকলেটের বাক্স ছিনিয়ে নিয়ে তখুনি খুলে গবাগব মুখে দিতে লাগলো শ্যালী আর শ্যাম।

ছেলেমেয়ের কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল জিন্। এইবার দু'জনের বাক্স ছিনিয়ে নিয়ে থাপ্পড় মেরে বললো, ধন্যবাদ বললি না যে ?

শ্যাম বললো, আগে বাক্স দাও তারপর বলবো।

শ্যালী ছলছল চোখে সুকুমারকে বললো, ধন্যবাদ। সুকুমার তাকে কোলে তুলে চুমু খেয়ে বললো, তোমাকে আমি একটা পুতুল দেব, শ্যালী।

শ্যাম তখনও মা'র কাছ থেকে চকলেটের বাক্স কাড়বার চেষ্টা করছে।

কিছুতেই দেব না, আগে বল ওকে ধন্যবাদ।

বাক্সটা না দিলে কেমন করে বলবো ?

দাঁড়া, আবার এক থাপ্পড়, অসভ্য ছেলে কোথাকার !

এইবার কাঁদতে কাঁদতে শ্যাম বললো, ধন্যবাদ।

তখন জিন্ বাক্স খুলে দু'টো চকলেট শ্যামকে আর দু'টো শ্যালীকে দিয়ে বাক্সগুলো তুলে রাখলো।

সুকুমারের শুধু চা খাবার কথা ছিল। কিন্তু জিনের এত ভালো লাগলো তাকে যে রাত্তিরেও খেয়ে যেতে বললো। সুকুমার তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে মিস্ ফিসারকে ফোন করলো।

রাত্তিরের রান্না করতে মিনিট পঁচিশও লাগলোনা জিনের। টেডকে সে বললো, তোমরা লাউঞ্জে গিয়ে একটু ব'সো—আমি এ দু'টোকে ঘুম পাড়িয়েই তোমাদের খেতে ডাকবো।

বেশ সাজানো লাউঞ্জ। রেডিও খুলে টেড বললো, বসো সুকুমার, আমি এখুনি আসছি। সুকুমার বসে রইলো কিন্তু টেড আর আসে না। দরজায় টোকা মেরে ঘরে এলো জিন্, টেড কই ?

বললো এখুনি আসছি।

রাগে লাল হয়ে গেল জিনের মুখ, ছি ছি আজকেও মদ খেতে গেল—বাড়ীতে অতিথি সে-খেয়াল নেই। এসো স্থকুমার, আমরা খেয়ে নিই।

একটু অপেক্ষা করলে হয় না?

না না, ও আর শীগগির ফিরছে না, আই অ্যাম্ রিয়েলি ফেড্ আপ্ উইথ্ হিম।

খাওয়াতে জানে বটে ল্যাঙ্কেশায়ারের লোক। কী যত্ন করে খাওয়ালো যে জিন্ স্থকুমারকে—জোর করে তার পাতে তুলে দিল কত খাবার। খেতে খেতে অনেক কথা হ'লো জিনের সংগে। নিজের জ্বালায় অস্থির বেচারী। কোন কাণ্ড জ্ঞান নেই নাকি টেডের। খালি মদ আর মদ—সপ্তাহে যা মাইনে পায়—ধার শোধ করতেই তার নাকি অর্ধেক বেরিয়ে যায়। অথচ পড়াশুনোয় এত মন স্যামের! ওই ছেলেটাই জিনের ভরসা। ওকে কিছুতেই কোনদিনও কারখানায় কাজ করতে দেবেনা জিন—লেখাপড়া শিখবেই ও। এত বই ভালোবাসে ও—অথচ বাপ একেবারেই উৎসাহ দেয় না ওকে।

আমি ওর জন্যে বই নিয়ে আসবো জিন্, বলতো মাঝে মাঝে পড়িয়েও দিতে পারি।

না না, তুমি শুধু শুধু কষ্ট করবে কেন—আর তুমি তো এখানে থাকবেও খুব অল্পদিন, দেখি আমি কি করতে পারি।

এমন সময় ফিরে এলো টেড। গলার স্বর বেশ জড়িয়ে এসেছে তার, বড় ক্ষিধে পেয়েছে, জিন্—হেই স্থকুমার, তুমি এখনো আছো—মাই লভ্ আমি ক্ষুধার্ত।

জিন্ তাকে লক্ষ্য না করে স্থকুমারের সংগে গল্প করতে লাগলো। টেড নিজেই তখন খাবার-দাবার নিয়ে খেতে লাগলো। আর কি মনে করে মাঝে মাঝে হাসতে লাগলো আপন মনেই।

হেই মেট্, নাম কি তোমার ?

সুকুমার।

আমার নাম মে—দেশলাই আছে ?

তার সিগ্রেট ধরিয়ে দিয়ে সুকুমার বললো, তুমিও কি কাউন্সিল হাউসে থাকো ?

না না, বিয়ে না হলে থাকতে দেয় না।

তা' বিয়ে কর না একটা।

দূর—এখন কি, মোটে বাইশ বছর বয়স আমার—জীবনটা ভালো করে দেখি আগে।

কতদূর দেখলে ?

হেসে সুকুমারের গায়ে ঢলে পড়ে মে বললো, অনেক দূর কিন্তু ইণ্ডিয়ান দেখিনি এখনো।

তা আমাকে তো দেখলে।

নাচতে পারো মেট ?

না।

সে কি, আমি শিখিয়ে দেবো তোমায় ?

বড় ঘাবড়ে যাই আমি।

কিছু ঘাবড়াতে হবে না বোকা ছেলে, এই কারখানায় সোশ্যাল হবে, আমি নাচবো তোমার সংগে।

না না—

লজ্জার কি আছে মেট্, ম্যানেজার জেফ্রি কার্টিস্ সুন্দর নাচে—ওর সংগে নেচে বড় আরাম হয়, ডিরেক্টারটা মোটা—ও ভাল্লুকের মতো থপ্ থপ্ করে নাচে—

অত ভালো নাচো, তুমি আমার সংগে নাচবে কি মে ?

আঃ আমি তো তোমাকে শেখাবো বললাম—আমি টিচার তুমি ছাত্র? চোখ দুটো চমৎকার তোমার—কী যাদু তোমার চোখে—আর চুল—সে সুকুমারের মাথায় হাত বুলোতে লাগলো।

সাঁতার জানো, সুকুমার?

হ্যাঁ, বিজ্ঞান-পড়া মাথা কায়দা করে সরিয়ে নিয়ে সুকুমার বললো।

চলো একদিন চান করি?

ও বাবা, যা ঠাণ্ডা তোমাদের জল।

তুমিও বড ঠাণ্ডা সুকুমার, তাকে ঠেলা মেরে সরে পড়লো সে।

কারখানার ছুটি হলে সে একদিন যায় জো'র সংগে, একদিন বার হয় এডির সংগে আর কোন কোন দিন ছুটতে ছুটতে একা বেরিয়ে যায়—কোথায় যায় কে জানে! নিঃসঙ্গ সুকুমার—নিঃসঙ্গ টেড! ওরা দু'জন ছুটির পর গুটিগুটি একাই ফেরে।

অত ভাব ছিল কনি উইনি নেলির—হঠাৎ একদিন ওরা কথা বন্ধ করে দিল। এড়িয়ে এডিয়ে বেড়ায় তিনজন—তিনজনকে। যাবার সময় ওরা ছুটতে ছুটতে একা বাড়ী যায়। ওদের বন্ধু হ্যারী ফ্র্যাঙ্ক এডির সংগেও আজকাল একেবারেই কথা বলেনা।

কিছুদিন পর আবার ওদের ভাব হয়ে গেল। কেন যে ওদের ঝগড়া হয়েছিল সেকথা কেমন করে জানবে সুকুমার। আবার ওরা ছেলেদের সংগে বার হতে লাগলো। তবে বন্ধু বদল হলো এবার—উইনি—হ্যারী, কনি—ফ্র্যাঙ্ক আর নেলি—জো।

একটা পাউণ্ড দাও তো ফ্রাঙ্ক, শুক্রবার দিয়ে দেবো।

অসম্ভব টেড, আমি খুব দুঃখিত।

হ্যারী ভয়ানক দরকার—

আজ মাপ করো টেড্, আগে বললেনা কেন, আজ উইনির সংগে দিন আছে, খরচ হবে সন্ধেবেলা।

সুকুমারকে ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেল টেড। জিনের সংগে তার বড ভাব—কানে কথা উঠলেই হয়েছে আর কি। এমনিতেই রক্ষে নেই।

এডি প্রিন্স্, একটা পাউণ্ড দাও, দিতেই হবে।

দু'টো দশ শিলি-এর নোট আছে পকেটে মোটে—তুমি একটা নাও।

আচ্ছা তাই দাও, সেটা মুডে পকেটে রেখে 'ধন্যবাদ' বলে না টেড গম্ভীর হয়ে বলে, দুটো দিলেই ভালো করতে, এডি।

শুক্রবার মাইনে পাবার পর টেড যে বেশ অনেকক্ষণের জন্যে গা ঢাকা দেয় সেকথা সকলেই জানে। জিন্ সেদিন আসে কারখানায়। স্বামীকে খোঁজবার জন্যে তছনছ করে ফেলে সে সমস্ত কারখানা, কিন্তু কোথাও পাওয়া যায়না টেডকে। আর আশ্চর্য—জিন্ বেরিয়ে যেতেই যেন ভুঁই ফুঁড়ে উঠে আসে টেড, এসেই সুকুমারকে জিজ্ঞেস করে, গেছে?

কে?

কে আবার?

তুমি জানো? অথচ বেচারী তো তোমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রাণ—

কিন্তু সুকুমার, দেবো কোত্থেকে আমি সব মাইনে ওর হাতে? ধার শোধ করতে হবেনা আমার।

এতক্ষণ পর সুকুমার টেডের গা ঢাকা দেবার আসল কারণ খুঁজে পেয়ে বললো, টাকা চাই নাকি কিছু তোমার টেড।

না না না, ধন্যবাদ সুকুমার, বিদেশী তুমি এসেছ আমাদের দেশে, তোমার কাছ থেকে টাকা নিতে পারি কখনও?

বিদেশী বলে ধর কেন আমাকে টেড? একথা শুনে কোথায় যেন আঘাত লাগে সুকুমারের, আমি তোমার বন্ধু না?

নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, দরকার হলেই চাইবো তোমার কাছে।

কিন্তু কিছুতেই সুকুমারের কাছে টাকা চায়না টেড।

একদিন সকাল বেলা বেশ একটু মজা হলো কারখানায়। মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ আড চোখে বার্টের দিকে তাকাচ্ছে আর ফিক্ ফিক্ করে হাসছে। ছেলেদেরও নজর ওই বার্টেরই দিকে। কিন্তু বার্ট কোনদিকে তাকাচ্ছেনা—খুব মন দিয়ে কাজ করছে। সুকুমার তার দিকে এক সময় তাকিয়ে দেখে তার বাঁ চোখের ঠিক ওপরেই একেবারে ফুলে ঢোল হয়ে গেছে।

কি হলো বার্ট তোমার চোখের ওপর?

কিছুনা, গম্ভীর হয়ে বার্ট এড়িয়ে গেল তাকে। বেশীক্ষণ কৌতূহল চেপে রাখতে হ'লোনা সুকুমারকে। একটু পরেই ডান কনুই দিয়ে তাকে ঠেলা মেরে বললো মে, খুব সাবধান সুকুমার, পরের বউ এর সংগে ভাব করতে যেওনা যেন, তাহ'লে বার্টের দশা হবে।

কি হলো তার?

জানোনা বুঝি? তবে শোন, মে সুকুমারের কাঁধে হাত রেখে বেশ রসিয়ে রসিয়ে গল্প বলতে লাগলো, কাল রাত্তিরে বার্ট অনেক রাত্তির অবধি ছিল আইডার সংগে হ্যারীর বাড়ীতে। সাধারণত রাত করে বাড়ী ফেরে হ্যারী, কাল হঠাৎ সকাল সকাল ফিরে দেখে—কি দেখেছে সে ওই জানে, হেসে বললো মে, বেদম প্রহার দিল বার্টকে আর শুনছি আইডাও নাকি দু' ঘা বসিয়ে দেয় স্বামীকে।

সুকুমারও হেসে ফেলে বললো, তা তুমি এত খবর জানলে কেমন করে? তুমি বুঝি তখন হ্যারীর সংগে ছিলে?

দূর, বিয়েওলা লোকদের ঘেন্না করি আমি—তোমার বিয়ে হয়নি ব'লেই তো তোমার সংগে আমি কথা বলি।

কী ভাগ্যবান আমি!

আর জানো, সকালে ঘুম থেকে উঠেই আইডা ছুটেছে উকিলের বাড়ী। ডিভোর্স না নিয়ে ছাড়বেনা ও। একবার বিয়ে করে লোকের কেন যে শিক্ষা হয়না—ও বোধ হয় বার্টকে বিয়ে করবে।

তুমি তো অনেক খবর রাখো যে।

এ আবার নতুন খবর নাকি, এতো সবাই জানে, এই শার্লি শোন্ শোন্, বলি শুনেছিস—এইবার যে ছুটে গিয়ে শার্লির ঘাড়ে হাত রাখে।

হ্যারী আর আইডার ডিভোর্স সত্যি কিন্তু একদিন হয়ে গেল। জাঁকিয়ে কাগজে খবর ছাপা হলো আইডার ছবি শুদ্ধ। কিন্তু বিয়ে আর ও করলোনা বার্টকে। বললো, না বাপু দরকার নেই আমার বিয়ে করে—খুব হয়েছে, আমি একাই কাটিয়ে দেব বাকি জীবন। তাকে বিয়ে করবার জন্যে সাধ্য-সাধনা করলো না বার্ট কিংবা বিরহে তিলে তিলে শুকিয়েও মরলো না। ধাঁ করে সে বিয়ে করলো হ্যারীর বর্তমান বন্ধু উইনিকে। আর একা থাকবো বললেও বেশীদিন একা কাটাতে পারলোনা আইডা। বিয়ে করে অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে বলে ঘন ঘন দিন করতে লাগলো এডির সংগে আর সুযোগ বুঝে নেলিকে হাত করলো হ্যারী। আর দিন কয়েকের মধ্যেই কনির সংগে খুব বন্ধুত্ব হলো জো'র। এত খবর রাখবার সময় নেই সুকুমারের। সে শুধু গির্জে দাঁড়িয়ে বার্টের বিয়ে দেখলো তারপর রাশি রাশি ফুল উপহার দিয়ে পেট ভরে নেমন্তন্ন খেল।

এবার বুঝলে সুকুমার, সিগ্রেটটা দাঁতে চেপে বললো টেড, কাউন্সিলের বাড়ীতে ব্লাডি বার্ট হয় তো একটা ফ্ল্যাট পেয়েও যেতে

পারে, ওই জন্যেই তো বিয়ে করলো ব্লাডি, ও বেটার আবার প্রেম! এত প্রেম ছিল আইডার সংগে—একদিন মার খেল কি প্রেম ছুটে গেল, হি হি হি—হাসতে লাগলো টেড।

মাঝে মাঝে স্কুমার যায় টেডের বাড়ী। প্রায়ই থাকে না টেড, গল্প করে সে জিনের সংগে। জিন স্কুমারকে ভালবাসে খুব—প্রাণের কথা বলে তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে। জিনের প্রাণের কথা মানে স্বামীর নিন্দে।

অমন স্বামী না থাকলে কি হয়, স্কুমার?

কিন্তু লোক তো ও খুব ভালো, জিন্?

আরে রাখো তোমার ভালো—বর্বর একটা, কারখানায় দুর্ঘটনা ঘটে ও মরলে আমি বাঁচি—ছেলেটাকে ভালো করে লেখাপড়া শেখাবার বন্দোবস্ত হয় তাহ'লে।

স্কুমারের কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ ক'রে ওঠে একথা শুনে। সতী-লক্ষ্মী স্ত্রী কেমন করে একথা বলে!

ছুটতে ছুটতে এলো স্যাম্ আর শ্যালী, কি এনেছ আঙ্কল্, দেখি তোমার পকেট?

এই চুপ—যা বেরো।

আহা থাক্ না, স্কুমার একটা পুতুল দেয় শ্যালীকে, তোমার মেয়ে শ্যালী।

আর আমার জন্যে? স্কুমারের শরীরে মিলিয়ে যেতে চায় স্যাম্।

পকেট থেকে একটা বাঁশী বের করে বলে স্কুমার, স্যাম্ তোমার বাঁশী।

বাঁশী—আমার বাঁশী, সংগে সংগে বেজে উঠলো স্যামের বাঁশী।

খুশীতে গলে গিয়ে বললো জিন্, অনেক ধন্যবাদ স্কুমার, কিন্তু

কেন অত জিনিশ দাও ওদের, তুমি চলে গেলে ওদের কেমন করে সামলাবো আমি—আঃ—কথা বলছি আমরা, স্যাম্ থামা তোর বাঁশী।

কিন্তু স্যাম্ কি থামে! বেজেই চলেছে স্যামের পাগল করা বাঁশী, পি—পি—পি—পি—

একদিন লাঞ্চের আগে ম্যানেজার জেফ্রি কার্টিস নিজে এলো সুকুমারের সংগে দেখা করতে। নিঃশব্দে অনেকক্ষণ সে দেখলো তার কাজ। তারপর তার ময়লা হাত ধরে বললো, আমাদের কারখানায় তুমিই প্রথম ভারতীয়। তোমার কাজ দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি সুকুমার—খুব ভালো। ফ্যারাডে হাউসে আমি লিখবো বেশী করে ভারতীয় ছাত্র পাঠাতে—তাতে আমাদেরও সুবিধা হবে।

সুকুমারের ইচ্ছে হ'লো ব'লে ওঠে সেই পুরোনো কথা, সব ভারতীয়ই সুকুমার নয়—কিন্তু সেকথা মনে চেপে রেখে সে বললো, ধন্যবাদ মিঃ কার্টিস কিন্তু সবটুকু কৃতিত্ব ফোরম্যান্ মিঃ টমাসের প্রাপ্য, তিনি খুব যত্ন করে কাজ শিখিয়েছেন আমাকে।

মিঃ টমাস্ পাশে দাঁড়িয়ে হাসছিল।

লণ্ডনে ফেরবার সময় হয়ে এলো প্রায়। এ কদিন আরও বেশী কাজ করবে সুকুমার। মুখে বড় বড় কথা না বলে এমনি করেই রাখবে সে ভারতবর্ষের নাম। মেনে নেবে, মানিয়ে নেবে, জেনে নেবে, জানিয়ে দেবে। সকলের প্রিয় হতে পারা কি সোজা, কিন্তু তাই হবে সুকুমার, কথায় নয় কাজে। ক্লান্তি কথাটার মানে ভুলে গেল সে। তার কানে আর কোন শব্দ নেই। শুধু—

ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্ ঠক! ময়লা হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছে সোজা হয়ে দাঁড়ালো সুকুমার।

ঘচ্চা—ঘচ্—ঘচ্চা ঘচ্ ঘচাং—এই যে অত কাছে যেওনা—মাইণ্ড্ ইউর্ ফিংগারস্।

চিড়্—চিড়িক্—চিড়্—চিড়্ চিড়িক্—ঘঙ্—আমার জন্যে একটা চা ব'লে দেবে, ওয়ালটার ?

ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্—ঠক! ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্—ঠক! ঘচ্চা—ঘচ ঘচ্চা—ঘচ—ঘচাং। চিড় চিড়িক্—চিড—চিড চিড চিড়্—চিড়িক্—চিড়িক্—ঘঙ্—ঘঙ্—ঘঙ্।—

হেই ষ্টপ্ মেসিন্ চীৎকার ক'রে উঠলো ফোরম্যান্ ওয়ালটার টমাস্, অ্যাকসিডেণ্ট।

টুন্ টুন্ টুন্ টুন্ টুন্ টুন্—কারখানার এলার্ম বেজে উঠলো। যন্ত্রের তীক্ষ্ণ আর্তনাদের বদলে শোনা গেল মানুষের কলগুঞ্জন। ছুটে এলো ম্যানেজার জেফ্রি কার্টিস্।

টেডের দেহের ওপর ঝুঁকে পড়ে সুকুমার বললো, Ted is seriously injured, he is unconscious Mr. Curtis—অ্যামবুলেন্সের ঘণ্টা শোনা গেল। মিনিট কয়েকের মধ্যেই এলো দু'জন নার্স আর কারখানার অ্যামবুলেন্সের দু'জন লোক। তারা ষ্ট্রেচারে ক'রে টেড্কে শুইয়ে দিল অ্যামবুলেন্সে—তারপর তাকে নিয়ে গেল কারখানার হাসপাতালে। কিছুক্ষণ পর শব্দ আরম্ভ হ'লো—আবার চলতে লাগলো মেসিন্। কিন্তু কিছুতেই কাজে মন দিতে পারলো না সুকুমার। তার সমস্ত শরীর কাঁপছে। টেড্ বাঁচবে তো!

সাধারণত চিঠির উত্তর লিখতে খুব বেশী দেরী হয়না সুকুমারের। পামেলা লেখে সপ্তাহে দুবার। যেদিন চিঠি পায় সেইদিনই তাকে উত্তর দেয় সুকুমার। তাকে সে সব কথা লেখে—এখানকার খুঁটিনাটি খবর—তার কারখানার দৈনন্দিন জীবনের কথা।

মার চিঠি সহজে খুলতে চায়না সুকুমার। অনেকদিন তার পকেটে পকেটে ঘোরে—সে জানে কি লেখা আছে তাতে। তাঁর অশান্তির কথা—দারিদ্র্যের কথা—সংসারের নানা দুঃখ-দৈন্যের কথা। তবু উত্তর লেখে সুকুমার—তাঁকে দেয় আশ্বাস।

কিছুদিন আগে হেন্‌েল মেয়ার রোড থেকে পিকচাব পোষ্ট কার্ড এসেছিল একটা। সকলে সই করেছে তাতে। শুভেচ্ছা জানিয়েছে সুকুমারকে প্রত্যেকে। তাতে লেখা ছিল, সুকুমারের ঘর খালি পড়ে আছে যেমনকার তেমন—যার আসবার কথা ছিল সে আসেনি—কাজেই সুকুমার যে কোন দিন এসে তার ঘর দখল করতে পারে। অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে এ চিঠির উত্তর খুব তাড়াতাড়ি দিয়েছে সুকুমার।

কিন্তু ক্লোদের ছোট্ট চিঠি!

প্রিয় সুকুমার,

আজ সকাল সাতটা থেকে শুধু মনে পড়ছে তোমাদের টেগোরের লেখা একটি লাইন,

"হে ভারত নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি ত্যাজিতে মুকুট-দণ্ড—"

ক্লোদ

এ চিঠির কি উত্তর লিখবে সুকুমার!

জ্ঞান হবার পর টেডের প্রথম কথা, জিন—

খবর পেয়ে জিন্ দেখতে গেল স্বামীকে। বড় দুর্বল টেড, তাই সেখানে ভীড় করা ডাক্তারের বারন। তবু সুকুমারকে ডাক্তার যেতে দিল জিনের সংগে। প্রথম কারণ, সে ভারতীয় তাই একটু খাতির, দ্বিতীয় কারণ, টেডের বিশেষ বন্ধু সুকুমার।

বাঁ গাল ঝলসে গেছে টেডের। খুব অল্পের ওপর দিয়ে বেঁচে গেছে চোখ। সারতে বেশ দেরী হবে মনে হয়।

জিন্ আমি আর বাঁচবো না—উঃ—

ওকথা ব'লোনা, টেড—

আমি মরে যাবো, ডার্লিং—

না না, আমাকে একা ফেলে যেও না, তার স্বামীর বুকের ওপর মাথা রেখে কেঁদে উঠলো জিন, তোমাকে বাঁচতে হবে—বাঁচতেই হবে। কান্নার তোড়ে স্বর জড়িয়ে গেল তার।

এমন ক'রে অনেকদিন কাউকে কাঁদতে দেখেনি স্থকুমার। নার্স এসে সরিয়ে নিয়ে গেল জিন্‌কে, বললো, এমন করলে তাকে আর আসতে দেয়া হবে না হাসপাতালে—এরকম করা টেডের দুর্বল শরীরের পক্ষে খুব খারাপ।

ডাক্তারের সংগে কথা ব'লে জানলো স্থকুমার যে টেডের আঘাত বিশেষ কিছুই নয়—কোন ভয় নেই। সপ্তাহ তিনেক তাকে হাসপাতালে থাকতে হবে। তবে কারখানায় কাজ করতে দেরী হবে তার—মানে গালের ঘা যতদিন না শুকোয়।

ছলছল চোখে বললো মিস্ ফিসার, আর কয়েকদিন পরেই তুমি চলে যাবে স্থকুমার, হয়তো আর আমাদের দেখা হবেনা—আবার আসবে এখানে?

আর একবার কারখানায় কাজ করতে হবে ডিপ্লোমা পাবার আগে —প্রায় বছর দুয়েক পর—তবে হয়তো এ কারখানায় ওরা আর নাও পাঠাতে পারে—

বছর দুয়েক—সে তো অনেক দেরী, বল আবার কবে আসবে?

কোন ছুটিতে কিছুদিন বেড়িয়ে যেতে চেষ্টা করবো, মিস্ ফিসার। পামেলাকেও সংগে এনো এবার—আমি তোমাদের সব সময় জায়গা দেবো।

খুব চেষ্টা করবো, ধন্যবাদ, মিস্ ফিসার।

এত সুন্দর ছেলে তুমি সুকুমার।

* * *

* *

আবার লণ্ডন—যেন নিজের দেশে ফিরে এলো সুকুমার—সেই লণ্ডন—তার মাতৃভূমি লণ্ডন। দ্বিগুন ভালো লাগলো এবার সুকুমারের। সে নিজেও জানতো না যে সে এত ভালোবাসে লণ্ডনকে। এত দিন বাইরে ছিল কেমন করে।

বড় ক্লান্ত সুকুমার তাই নিলো ট্যাক্সি। রাত্তিরও হয়েছে। হেসেলমেয়ার রোডে পৌছতে তার বেশ দেরী হয়ে গেল। ও লিখেছিল এদের যে রাত্তির হবে পৌছতে, তাই ট্রেনেই খেয়ে নেবে—ওর জন্যে যেন এরা খাবার নিয়ে অপেক্ষা না করে। বাড়ী এসে দেখলো সুকুমার যে কারুর সাড়া শব্দ নেই—একেবারে চুপচাপ। শুধু উরসুলা এইমাত্র টেলিফোনের কাছ থেকে উঠে দাঁড়ালো।

গুড্ ইভনিং, উরসুলা—

গু—ড ই—ভনিং সুকুমার—এসো আমার ঘরে।

তুমি যাও—আমি এগুলো ঘরে রেখে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আসছি—এডওয়ার্ড কই ?

হেসে উরসুলা বললো, এলিজাবেথের সংগে বেড়াতে গেছে—এখনো ফেরেনি।

খুব ভালো, সুকুমার নিজের ঘরে জিনিষপত্র রেখে মুখ হাত ধুয়ে টোকা মারলো উরসুলার ঘরে। এ ঘর থেকেও আলেকজান্দ্রা প্যালেস্ স্পষ্ট দেখা যায়। আজ ভারী জোৎস্না ফুটেছে বাইরে—পামেলা কি করছে এখন !

ঠিক সময় তুমি এসে পড়েছ সুকুমার, উরসুলা শক্ত করে সুকুমারের

একটা হাত ধরে বললো, তোমার সংগে আমার বিশেষ জরুরী পরামর্শ আছে—অবশ্য এডওয়ার্ডের পরামর্শ নিলে ভাল হতো, যা বুদ্ধি ওর—কিন্তু একথা আমি কিছুতেই ওকে জানাতে চাইনা—

কি কথা, উরস্থলা ?

জানো এডওয়ার্ডের বাবা ফিরে এসেছিল আমার কাছে।

আঁ্যা ? তাই নাকি ? খুব ভাল কথা।

না না না, মাথা নেড়ে খুব গম্ভীর হ'য়ে বললো উরস্থলা, মোটেই ভাল কথা নয়, স্থকুমার, এখন আমি কি করি বল তো—এমন মুস্কিল আমার জীবনে কখনও হয় নি।

এ আবার মুস্কিল কি, উরস্থলাকে আশ্বাস দিয়ে স্থকুমার বললো, ভুল করেছিল একটা অথচ দেখ আজও সে তোমাকে ভোলেনি, তাই আবার তোমার কাছে ফিরে আসতে চায়, এখন তুমি যদি তাকে না ফিরিয়ে নাও—

আমি কারুর কথাই ভাবছিনা স্থকুমার, আমার কথা নয়, আইভ্যানের কথাও নয়, শুধু ভাবছি এডওয়ার্ডের কথা—ও কি ভাববে বল তো ? তাই আমি এতক্ষণ ফোনে আইভ্যানের সংগে কথা বলছিলাম—যাই বল তুমি এডওয়ার্ডকে আমি ওর বাপের সংগে কিছুতেই থাকতে দেবো না।

তাহলে কি করবে, উরস্থলা ?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে উরস্থলা বললো, আসতে যখন চায় আমার কাছে ফিরে আইভ্যান তখন আস্থক—এ ঘরেই থাকতে পারে ও—আমি যেমন আসি উইক্-এণ্ডে তেমনি এসে ওর সংগে কাটিয়ে যাবো, তবে এডওয়ার্ডকে ওর সংগে আমি কিছুতেই থাকতে দেবো না—তাকে অক্সফোর্ডে ভর্তি করে দেবো—আমার চোখে চোখে থাকবে—আর উইক-এণ্ডে আমি যেমন ওর বাপের কাছে আসবো—ও-ও

তেমনি আসবে এলিজাবেথের কাছে—কি বল সুকুমার, এই বেশ ভালো না ?

খুব ভালো, উরসুলা।

তাহলে যাই আইভ্যান্‌কে ফোন করে বলি সেকথা ?

কিন্তু এখন বেশী রাত্তির হয়ে গেছে না ?

রাত্তির ? হেসে উরসুলা বললো, ও হাঁ করে বসে আছে আমার মতামত শোনবার জন্যে—আমাকে সমস্ত জীবন ধরে জ্বালিয়েছে কিন্তু নিজেও খুব জব্দ হয়েছে, বুঝেছ সুকুমার ?

উরসুলা ফোন করতে গেল স্বামীকে।

পরের দিন ব্রেকফাস্টের টেবিলে সুকুমারকে দেখে সাড়া পড়ে গেল আনন্দের। যেন ঘরের ছেলে অনেকদিন পর ঘরে ফিরে এসেছে। জন্‌ আর মনিকা ছুটে এলো তার কাছে। ছেলেরা এ সময় খুব ব্যস্ত, একেবারে বেরোবার মুখে, তবু তারা বললো, সন্ধ্যেবেলা বাড়ী থেকো সুকুমার, তোমার কারখানার গল্প শোনা যাবে।

হেলেন বললো, খুব খেটেছ বোধ হয়, বড শক্ত হয়ে গেছে তোমার মুখ—

মারজোরী বললো, বড় কঠিন ঠাঁই কারখানা।

ক্লোদ বললো, কেমন আছো, সুকুমার ?

ভালো, কিন্তু ক্লোদ আমি খুব দুঃখিত তোমার চিঠির উত্তর না দেয়ার জন্যে—

আমি তো উত্তর আশা করিনি সুকুমার, হেসে ক্লোদ বললো।

মানে এত সুন্দর তোমার চিঠি যে আমার অত বিদ্যে—

থাক্‌ কিছু বলতে হবে না—হঠাৎ ও লাইনগুলো মনে এলো, তোমাদের দেশের কবি—তাই তোমাকেই লিখে দিলাম।

অড্রি কই, মারজোরী ?

ওর মা-বাবার কাছে চলে গেছে আর এ বাড়ীর শেয়ার বিক্রী করে দিয়েছে নোয়েলের কাছে।

হেলেন বললো, ও ঘরটাকে আমরা হাসপাতাল করেছি—বাচ্চাদের অসুখ হলে ও ঘরে রাখবো।

সুকুমারের বড় ইচ্ছে করলো পিটারের কথাও জিজ্ঞেস করে, কেমন আছে সে, কবে ছাড়া পাবে। কিন্তু না, পরের ব্যাপারে অত কৌতূহল দেখানো এদেশের রীতি বিরুদ্ধ। যদি কিছু বলবার থাকে তাহলে এরা নিজের থেকেই বলবে।

বড ঘুমোয় দেখছি কমিউনিষ্টরা, এখনও আমাদের কমরেড এডওয়ার্ডের ঘুম ভাঙেনি, হাসতে লাগলো সুকুমার।

একথার পর টেবিলের প্রত্যেকের মুখের ভাব গেল বদলে। চুপ হ'য়ে গেল তারা—ভেবে পেলনা কে আগে কথা বলবে। শুধু সুকুমারের দু'পাশ থেকে আপন মনে চেঁচাতে লাগলো জন্ আর মণিকা।

তুমি জাননা সুকুমার, খুব আস্তে আস্তে বললো হেলেন, কেমন ক'রেই বা জানবে—সে থেমে গেল।

মারজোরী কথা শেষ ক'রে দিল, দশদিন আগে পাঁচ দিনের জ্বরে হাসপাতালে এডওয়ার্ড মারা গেছে!

সে কি ? নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলো না সুকুমার, আমি কাল রাত্তিরে অতক্ষণ কথা বল্লাম উরসুলার সংগে অথচ সে তো আমায় কিছুই বললো না —

তার পর থেকেই, আবার বললো হেলেন, উরসুলার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে, শুধু স্বামীর কথা বলে আর দিনরাত যেখানে সেখানে আন্দাজে আন্দাজে যাকে তাকে ফোন্ করে—উঠে দাঁড়িয়ে মারজোরী বললো, যাই উরসুলার ঘরে ওর ব্রেকফাষ্ট নিয়ে—ওকে খাওয়ানো বড় মুস্কিল—

হেলেন বললো, বেশীদিন আর বাড়ীতে রাখা যাবে না ওকে—ডাক্তার ব্যস্ত হয়ে উঠেছে হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্যে—

সুকুমারের মুখ থেকে শুধু বেরুলো, এডওয়ার্ড মারা গেছে!

*

কয়েক সপ্তাহ পরে শেষ এপ্রিলের এক ভরা গোধূলিতে হ্যাম্পষ্টেড হীথে!

ইচ্ছে করে যদি কেউ হারিয়ে যেতে চায়—এক হ'য়ে যেতে চায় প্রিয়জনের সংগে, যেন তারই জন্যে লণ্ডনের এই হ্যাম্পষ্টেড হীথ। সমুদ্রের মতো বিশাল, এপার ওপার দেখা যায়না শুধু শোনা যায় হাওয়ার গর্জন। ঘন ঘাসের সবুজ তরংগে ভেসে ফেরে কত প্রেমিকের দল। কত গাছের মৌন সম্মতি, কত পাতার মর্মর, কত কামনার ইন্ধন, কত যৌবনের আগুন! প্রেমিকের প্রিয়তম মালঞ্চ এই হ্যাম্পষ্টেড হীথ।

হীথের একধারে পাহাড়ের মতো এক টিপির ওপর পামেলার কোলে মাথা দিয়ে শুয়েছিল সুকুমার। আর কেউ কোথাও নেই, আর কাউকে দেখা যায় না—মাথার ওপর এপ্রিলের আকাশে ফিকে রঙ্, চারপাশে ঘন সবুজের মেলা—শুধু সুকুমার আর পামেলা।

এই, ঘুমচ্ছো নাকি?

আঃ বিরক্ত করো না, হেসে সুকুমার পাশ ফিরলো।

উনি ঘুমবেন আর আমি চুপ করে বসে থাকবো।

প্যাণ্টের পকেট থেকে একটা চকলেটের স্ল্যাব বের বরে সুকুমার বললো, খাও।

ধন্যবাদ, অল্প একটু ভেঙে মুখে দিয়ে আর এক টুকরো সুকুমারের মুখে পুরে দিল পামেলা।

থু—থু, কি করলে প্যাম্—আমি চকলেট খাইনা।

তুমি একটা পশু!

তা না হ'লে আর মনের মতো বন্ধু নিয়ে এ জঙ্গলে আসবো কেন? সুকুমার আবার শুয়ে পড়লো।

পশুর বন্ধু সব সময় পশু হয় না, অনেক সময় মানুষও হয়।

তুমি বুঝি মানুষ?

নয় তো কি, তোমার মতো পশু নাকি?

আমি তো বাঘ কিন্তু তুমি যে বাঘিনী নও তা জানি, তুমি বেড়াল—

তবে দেখ, পামেলা সুকুমারের চুল টেনে মুখ খামচে এক কাণ্ড বাধিয়ে তুললো।

আহাহা, করো কি, রক্ত বেরোবে যে—

বেরোক্, তোমাকে খুন করবো আমি।

তুমি আমাকে যতই মারো আর ধরো আমি কিন্তু খাঁটী যীশু—তোমাকে ঠিক এমনি ক'রে আদর করবো—

খবরদার যীশুকে নিয়ে ঠাট্টা করবে না—

ও হো হো, ভুলে গিয়েছিলাম তুমি তো ধার্মিক!

নয়তো কি, তোমার মতো হীথেন্ নাকি?

থাক্‌গে ধর্ম চর্চা, তোমার বাংলা শেখার কি হলো?

তুমি তো শেখালে না, আমি বই পড়ে নিজেই শিখেছি।

বল তো বাংলায়, আই লাভ ইউ?

পামেলা তখুনি বললো, আমি তোমাকে বালোবাসি!

বালো নয়, ভালো, বালো বলে বাঙালরা।

পামেলা কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলো, বাঙাল কি?

বাঙাল? কথাটার যথাসাধ্য সহজ ব্যাখ্যা করে সুকুমার বললো, বলো আবার বাংলায়, আই লাভ ইউ—

আমি তোমাকে, খুব বড় হাঁ করে পামেলা বললো, ভা—আলো বাসি।

যাক্ বললে সেকথা—আমি কিন্তু এখনো তোমায় বলিনি—তুমি আগে বললে—আমি ভেবে দেখবো কি করতে পারি—

স্নকুমারের রসিকতা বুঝতে পেরে পামেলা বললো, আমি তো আর ভালোবাসার লোক পেলাম না—

হ্যাঁ হ্যাঁ, হেসে স্নকুমার বললো, মিঃ বিজন ঘোষের মতো লোক রয়েছে যখন—

সে আবার কে?

এর মধ্যেই ভুলে গেলে তাকে? সেই তোমাকে দিশি খাওয়ার নেমন্তন্ন করেছিল।

ও—ও—ও, আরে তার সংগে একদিন রাস্তায় দেখা—এক চীনে মেয়ের সংগে চলেছে, আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি মাথা নীচু করে পাশ কাটিয়ে গেল।

তোমাকে আবার কেউ ভয় করে নাকি?

রাগতে তো দেখনি আমায়, জিজ্ঞেস করো তোমার ওই মিঃ বিজন ঘোষকে।

এত প্রাধান্য দেবো আমি তোমাকে যে মিঃ বিজন ঘোষকে জিজ্ঞেস ক'রে তোমার রাগের ইতিহাস শুনতে হবে।

সব সময় ঠাট্টা, যাও কথা বলবো না তোমার সংগে।

বাঁচলাম, এবার তাহ'লে একটু ঘুমিয়ে নিই—সে তুমি কোথায়!

সে আবার কে?

এই না বললে কথা বলবে না?

এই একটা কথার পরে বলবো না, বল না সে কে?

আমার প্রাণের বন্ধু।

কবে আলাপ হলো? পামেলার স্বর একটু কাঁপলো, কিছু বলনি তো?

কথা রাখো, বলেছিলে একটা কথার পর আর কথা বলবে না।

ঠাট্টা করছিলাম গো, তোমার সংগে কথা না বলে থাকতে পারি আমি—কোথায় দেখা হ'লো মে'র সংগে?

ল্যাঙ্কেশায়ার, কী ভালোই যে বেসেছিল আমাকে—

পামেলা এবার সত্যি কথা বন্ধ করলো। চুপ করে তাকিয়ে রইলো আকাশের দিকে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলো সুকুমার, বোকা মেয়ে!

বোকা বলছ কেন?

কি ভাবছ তুমি?

তোমার কথা নয় মোটেও।

আহা হা, আমার কথা হবে কেন, তুমি ভাবছ মে'র কথা।

পামেলা উত্তর দিলো না।

তুমি আমাকে এতটুকুও বিশ্বাস করনা না, পামেলা?

বিশ্বাস করি ব'লেই তো ভাবছি।

তুমি বড বোকা, পামেলা।

বেশ, আমি বোকা, সবাই তোমার মতো বুদ্ধিমান নয়।

আমি আর একটা প্রেম করেছি বলে রাগ হলো?

তুমি যা খুশী তাই কর, আমার কি যায় আসে?

এইবার হেসে সুকুমার বললো কারখানার সেই মেয়ে মে'র গল্প। অবশেষে যোগ করলো, জানো পামেলা সে হতাশ হ'য়ে আমাকে বললো, তুমি বড় ঠাণ্ডা।

তোমাকে ব'লেছে ঠাণ্ডা, এতক্ষণে কেটে গেল পামেলার মুখের মেঘ, তোমার আসল পরিচয় পায়নি তাই।

আমার আসল পরিচয় তুমি ছাড়া আর কেউই পায়নি—আমি জীবনে প্রথম বার তোমাকেই চুম্বন করেছি।

কখ্খনও না, আমি কিছুতেই বিশ্বাস করিনা।

সত্যি বলছি পামেলা, আমার জীবনে প্রথম মেয়ে তুমি।

কিন্তু এই চব্বিশ বছর বয়স অবধি —

আমাদের দেশ বড় গোঁড়া, মেয়েরা আরও, সকলেই চায় প্রথম মানুষকে চিরকালের জন্যে। তাই সম্পর্ক একেবারে পাকাপাকি না হলে চুম্বনের সুযোগ পাওয়া যায় না।

আমার আগে তোমার একটি মেয়ে বন্ধু ছিল না?

না, আমাদের দেশে মেয়ে বন্ধুর বালাই কম। তুমি আমার প্রথম বন্ধু। তোমাকে পেয়েই আমি জীবনে প্রথমবার ভালবাসলাম।

সুকুমারের বুকে মাথা রেখে পামেলা বললো, তাহলে বলে ফেললে যে আমাকে ভালবাস।

আমি ভেবেছিলাম বলবার দরকার হবেনা—তুমি নিজেই বুঝে নেবে।

বুঝেছিলাম গো।

বল তো কবে আমি তোমাকে ভালবাসলাম?

যেদিন আমাদের বাড়ীতে ছিলে--

হলো না।

যেদিন আলেকজান্দ্রা প্যালেসের আলো দেখতে দেখতে আমাকে প্রথম চুম্বন করলে—

এবারেও হলোনা, শেষবার চেষ্টা কর।

শেষবার? পামেলা থামলো, মনের আনাচে কানাচে যেন সে খুঁজে ফিরছে অতীতের প্রত্যেক মুহূর্ত, তুমি বল, সুকুমার।

বোকা পামেলা, সুকুমার তার একটা হাত গালে চেপে ধরে বললো, হেলেনমেয়ার রোডের বাড়ীতে সেই সোস্থালের দিন—যে মুহূর্তে তুমি এসে আমার পাশে বসলে—

সে কি? একটু অবাক হ'লো পামেলা, একেবারে প্রথম দৃষ্টিতে প্রেম? তারপর সুকুমারের চুল নিয়ে খেলা করতে করতে বললো, বল তো আমি কবে তোমাকে ভালবাসলাম?

যেদিন তোমাদের বাড়ীতে তোমাকে জোর করে আটকে রাখলাম?

হলো না।

যেদিন তোমাকে প্রথম চুম্বন করলাম—

না না—

তবে?

সেই সোস্থালে যখন গিয়ে তোমার পাশে বসলাম।

আরে, উঠে বসলো সুকুমার, আমি কিন্তু একেবারেই বুঝতে পারিনি, তাহলে অত ভয়ে-ভয়ে পরদিন ফোন করতাম না।

আমি কিন্তু বুঝেছিলাম যে তুমি খুব শীগগিরই আমাকে ফোন্ করবে—সেইদিন তোমাকে ভাল না বাসলে কিছুতেই প্রথম দিন ফোন নম্বর দিতাম না।

আমাকে একথা আগে বলনি কেন?

আমি তোমার বলার অপেক্ষায় ছিলাম।

আস্তে আস্তে সরে গেল গোধূলি। হাল্কা অন্ধকার দানা বাঁধতে লাগলো হীথের গাছে গাছে। দূরে দেখা গেল অনেক আলোর বিন্দু।

সুকুমার আবার শুয়ে পড়লো মাটিতে মাথা দিয়ে, একটু শোও প্যাম আমার পাশে, অনেকক্ষণ ব'সে আছো। তারপর সুকুমার বাঁ হাত রাখলো তার ঘাড়ের নিচে আর ডান হাত তার বাঁ গালে রেখে বললো, প্যাম্, তুমি আমাকে বিয়ে করবে?

কবে?

দু'বছর পরে আমি যখন পাশ করবো?

তুমি আমাকে ভারতবর্ষে নিয়ে যাবে?

হ্যাঁ।

কিন্তু—

বল, প্যাম্?

দু'বছর পর তুমি যদি আমাকে আর ভাল না বাসো?

তোমাকে ছাড়া আমি আর কোনদিনও কাউকে ভালবাসতে পারব না, প্যাম্।

তোমার দেশের কোন মেয়ে?

অসম্ভব।

কিন্তু আমার যে একটুও বুদ্ধি নেই, সুকু।

তুমি ছোট্ট মেয়ে, বড় হ'লে বুদ্ধি হবে।

কিন্তু তুমি এত বুদ্ধিমান—

আমাকে নিয়ে তুমি সুখী হবে কি?

খুব সুখী হবো, প্যাম্।

পামেলা চোখ বন্ধ করে কি যেন ভাবলো কয়েক মুহূর্তের জন্যে। তারপর চোখ খুলে সুকুমারের দিকে তাকিয়ে বললো, দু'বছর পরে আমি তোমাকে বিয়ে করবো সুকু, বলেই সুকুমারের দিকে পাশ ফিরে তার বুকে মুখ লুকোলো।

* * *

অস্ত্রির একটা খবর নেয়া দরকার। যত লোকের সংগ, আলাপ তাদের কাউকেই ছাড়তে চায় না সুকুমার—এদেশে যত বাড়ে তার চেনা লোক, তত বাড়ে তার মন।

এ বাড়ী থেকে চলে যাবার পর অস্ত্রির কোন খবর রাখে না এরা—অস্ত্রিও কোন খবর নেয়নি। তার মা বাবা কড়া প্রকৃতির লোক—এ বাড়ীর লোকদের তারা বিশেষ পছন্দ করে না। হয় তো, সুকুমার

ভাবে, অদ্রি কড়া শাসনের মধ্যে আছে এখন। তবু তার একটা খবর নেয়া দরকার।

অদ্রির মা বাবাকে সুকুমারের বিশেষ পছন্দ হয় নি। হয়তো সুকুমারকেও তারা খুব ভালো চোখে দেখেননি—কেমন অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন তার দিকে—একটা কথাও বলেননি। কিন্তু ওসব গ্রাহ্য করে না সুকুমার—ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানো তার স্বভাব নয়। তাই হেলেনের কাছ থেকে ফোন্ নম্বর নিয়ে সুকুমার সটান্ একদিন ফোন করলো অদ্রিকে।

গম্ভীর গলায় প্রশ্ন এলো, কে কথা বলছো?

আমি অদ্রির বন্ধু।

কি নাম?

সুকুমার।

কি?

সুকুমার—ভারতীয় ছাত্র।

কোন উত্তর এলোনা কিছুক্ষণ, তারপর আরও গম্ভীর গলায়, আমি অদ্রির বাবা।

ও, শুভ সন্ধ্যা মিঃ হল—

শুভ সন্ধ্যা—অদ্রির সংগে তোমার কোথায় আলাপ হলো?

হেসেলমেয়ার রোডে—আমরা একসংগে থাকতাম—

ভদ্রলোক বললেন, যাক্‌গে কিন্তু সে এখন লণ্ডনে নেই— কি দরকার তোমার তার সংগে?

আমি এখানে অনেকদিন ছিলাম না—তাই ও কেমন আছে শুধু জানতে চাই—কোথায় গেছে ও?

ধন্যবাদ, খুব ভালো আছে অদ্রি, কিন্তু ও গেছে ডেনমার্ক, স্কান্ডেসান্ আর্মির হ'য়ে কাজ করতে।

কবে ফিরবে ?

বলতে পারলাম না।

অনেক ধন্যবাদ, মিঃ হল—নমস্কার।

হ্যাঁ হ্যাঁ, নমস্কার।

ক্লোদ নিজের ভাষায় ফরাসী কবির কবিতা পড়ে শোনাচ্ছিল সুকুমারকে ; পল ভেরলেইনের লেখা, শরতের গান।

তার পড়া শেষ হলে সুকুমার বললো, কিছুই বুঝলাম না কিন্তু এতো মিষ্টি তোমাদের ভাষা !

এ আমার বড়ো প্রিয় কবিতা সুকুমার—বোধ হয় আধুনিক ফরাসী কাব্য সাহিত্যের এটি একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা। এতো ভালো কবি আছে আমাদের দেশে কিন্তু ভাষা না জেনে তাদের অনুবাদ পডবার কোন মানে হয় না। পল্‌ভেলেরি খুব জনপ্রিয় কবি ছিল—তার কবিতা ইংরেজীতে পড়েছ, সুকুমার ?

সুকুমার মাথা নেড়ে বললো, না।

আমার ভেলেরিকে বড় শক্ত মনে হয়, একজনকে আমার ভালো লাগে তার নাম, অ্যাপোলিনিয়ার—ওকে অনুবাদ করা শক্ত। কেননা তার শুধু ছন্দের কলা কৌশল। আর্ট গ্যালারী থেকে ছবি চুরি করে তাকে জেলে যেতে হয়েছিল—

বেচারী কবি, সিগ্রেটে টান মেরে হাসলো সুকুমার।

অবশ্য এখন লোকে ভালবাসে পল্‌ এলুয়ারকে—এদের কথা তুমি জাননা, সুকুমার ?

সুকুমার বললো, না ভাষাটা জানিনা কি না।

শিখে নাও না, খুব সোজা শেখা।

এত ব্যস্ত, আর আমাদের কোর্স এত আলাদা—

কিন্তু ফরাসী সাহিত্য এত সমৃদ্ধ যে প্রত্যেকেরই ও ভাষা শেখা উচিত—অ্যান্থুই আর জিরোত্যুর মতো নাট্যকার খুব কম দেখা যায়—সুকুমার সত্যি ফ্রেঞ্চ্ শিখবে?

হেসে সুকুমার বললো, দেখি।

উচ্ছ্বসিত হয়ে ক্লোদ বলে যেতে লাগলো ফরাসী সাহিত্য সম্পর্কে আরও নানা কথা।

সুবিকাশের সংগে টেলিফোনে কথা বলে একদিন ক্লাশের পর পামেলাকে নিয়ে গোল্ডার্স গ্রীনের দিকে পা বাড়ালো সুকুমার। অনেকদিন ধরে সুবিকাশ অপেক্ষা করছে পামেলার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে। এমনিতেই দেরী হয়ে গেছে তাই সুকুমার ভাবলো, ওটা সেরে ফেলা যাক্। আজ দু'জনকেই নেমন্তন্ন করেছে সুবিকাশ।

রাসেল স্কোয়ার টিউব ষ্টেশনের লিফটে সুকুমারের একটা হাত নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে হেসে পামেলা বললো, আবার তোমার ভারতীয় বন্ধু?

হ্যাঁ তার হাতে চাপ দিয়ে সুকুমার সিগ্রেটের ধোঁয়া ছাড়লো, তোমাকে আর একটা সুযোগ দিচ্ছি—

কিন্তু এবার যে তুমি সংগে আছো।

তাই অন্তত আমার কথা মনে করে রাগারাগি যদি করতেই হয় তাহলে খাবার পরে করো—না খেয়ে বেরিয়ে আসতে হলে আমি বড় দুঃখিত হবো।

এও দিশি খাওয়াবে নাকি?

জানিনা, তবে এ নিজে রান্না করবে না, দিশি ল্যাণ্ডলর্ড আর আইরীশ ল্যাণ্ডলেডির ব্যাপার—

স্বামী-স্ত্রী ?

থাকে যেমন ভাবে দেখে তাই মনে হয় বটে তবে একেবারে ঠিক বলতে পারি না।

তোমার ভাষা একটু ভালো কর স্নকুমার।

আমি চাই যা ভাবি তার অবিকল প্রকাশ।

আনোয়ার, তোমার এ বন্ধুর নাম কি ?

স্নবিকাশ।

এও স্ন—তোমার আত্মীয় নাকি ?

ও তাই মনে করে বটে—যদিও রক্তের সম্পর্ক নেই।

তোমার কথা বোঝা দিন দিন শক্ত হচ্ছে।

তবে এ বন্ধু আশা করি জোর-জবরদস্তি করবে না তোমার সংগে কারণ স্ত্রীর ছবি দিয়ে এর ঘর সাজানো।

বিবাহিত ?

বোধ হয়।

সন্ধ্যে সাতটার একটু আগে ওরা এসে পৌছলো স্নবিকাশের বাড়ী। এদের আসবার খবরটা বোধ হয় আগেই ছড়িয়েছিল বাড়ীময়। এরা ভেতরে ঢুকতেই অনেকে এদিক-ওদিক থেকে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগলো। কেউ কেউ এগিয়ে এসে পামেলাকে বললো, গুড ইভনিং আর স্নকুমারকে বাংলায় বললো, খাসা আছেন দাদা—এই না হলে আর বিলেতে থাকা কি !

স্নকুমার গম্ভীর হয়ে বাচাল ছোকরাটাকে বললো, গুড ইভনিং—চলো স্নবিকাশ তোমার ঘরে।

সেই বাচাল ছোকরা বললো, ওহে অতুল, ঘর তো এদেরই জন্যে—আমরা বিলেতে এসেও সেই বাঙালীই রয়ে গেলাম।

অতুল উত্তর দিল, কত ঘর বাহির হইল দিবারাত্তি !

সুবিকাশের ঘরে এসে সুকুমার একটু অবাক হলো। তার স্ত্রীর ছবি একটিও নেই সেখানে।

বসুন বসুন, ওদের খাতির করে বসতে বললো সুবিকাশ। তার ঘরে বিদেশীনী বোধহয় এই প্রথম ?

সুবিকাশ বাবু, ইংরেজীতে বললো সুকুমার, কই আপনার স্ত্রীর ছবি একটিও দেখছি না যে ?

অ্যাঁ, কাঁদো কাঁদো হয়ে বাংলায় বললো সুবিকাশ, এ কি করলেন সুকুমার বাবু ?

সুকুমার কিছু বুঝতে না পেরে বোকার মতো তাকিয়ে রইলো তার মুখের দিকে। তবে কি তার স্ত্রী মারা গেছে।

কি হয়েছে আপনার স্ত্রীর ?

হবে আবার কি, হতাশ হয় সুবিকাশ পামেলার দিকে লক্ষ্য করে বললো, এর সামনে স্ত্রীর কথা তোলবার কি দরকার ছিল ? উনি আসবেন বলে সব ছবিগুলো আমি সরিয়ে ফেলেছি। আমি আর কাউকে বলতে চাই না যে আমার বিয়ে হয়েছে। আর পারছি না সুকুমার বাবু, আমি এদের সংগে অবিবাহিতের মতো মিশতে চাই।

সুকুমার একটু রেগে বললো, মিশতে চাইলেই এদের সংগে মেশা যায় না সেকথা তো ভাল ভাবে জেনেছেন। আর বিয়ে করে অবিবাহিত সেজে ছলনা করেও বিশেষ সুবিধা হবে না।

ছি ছি, আমাকে ভুল বুঝবেন না সুকুমার বাবু—আমার মনের অবস্থা যদি আপনি জানতেন !

পামেলা এদের আলোচনার এক বর্ণও বুঝতে না পেরে একবার এর আর একবার ওর মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসেছিল।

সুকুমার তাকে জিজ্ঞেস করলো, Can You speak Bengali Pam ?

তখুনি পামেলা উত্তর দিলো, আমি তোমাকে বালোবাসি !

কলকাতার ওই নোংরা গলির ছোট বাড়ীতে কিছুতেই পামেলাকে নিয়ে ওঠা যাবে না। একটা বাড়ী নিতে হবে লেকের কাছে। শরৎ চ্যাটার্জি ষ্ট্রীটের ওপর হলেই সব চেয়ে ভালো হয়। বাড়ী থেকে লেক দেখা যাবে। আর একটা ছোট মোটর গাড়ীও চাই। লাল রঙের অষ্টিন এইট। বাস্-ট্রামের যা অবস্থা আজকাল—পামেলার সংগে বেড়াতে বেরোলেই হয়েছে আর কি! মণ্টু, ঘুনু, ছায়া, রানুর সংগে পামেলার খুব ভাব হবে নিশ্চয়ই। ওরা ইংরেজীটা ভালো করে শিখে নেবে আর পামেলাও বাংলা শিখে নেবে ওদের কাছ থেকে। মাকে নিয়ে একটু মুস্কিল। প্রথম কয়েকদিন একটু অসুবিধা হবে তাঁর। কিন্তু যেমন মেয়ে পামেলা—খুব সহজেই আপন করে নেবে তাঁকে!

সকলেই ভালোবাসবে সুকুমারের বিদেশীনী স্ত্রীকে। শাড়ী পরে বেশ দেখাবে কিন্তু ওকে। তবু মাঝে মাঝে স্কার্ট পরে সুকুমারের সংগে ও খেতে যাবে চৌরঙ্গীর কোন রেঁস্তোরায়। সারাদিন ঘুরবে। গাড়ী চালিয়ে বাড়ী ফিরে আসবে অনেক রাত্তিরে। সুকুমার বেশী চালাবে না মোটর। ও কাজটা পামেলার হাতেই তুলে দিতে হবে।

আর তো মোটে আড়াই বছর! দেখতে দেখতে কেটে যাবে। দিনগুলো যেন পাখা মেলে নিমেষে উড়ে যায়। বড় চাকরী সুকুমার তো পাবেই। বিলেতের ফ্যারাডে হাউসের পাশ করা এঞ্জিনীয়ার! কত মাইনে হবে তার? হাজার খানেক নিশ্চয়ই। তার কমে চাকরী নেবে কেন ও? খুব হয়ে যাবে ওতে সকলের। কিছুদিন কাজ করবার পর আফিসের খরচে কিছুদিনের জন্যে ইংলণ্ডে আবার ও পামেলাকে নিয়ে ঘুরতে আসবে। আর যদি সম্ভব হয় তাহলে মণ্টু, ঘুনুকেও বিলেত পাঠাবে সুকুমার। ওরা বিলেত ঘুরে গেলে পামেলাকে আরও ভালো লাগবে ওদের!

মোটে আড়াই বছর! তারপর··

মা'র চিঠি।

কল্যাণবরেষু

বাবা সুকু,

তোমার পত্র পাইয়া বড় আনন্দ হইল। ঠিক মতো পাশ করিতেছ ও কারখানায় খুব নাম করিয়াছ জানিয়া খুব খুশী হইলাম। আমি তোমার চিঠি জনে জনে দেখাইয়া বেড়াইতেছি। ইহা হইতে বড় আনন্দ তোমার মা-জননীর আর কি হইতে পারে। জানিতে চাহিয়াছ আমরা সকলে কেমন আছি। আমাদের কথা আর বলিও না। নানা জ্বালায় জ্বলিয়া মরিতেছি। এক জ্বালা যায় তো আর এক আপদ জুড়িয়া বসে। ভাড়াটে লইয়া বড মুস্কিলে পড়িয়াছি। একটার পর একটা তাহাদের হুকুম লাগিয়াই আছে। আজ বলে ঘরে চড়ুই পাখি বাসা বাঁধিয়াছে ভাঙিয়া দাও, কাল বলে বড় নোংরা, চুনকাম করো—পরশু বলে ছাদ ফুটা হইয়া জল পড়িতেছে, সারাইয়া দাও—আমি মেয়েমানুষ হইয়া কেমন করিয়া এতদিক সামলাইবো বুঝিতে পারিতেছি না। আর তোমাকে টাকা পাঠাইয়া চুনকাম করিবার অথবা ছাদ সারাইবার পয়সা কোথায় পাইব! তাই কিছু গয়না বিক্রি করিয়াছি। তুমি হয়তো রাগ করিবে কিন্তু কি করিব বল? উপায় নাই। গয়নাগুলি ছায়া রাণুর বিবাহের জন্যেই রাখিবার দরকার ছিল। কিন্তু তাহাদের বিবাহের সময় তুমি বড় ভাই বিলাত হইতে পাশ করিয়া মোটা মাহিনার চাকুরী করিবে—তুমি আবার গহনা গড়াইয়া ভালো করিয়া তাহাদের বিবাহ দিবে বলিয়া আমি আজ এতটুকুও দুঃখ করি না। তুমি আমাদের সকলের একমাত্র ভরসা। এখন তাড়াতাড়ি তুমি বড় চাকুরী লইয়া ফিরিয়া আসিলেই আমার হাড় জুড়ায়। ইহাদের সকলের ভার তোমার হাতে তুলিয়া দিয়া আমি নিশ্চিন্ত হই—এই কঠিন দায়ীত্ব হইতে মুক্তি পাই।

আমরা একপ্রকার ভালো আছি। তুমি প্রত্যহ দুধ খাইতেছ তো? ভাত খাইয়া একটু মিষ্টি খাইতে কিছুতেই ভুলিওনা যেন।

তোমার বাড়ীর সাহেব ও মেম সাহেবদের আমার নমস্কার জানাইবে আর তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানিবে।

ইতি

আশীর্বাদিকা

তোমার মা

তৃতীয় বছর

আবার জুলাই এলো।

গ্রীষ্ম বড় ভালো লাগছে এবার স্কুমারের। দু'টো হাড় ভাঙা শীত কাটিয়ে গরম তার এখন খারাপ ল'গে না। কাঁচা ঠাণ্ডা জল খাওয়ার অভ্যাস আজও গেলনা তার—ঢক্ ঢক্ ক'রে সে ঘনঘন জল খায়।

বাগানের কাজ করতে আর্থারের জুড়ি মেলা ভার। বাড়ীর বাগান আরও সুন্দর হয়েছে এবছর। অনেক নতুন গাছ ফুল ফুটিয়েছে। গন্ধ নেই, শুধু রঙের বাহার।

অন্ধকার হয় রাত্তির দশটার পর। ঘরে কেউ ব'সে থাকেনা— লাউঞ্জের পাট উঠে গেছে। এই বাগানে ভীড় জমে সকলের। খালি গায়ে রোদ খায় প্রত্যেকে। মেয়েদের কাপড়ও নামমাত্র গায়ে থাকে। স্কুমার এদের সামনে একেবারে খালি গায়ে বাগানে শুয়ে থাকবার কথা ভাবতেও পারে না। সবাই যখন কুমীরের মতো রোদে আরাম করছে—কোট-প্যাণ্ট্ পরে গাছের ছায়ায় বসে সে তখন রুমাল দিয়ে ঘাম মুছছে।

মারজোরী এককাপ চা স্কুমারের সামনে ধরে বললো, জামা-কাপড় খুলে ফেল স্কুমার—এমন সুন্দর রোদ—

না না, এই বেশ, ব'লেই আঁৎকে উঠলো স্কুমার, এরা আবার সেই চান করাবার মতো জোর করে জামা-কাপড় খোলাবে না তো!

চায়ে চুমুক দিয়ে স্কুমারের পাশে শুয়ে পড়ে মারজোরী বললো,

দেখ এদেশে বেশী রোদ আমরা পাই না, আর ওটা স্বাস্থ্যের জন্যে দরকার—

আমি দেশে এত রোদ পেয়েছি মারজোরী যে এখন আমার স্বাস্থ্যের জন্যে ওটার কোন দরকার নেই, চায়ের কাপ্ ঘাসের ওপর নামিয়ে রাখলো সুকুমার।

নিগ্রো জন ছুটে এসে মারজোরীর বুকের ওপর পড়ে তাকে চুমু খেয়ে ডাকলো, মামি!

হ্যালো জনি, তার হাত থেকে পুতুলটা ছিনিয়ে নিয়ে মারজোরী বললো, মনিকার পুতুল তুমি নিয়েছ কেন?

মনিকা আমার টেডি নিয়েছে।

যাও, পুতুল এখুনি দিয়ে তোমার টেডি নিয়ে এসো।

না, আমি এই পুতুল নিয়ে খেলা করবো।

যাও জন, লক্ষ্মী হও—

কথা শেষ হবার আগেই আর এক ধার থেকে চীৎকার করে উঠলো হেলেন, এই জন শীগগির মনিকার পুতুল দিয়ে যাও—

যাও জন—তোমার টেডি নিয়ে এসো!

মারজোরীও চেঁচিয়ে উঠলো, মনিকা জনের টেডি নিয়েছে।

সেটা তখুনি জনের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে হেলেন বললো, এই নাও টেডি—পুতুল নিয়ে এসো—ওটা একেবারে নতুন, ভেঙে দিতে পারো তুমি।

কারখানা থেকে ফিরে আসবার পর সুকুমার এ বাড়ীর অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে—অবশ্য তার বেশ সময় লেগেছিল এটা বুঝতে। আজকাল কিন্তু সময় লাগে না। মারজোরী আর হেলেনের কথা-বার্তা থেকেই সে ধরে নেয় যে এদের মধ্যে আর তেমন ভাব নেই। তারা দুজনে কথা বলে খুব কম। জনের কাছ থেকে মনিকাকে সব সময় আলাদা করে রাখবার চেষ্টা করে হেলেন। কাজেই একসংগে আড্ডা

আর তেমন জমেনা এ বাড়ীতে। যে-যার সংসার নিয়ে আলাদ থাকে। যদিও রান্না খাওয়া এখনো এক সংগেই হয়।

এমনিতেই বাড়ী ফাঁকা হয়ে গেছে। অড্রি পিটার নেই, উরসুল হাসপাতালে, এডওয়ার্ডের গলা আর শোনা যাবে না। তার ওপর মারজোরী আর হেলেনের সে অন্তরঙ্গতা গেছে ঘুচে। আর ক্লোদের তো দেখা পাওয়াই ভার—খালি বই আর বই। বেশীর ভাগ সময় সে বই নিয়ে একেবারে মুখ বুজে থাকে। বাকি রইলো জন আর মনিকা—তাদের সংগেও এখন খুব সাবধানে মিশতে হয় স্নকুমারকে দু'জনকে চকলেট দিতে হয় একেবারে সমান-সমান—মেপে মেপে আদর করতে হয়, তা' না হলে কোন মার মনে কি আঘাত লাগবে বলা যায়না। বড় অস্নবিধায় পড়লো স্নকুমার। আগে জন মনিকার সংগে মারামারি করলে যার দোষ তাকে বকতো হেলেন, ভাল করে বোঝাতো যে এমন করা ঠিক নয় কিন্তু আজকাল সে কোন কথা বলে না, ধাক্কা মেরে জনকে সরিয়ে মনিকাকে দূরে নিয়ে যায় আর বলে, জনটা বড় দুষ্টু, ওর সংগে তুমি খেলা করবে না মনিকা।

মনিকা মাথা নেড়ে বলে, আমি জনকে মারবো। স্নকুমারের এসব দেখে বড় অস্বস্তি বোধ হয়। এমন কেন হলো! এত ভাব ছিল ওদের কিন্তু এই কয়েকমাসে কি এমন ঘটলো যার জন্যে এই সাংঘাতিক পরিবর্তন। উত্তর খুঁজে পায়না স্নকুমার, কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতেও পারেনা। এ সময় অড্রি থাকলে বড়ো ভালো হতো। যা ঠাণ্ডা স্বভাব ওর—খুব সহজেই এ ব্যাপারটা মিটমাট করে দিতে পারতো ও।

এই সামান্য ব্যাপার থেকেই বাড়িতে একদিন একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল। জন আর মনিকা নিয়ে তর্ক স্নরু হলো মারজোরী আর হেলেনের মধ্যে।

ব্যাপারটা অবশ্য এমন কিছুই নয়। জন যখন মনিকার সংগে

মারামারি করছিল তখন হঠাৎ কেঁদে ওঠে মনিকা। সেই কান্না শুনে ছুটে আসে হেলেন। এসেই জনকে মারে খুব জোরে একটা থাপ্পড়— এইবার চীৎকার করে কেঁদে উঠলো জন। মারজোরী হট্টগোল শুনে এসে দেখে জন মাটিতে গড়িয়ে কাঁদছে।

কি হয়েছে জন? তাকে কোলে নিয়ে আদর করে জিজ্ঞেস করলো মারজোরী।

হেলেন মেরেছে।

মারজোরী একটু অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকালো হেলেনের দিকে। জানো মারজোরী, মনিকাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে বললো হেলেন, ও বড় মারে আজকাল মনিকাকে।

বাচ্চারা অমন করেই থাকে।

কিন্তু এমন করা উচিত নয়—তুমি ওকে ভালো শিক্ষা দিচ্ছনা কেন বুঝতে পারছি না।

শিশুকে আমি শিশুর মতো রাখতে চাই।

.তামার যা খুশী তাই কর। কিন্তু আমি চাই না মনিকাকে ও এমন করে মারধোর করে—

ওটা মারধোর নয়—ওরা খেলা করে।

যাহোক আমি এটা ভালোবাসি না।

কিন্তু জন ছেলেমানুষ, ওকে আমি ঠেকাবো কেমন করে?

আমি মনিকাকে ঠেকাই কেমন করে? আমি ওকে কখনও জনের সংগে মিশতে দিইনা।

তুমি অন্যায় কর হেলেন। বাচ্চাদের পক্ষে এটা খুব খারাপ।

আমার মেয়ের ভালোমন্দ আমি বুঝবো।

এটা একটু স্বার্থপরের মতো কথা হলো না?

আমি কারুর উপদেশ নিতে ভালোবাসিনা মারজোরী।

ও, আচ্ছা বেশ। জনকে নিয়ে মারজোরী সরে গেল।

দু'একদিন পর রাত্তিরে খাবার টেবিলে আর্থার কথা তুললো, নোয়েল এমন করে তো আর এক সংগে থাকা যাচ্ছেনা —

সেদ্ধ মাছ চিবিয়ে নোয়েল বললো, কি ব্যাপার?

আঃ, বাধা দিল মারজোরী, আর্থার ওকথা যাক।

না মারজোরী, আমরা কোন দাতব্য বাড়ীতে নেই, আমাদেরও সমান অধিকার—

গম্ভীর হ'য়ে আর একবার নোয়েল জিজ্ঞেস করলো, ব্যাপার কি? এইবার কথা বললো হেলেন, সত্যি জনের সংগে এক বাড়ীতে আমি কিছুতেই মনিকাকে মানুষ করতে পারবো না—ও একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে তাহলে।

খুব আস্তে আস্তে বললো আর্থার, কিন্তু তোমার মতে আমার স্ত্রী চলবে না হেলেন।

কিন্তু তার পুষ্যি আমার মেয়ের সংগে মিশে মারামারি করবে—তা আমি কিছুতেই সহ্য করবো না।

মারজোরী বললো, মনিকারও দোষ থাকে হেলেন কিন্তু তুমি সব সময় জনের দোষ ধরো।

আমাকে সংশোধন করবার চেষ্টা করো না মারজোরী।

আর্থার বললো, তোমার মতামত সব সময় ঠিক নাও হতে পারো হেলেন।

কিন্তু আমার মেয়েকে আমি নিজের মনের মতো করে মানুষ করবো, মারজোরীর মত নিয়ে নয়।

মুখ তুলে মারজোরী বললো, আমি তোমাকে কোন মতামত দিতে

যাইনি শুধু বলছিলাম এক সংগে থাকতে গেলে অন্যের দিকটাও একটু দেখতে হয়—

তোমার মতো ধৈর্য আমার নেই।

আর্থার খুব জোরে হেসে বললো, বাঃ চমৎকার!

খুব আস্তে চিবিয়ে চিবিয়ে শুধু কথা বললো নায়েল, আর্থার চেঁচিও না।

হুকুম নাকি?

অনুরোধ।

টাকা—আমরা জানি তোমার অনেক টাকা নোয়েল।

দয়া করে চুপ করো আর্থার।

সুকুমার ভেবেছিল গণ্ডগোল আরও বাড়বে, আরও তর্ক বিতর্ক হবে—এমন কি লাঠালাঠিও হতে পারে কিন্তু আর কিছুই হলোনা। পরের দিন থেকে মারজোরী আর হেলেন এমন করে কথা বলতে লাগলো যেন কিছুই হয়নি তাদের মধ্যে। সুকুমার নিশ্চিন্ত হলো। এত সহজে এ ব্যাপারের শেষ হবে সেকথা সে ভাবতে পারেনি। কিন্তু একেবারে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হ'লো খুব শীগগিরই আর কথা শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো সুকুমার। এ আরাম, বাড়ীর স্বাচ্ছন্দ্য, এতদিনের পরিচয় ছেড়ে এখন কোথায় যাবে সুকুমার?

একদিন সাপারের পর হেলেন আর নোয়েল দরজায় টোকা মেরে এলো সুকুমারের ঘরে। তারা বলতে এসেছে যে এ বাড়ী ছেড়ে তারা সাত আটদিনের মধ্যেই উঠে যাচ্ছে। নোয়েল কাছেই আর একটা বাড়ী কিনেছে সেখানেই যাচ্ছে তারা। মনিকা যা ভালোবাসে সুকুমারকে তাতে এদেরও খুব ইচ্ছে ছিল সে থাকে তাদের সংগে কিন্তু জায়গা হবেনা, অতিথির জন্যে একটি মাত্র ঘর—ক্লোদ থাকবে

সেখানে। সে চলে যাবার পর স্থকুমার ইচ্ছে করলে সে ঘরে থাকতে পারে। খুব আনন্দের সংগেই এরা জায়গা দেবে তাকে।

আর আর্থার? ওরা কি করবে?

ওদের খবর আমরা কিছুই বলতে পারবোনা—

হেলেন নোয়েল বেরিয়ে যেতেই স্থকুমার সটান চলে এলো আর্থার মারজোরীর ঘরে।

এসো স্থকুমার, মারজোরী চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললো, তোমার কথাই ভাবছি আমরা।

তাই তো, ম্লান হেসে স্থকুমার বললো, এখন কোথায় যাই আমি? কেন ঝগড়া করলে তোমরা?

আর্থার হাসলো, আমরা মানুষ স্থকুমার। এ বাড়ীটা ভাড়া দিয়ে দিচ্ছি। পরে ভালো দাম পেলে বিক্রি করে দেব—একটা ছোট ফ্ল্যাট নিচ্ছি কাছেই। কিন্তু সেখানে তোমাকে জায়গা দেয়া সম্ভব হবেনা। ঘর নেই, তোমার জন্যে আমরা খুব দুঃখিত—

কিন্তু তোমাদের চেনা-শোনা বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে কেউ কি রাখতে পারে না আমাকে?

এখন তো কারুর কথাই মনে পড়ছেনা। তুমিও খুঁজতে থাকো স্থকুমার। বোর্ডিং হাউসের অভাব নেই লণ্ডনে—

জানি, কিন্তু এত নিশ্চিন্ত হয়ে ছিলাম তোমাদের সংগে, মনে হতো যেন আমি তোমাদেরই একজন—

তোমার জন্যে আমরা খুব দুঃখিত স্থকুমার!

সব শুনে পামেলা বললো, এখন কোথায় যাবে তুমি?

খুব ভালো জায়গা, সেখানে থাকে একটি চমৎকার মেয়ে। জায়গাটা

যদিও একটু দূরে—কিন্তু অমন মেয়ে থাকলে আমি আরও দূরে থাকতে পারি—

কোথায়—কোথায়? পামেলা যেন কিছুতেই কৌতূহল দমন করতে পারছে না।

ব্ল্যাক্‌হীথে, মিঃ উইলিয়াম স্থইটের বাড়ী।

খিল্ খিল্ করে হেসে পামেলা বললো, দিচ্ছি তোমাকে আমাদের বাড়ীতে ঢুকতে—

তুমি না দিতে পারো কিন্তু তোমার বাবা দেবেন।

বাবা এখনও সাউথ্ আফ্রিকায়।

তবে তো আরও ভালো। তুমি হবে আমার ছোট্ট ল্যাণ্ডলেডি—

খবরদার আমাকে ল্যাণ্ডলেডি বলোনা।

আচ্ছা বেশ, কিন্তু আমার ব্যবস্থা কি করবে বলো?

পামেলা চুপ করে ভাবতে লাগলো। তারপর একসময় মাথা তুলে বললো, সত্যি আমাদের বাড়ীতে তুমি থাকলে এত ভালো হোতো, কিন্তু আমার এক মাসি আছেন এখন—পামেলা থেমে গেল।

এই থামলে কেন?

মাসি—মানে, ইণ্ডিয়ানদের পছন্দ করেনা।

তাতে কি হয়েছে? তিনি তো আর আমাকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন না—

মাঝে মাঝে বড় রাগ হয় আমার মাসির ওপর।

কেন?

তার অদ্ভুত মতামতের জন্যে।

তুমি বড় ছেলেমানুষ পামেলা, আমাদের দেশেও অমন অনেক বুড়োবুড়ী আছেন যারা ইংরেজকে পছন্দ করেন না। তোমাকে আমি

বিয়ে করবো শুনলে তাঁরা অনায়াসেই মনে করতে পারেন যে কোন মায়াবিনী আমাকে যাদু করেছে।

তাই নাকি ?

আরে হ্যাঁ, কাজেই ওসব বাজে ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামিও না।

যাক্ ওসব কথা কিন্তু তোমার থাকবার কি হবে ?

তুমিও চেষ্টা করো, আমিও চেষ্টা করি, ভালো জায়গা একটা জুটে যাবে নিশ্চয়ই।

অন্ধকারে জ্বল জ্বল করছে আলেকজান্দ্রা প্যালেসের আলো। কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থেকে পামেলা বললো, এখনও আমাদের দেখা হলোনা কেমন করে জ্বালায় ওরা অত আলো।

লণ্ডন থেকে আমরা কেউই পালাচ্ছিনা, পামেলার ঘাড়ে আস্তে একটা হাত রেখে বললো সুকুমার, একদিন প্রাসাদের ভেতর বেড়িয়ে এলেই চলবে পামেলা, এত তাড়াতাড়ি কিসের ?

হেসেলমেয়ার রোড ছেড়ে যাওয়ার দিন এলো একদিন। অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই আর কোন ইংরেজ পরিবারের সন্ধান পাওয়া গেলনা যারা কোন ভারতীয় ছাত্র রাখবে। পামেলা সন্ধান দিল কেনসিংটনের এক ছোট বোর্ডিং হাউসের—একটা ভালো ঘর খালি আছে সেখানে। ভাড়া দু'পাউণ্ড, বিছানা, ঘর পরিষ্কার রোজ ওই ভাড়াতেই করে দেবে ল্যাণ্ডলেডি। আর ল্যাণ্ডলর্ড ল্যাণ্ডল্যাডির নাকি বয়স বেশী নয়। নাম মিঃ ও মিসেস স্টেপ্সন। কেনসিংটনের নামে লাফিয়ে উঠলো সুকুমার। লণ্ডনের নাম করা বনেদি পাড়া ওটা। ডিস্ট্রীক্ট নম্বর ডাবলিউ, আট। কিন্তু ওখানে কোন খাওয়া পাওয়া যাবেনা—শুধু ঘর। তবে ইচ্ছে করলে রান্না করা যায়। ঘরে রান্নার বন্দোবস্ত আছে। রান্নার বন্দোবস্ত মানে গ্যাসের ওপর ছোট একটা রিং।

তাহলে? হতাশ হয়ে সুকুমার বললো, খাওয়া না পাওয়া গেলে কি করে চলবে পামেলা?

নিজে রাঁধবে তুমি।

আমি? হাঁ করে সুকুমার বললো, আমি কেমন করে রাঁধবো?

যেমন করে আমি রাঁধি।

আরে, আমি রান্নার কিছুই জানিনা।

আমি সব শিখিয়ে দেবো।

কিন্তু ব্রেক্‌ফাষ্ট করবো কেমন করে? সকালে বড় তাড়াতাড়ি আমার।

এ বাড়ীতে তুমি যে সময়ের মধ্যে ব্রেকফাষ্ট খাও, তার চেয়ে কম সময়ে তোমার তৈরী করে খাওয়া হয়ে যাবে, বেশী হ্যাঙ্গাম করবার দরকার নেই। দুধ, পরিজ, রুটি, চা, দশ মিনিটের মধ্যে সব তৈরী হয়ে যাবে, সুকুমারের করুন মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললো পামেলা, এই অত ভয় পেওনা, আমি আছি, কিচ্ছু ভাবতে হবেনা তোমায়!

হেসেলমেয়ার রোডের বাড়ী ছাড়তেই হলো অবশেষে। গেটের বাইরে ট্যাক্সির কাছে এসে দাঁড়ালো সকলেই।

মণিকা হেলেনকে জিজ্ঞেস করলো, মা সুকু কাকা কোথায় যাচ্ছে?

নিজের বাড়ীতে।

জন জেদ ধরলো, আমিও যাবো।

মাঝে মাঝে এসো সুকুমার, তার কাছে এসে বললো ক্লোদ।

নিশ্চয়ই, হঠাৎ মনটা বড় বেশী খারাপ হয়ে গেল সুকুমারের।

আর্থার নোয়েল বাড়ী নেই। সুকুমার মারজোরী-হেলেনকে বললো, তার হয়ে তাদের শুভ্‌বাই জানাতে, কথা দিল প্রায়ই তাদের খবর নেবে, নিয়মিত আসবে। জন, মণিকা, চার্লসকে আদর করে সুকুমার ড্রাইভারকে বললো, গ্রষ্টারওয়াক্, কেনসিংটন্ প্লেস।

মারজোরী জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল হেলেনের দিকে, যেন সুকুমারের এই প্রস্থানের জন্যে দায়ী সে। আর মণিকাকে জনের কাছ থেকে যথা সম্ভব দূরে রেখে হেলেন ম্লান হাসছিল।

ট্যাক্সি ষ্টার্ট দিতেই জন কেঁদে উঠলো, আমিও যাবো, সুকুমার!

ছিঃ, জনি কাঁদে না, হেলেনের হাত জোর করে ছাড়িয়ে জনের কাছে ছুটে এসে তাকে চুমু খেয়ে বললো মণিকা, সুকু-কাকা নিজের বাড়ীতে যাচ্ছে—

ট্যাক্সি ছেড়ে দিল।

* * *

বনেদি পাড়া কেনসিংটন। বড় লোকের বাস চতুর্দিকে। তাই ঘর পাওয়া বেশ কঠিন এখানে। এদেশে নাকি লোকে পাড়ার নাম শুনে ধ'রে নেয় সে কোন শ্রেণীর লোক। যাক্, এবার তাহ'লে সুকুমার হলো কেনসিংটনের বাসিন্দা এবং বিশেষ শ্রেণীতেও পড়লো সে। ক্রাউচ্ এণ্ড্ ছিল বড় নির্জন, ট্যাক্সি দেখা যেত খুব কম—মাঝে মাঝে শোনা যেত খুব অল্প প্রাইভেট মোটরের আওয়াজ। আর এ পাড়ার চারদিকে ট্যাক্সির ভীড়—মিনিটে মিনিটে চোখে পড়ে নানা মডেলের মোটর গাড়ী। বাড়ীর কাছেই অনেক বাস্ ষ্টপ্—শহরে গেলে বেগ পেতে হয়না মোটেই। টিউব ষ্টেশনও কাছেই, কয়েক মিনিট হাঁটলেই সেখানে পৌছনো যায়।

টিউব ষ্টেশনের নাম, হাই ষ্ট্রীট কেনসিংটন। ষ্টেশনের সামনেই খুব লম্বা রাস্তা, নাম কেনসিংটন হাই ষ্ট্রীট। জাঁক জমক আছে এই হাই ষ্ট্রীটের। অনেক চায়ের দোকান, অনেক ব্যাঙ্ক, অনেক মদের দোকান, তাছাড়া শাক্ শবজী, জামা কাপড়, খেলনা ওষুধের কত দোকান কে তার হিসেব রাখে!

কেনসিংটন হাই ষ্ট্রীট থেকে বেরিয়েছে কেনসিংটন চার্চ ষ্ট্রীট। হাই

ষ্ট্রীটের ওপর চার্চ ষ্ট্রীটের ঠিক সামনেই জন বার্কারের বিরাট দোকান। সাধারণত এই বার্কারের দোকানে কেনসিংটনের বাসিন্দার ভীড়। এ দোকানে, এপাড়ার লোকে বলে নাকি এক ছাদের তলায় সব পাওয়া যায়—মাছ মাংস দুধ মাখন পনীর ডিম কোট প্যাণ্ট সার্ট গাউন টুপী স্কার্ট, সেণ্ট্ সাবান খেলনা গ্রামফোন্ রেডিও টেলিভিশন। সুকুমারও কেনসিংটনের আদর্শ বাসিন্দার মতো এই বার্কারের দোকানেই র‍্যাশন বই রেজিষ্ট্রী করালো।

কেনসিংটন চার্চ ষ্ট্রীট থেকে বেরিয়েছে ছোট গলি গ্লষ্টার ওয়াক্। ছোট হলেও বেশ ঝকঝকে তকতকে। ডান দিকের সারিতে অনেক পুরোনো বাড়ির আর বাঁ দিকের সব বাড়ীগুলিই নতুন। ভাগ্য ক্রমে সুকুমার ঘর পেয়েছে বাঁ দিকের এক বাড়ীতে।

ছোট ঘর তার, নতুন কার্পেট, চারপাশে নতুনের গন্ধ। ভাড়াটে খুব বেশী নয়—সুকুমারকে নিয়ে পনেরো ষোল জন হবে। দোতালায় সুকুমারের ছোট ঘর। ঘর দেখে খুব খুশী হলো সে। সুন্দর বিছানা, নীল বেড কাভার, ঘরের পর্দাও নীল, দেয়ালে খয়েরী রঙের ওয়াল পেপার। কিন্তু এই ছোট ঘরে রান্না কেমন করে করা সম্ভব হবে সেকথা ভেবে মন খারাপ হয়ে গেল সুকুমারের। এ বাড়ীতেও আছে ছোট উঠোন কিন্তু সেটা শুধু ল্যাণ্ডলেডি মিসেস স্ট্রেসন আর তার স্বামীর জন্যে। ভাড়াটেরা সেখানে যেতে পারে না কারণ তাহলে ওদের ঘরের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। জানলা দিয়ে উঠোনে একটা বড় গাছ স্পষ্ট দেখতে পায় সুকুমার। মাঝে মাঝে রঙ্ বেরঙের পাখী এসে বসে সেখানে। গ্রীষ্মকাল। জানলার কাচ সব সময় তুলে রাখে সে। নামিয়ে দেয় রাত্তিরে শোবার আগে। কখন হুপ করে ঠাণ্ডা পড়ে বলা যায়না।

কয়েক দিন সুকুমার পাড়াটা ভালো করে দেখে বেড়ালো,

রান্নার আয়োজন কিছুই করলো না বাড়ীতে। ব্রেকফাষ্ট খেলো এ, বি, সিতে, সাপার খেল পাম্ গ্রীক রেঁস্তোরায়, ছুটির দিনে লাঞ্চ্ খেলো ক্রাউন হোটেলে। রোদ্দুর থাকলে হাই ষ্ট্রীটের ওপর কেনসিংটন গার্ডেনস্-এ গড়াগড়ি দিতে দিতে ভাবলো এমন করে যে কটা দিন কাটিয়ে দিতে পারা যায়! ওই ঘরে রান্না করা বড় হাঙ্গাম। পামেলাকে বললো, যাক্ না কিছুদিন, অত ব্যস্ত হবার কি আছে! কিন্তু বেশীদিন এমন এড়িয়ে এড়িয়ে বাইরে খেয়ে কাটাতে পারলো না সুকুমার। একদিন দুটো কাগজের ব্যাগে একগাদা জিনিশপত্র নিয়ে ক্লান্ত পামেলা এলো গ্লষ্টার ওয়াকে। ঘরে ঢুকে জিনিশপত্র টেবিলের ওপর রেখে জুতো দূরে ছুঁড়ে ফেলে খাটে শুয়ে হাঁপাতে লাগলে সে।

এত কি জিনিশ পত্র, পামেলা?

চুপ কর—একটু বিশ্রাম করে নি আগে।

চা খাবে?

দাও, মরে যাচ্ছি এক ফোঁটা চায়ের জন্যে।

মাথা চুলকে সুকুমার বললো, মুস্কিল, এখানে যে ছাই কিছুরই বন্দোবস্ত নেই। চলো বাইরে গিয়ে খেয়ে আসি।

হেসে পামেলা বললো, সব বন্দোবস্ত হবে এখানে, দেখনা কি আছে ওই ঠোঙার মধ্যে।

সুকুমার ঠোঙা হাতড়ে দেখে কি নেই তাতে, একেবারে রাজ্যের জিনিশ। দুটো প্লেট, দুটো কাপ—সব দুটো দুটো করে। কাঁটা, চামচ, ছুরী, কাঁচের বোল, এক বোতাল দুধ, একটা টিনের মাছ, চা, চিনি, একটা বড় রুটি, একটা বড় আর একটা ছোট সস প্যান। তাছাড়া আলু, পেঁয়াজ, কড়াইসুটি, কপি, টমাটো আরও নানা রকম তরকারী।

হেসে সুকুমার বললো, একেবারে পাকা গিন্নী! কত খরচ হলো, পামেলা?

জানিনা!

বাঃ, আমার জন্যে তুমি শুধু শুধু এত খরচ—

আমাকে অপমান করোনা, সুকুমার—তোমার জন্যে সামান্য খরচ করবার সামর্থ্য আমার আছে। তুমি খরচ কর না আমার জন্যে?

তুমি যে মেয়ে।

আঃ বাপু, ঝগড়া করতে পারিনা তোমার সংগে, দাওনা এক কাপ চা করে—

কেমন করে করবো?

এঞ্জিনীয়ার বটে তুমি, হাসলো পামেলা, আমি শিখিয়ে দিচ্ছি দাঁড়াও, আগে যাও বাথরুমে, বেশ ভালো করে কেটলিটা ধুয়ে আদ্ধেক জল ভরে আনো।

তাই করে সুকুমার বললো, এনেছি।

এনেছ? আচ্ছা বেশ, এবার ওই যে গ্যাসের ওপর দুটো ছোট দরজার মতো দেখছ ওটা খোল।

রিং বেরুল যে?

বেরিয়েছে, বেরোবেই, এবার গ্যাস্ খোল—খুলেছ, রিঙে আগুন দাও, জ্বলেছে, ব্যাস্, কেটলিটা এবার ওর ওপর বসিয়ে দিয়ে তুমিও চুপ করে বোস—না না বসলে চলবেনা, যাও আবার বাথরুমে, টিপট আর কাপ একটা ধুয়ে আনো—যাবার আগে দুটো খবরের কাগজ মেলে দাও টেবিলের ওপর—খাবার আগে প্রত্যেকবার তাই করবে, নইলে চাদর নোংরা হলে খিটখিট করবে ল্যাণ্ডলেডি।

একটু পরে চায়ে চুমুক দিয়ে সুকুমার বললো, বাঃ বেশ সুন্দর চা হয়েছে তো।

পামেলা গম্ভীর হয়ে শুধু বললো, হবেই। বড় ক্ষিধে পেয়েছে সুকু,

দাও তো কয়েকটা। চকলেট বিস্কিট প্লিজ, দেখ ওই ঠোঙার মধ্যে আছে, তুমিও খাও।

চকলেট বিস্কুটে কামড় দিয়ে সুকুমার বললো, এত জিনিশ রাখবো কোথায়, এই ছোট ঘর—

আঃ দাঁড়াও না, একটু বিশ্রাম করে নি আগে, সব ঠিক করে দিচ্ছি, তারপর রান্না সুরু করবো।

রান্না? আজ থেকে?

হ্যাঁ গো।

না না কাল থেকে, আজ বাইরে খাই চলো?

আর একদিনও তুমি লাঞ্চ্ ছাড়া এক কাপ চা'ও বাইরে খেতে পাবে না। এই কদিন বাইরে খেয়ে কত পয়সা নষ্ট করেছ খেয়াল আছে? রোজ তুমি ওই চেয়ারে বসে পড়াশুনো করবে, আমি এসে তোমার রান্না করে দিয়ে যাবো। খুব ক্ষিধে পেলে আমিও তোমার সংগে খাবো, না হলে বাড়ী গিয়ে—

কিন্তু কেন রোজ রোজ তুমি কষ্ট করবে, প্যাম্? সমাজ-সংসার সকলকে ভুলবে আমার জন্যে?

চোখ বন্ধ করে পামেলা বললো, এর মধ্যেই তো ভুলেছি।

কেন?

তাতো জানিনা, সুকুমার।

সুকুমার আস্তে আস্তে পামেলার কাছে এসে বসে তার একটা হাত কোলে তুলে নিল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পামেলা বললো, সরো রান্না সুরু করি এবার।

একটু পরে পামেলা—

না, তাহলে আর রান্না করাই হবে না আজ, মুচকি হেসে স্কার্ট ঠিক করে পামেলা জুতো পরে নিলো, শোন সুকুমার, ভালো করে দেখে

রাখো সব, ওয়ালড্রবের নীচে একটা ড্রয়ার আছে সেখানে থাকবে এইসব জিনিশপত্র, খবরদার ম্যাণ্টেলপিসের ওপর থালা বাসন রাখবে না, বিশ্রী দেখাবে তাহলে। রাত্তিরের ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না— বেশী হাঙ্গাম করতে যেওনা ব্রেকফাষ্টের জন্যে, দুধ আর পরিজে সারতে চেষ্টা করো। সময় থাকলে বেকন্ টমাটো ডিম ভেজে নিতে পারো মাঝে মাঝে। আগে চায়ের জল করবে সেটা ভিজিয়ে ওসব করো। পনেরো কুড়ি মিনিটের মধ্যে সব হয়ে যাবে। এটা তোমার পরিজ খাবার—সস প্যানে ভাজা ভুজি করবে আর এটাতে মাংস এইসব— বুঝলে ?

হ্যাঁ।

মনে থাকবে ?

সুকুমার মাথা হেলিয়ে জানালো, থাকবে।

কাল থেকে ব্রেকফাষ্ট করা চাই কিন্তু।

বড় কড়া গিন্নী তুমি।

কঠিন স্বরে পামেলা বললো, ফাজলামী রাখো, বল কাল বাড়ী থেকে ব্রেকফাষ্ট খেয়ে বেরোবে ?

না।

আবার না, চললাম তাহলে আমি—

কাল বেরোবো কি, কাল তো রবিবার।

কিন্তু কাল তোমাকে ব্রেকফাষ্ট তৈরী করতেই হবে।

কাল ব্রেকফাষ্ট খাবোই না আমি, একেবারে লাঞ্চ্—

লাঞ্চ্ আমি আজই বেঁধে যাচ্ছি। তাহলে কাল রাত্তিরে তুমি রাঁধবে কারণ আমি রবিবারে আসতে পারবো না, মাসির সংগে কোথায় জানি বেরুতে হবে।

কাল রাত্তিরে আমি নিশ্চয়ই রাঁধবো।

কি রাঁধবে ?

সে কাল ভাববো।

এখুনি বল, পামেলা বললো, আজ র‍্যাশনের মাংস এনেছ ?

ওই যাঃ, বড় ভুল হয়ে গেছে।

দেখ স্বকু, এমন করলে চলবে না।

আর করবো না।

হাসি থামাও—

কান্না পাচ্ছে না যে।

সেকথায় কান না দিয়ে পামেলা বললো, দুটো ডিম নিয়ে এসেছি আমি—সে দুটো তুমি খাবে কাল রাত্তিরে, সংগে আলু কপি বিট গাজর —শুনছো ? আজ আমরা খাবো টিনের মাছ, কড়াইস্বটি আর—আচ্ছা সে পরে দেখা যাবে। কাল সকালে যদি আগে ঘুম ভাঙে আর ক্ষিধে পায় তাহলে এই কর্নফ্লেক্স আর দুধ খাবে, আমি মিসেস্ ষ্ট্রেসনকে বলে দিয়েছি তোমাকে দুধ দেবার কথা। রোজ সকালে দোর গোড়ায় দুধের বোতল পাবে—

তা পাচ্ছি বটে।

এখন দেখ চুপ করে, আমি রান্না স্বরু করছি, তুমি যাও তো এই ভিম্ দিয়ে বাসনগুলো ভাল করে মেজে আনো, একটা পরিষ্কার ন্যাকড়া আছে ? ওগুলো মুছতে হবে আবার —

পরদিন সন্ধ্যায় স্বকুমার সত্যি সত্যি রান্না করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল। টেবিলের ওপর খবরের কাগজ পেতে দুটো ডিম বের করে রেখে বড় সস্ প্যান্ নিয়ে সে বাথরুমে গেল জল ভরতে। বাথরুম বন্ধ ছিল তখন, স্বকুমার সস প্যান্ নিয়ে একটা সিগ্রেট ধরিয়ে অপেক্ষা

করতে লাগলো দরজার কাছে, অন্য কেউ ঢোকবার আগেই সে ধাঁ করে যেন জল ভরে নিতে পারে।

ঠুক্ করে দরজা খোলার শব্দ হল। একটু খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাথরুম্ থেকে বেরিয়ে এলো প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সের এক মহিলা। সুকুমারকে দেখে হেসে বললো, তুমি কে গা বাছা? নতুন বুঝি?

হ্যাঁ?

কত নম্বর ঘর?

এক নম্বর।

দু'পাউণ্ড ভাড়া না? তারপর ফিস ফিস্ করে সুকুমারের কানের কাছে মুখ এনে, ল্যাণ্ডল্যাডির কথা আর বলোনা, বদমাইস মেয়ে মানুষ, যা প্রাণ চায় তাই ভাড়া নেয়—তা হাতে সস প্যান কেন বাছা?

জল ভরবো।

চা খাবে বুঝি?

না ডিম সেদ্ধ করবো।

আর ডিম সেদ্ধ করে না, চল আমার ঘরে, খাওয়াবো তোমায়, বলি হল্যাণ্ডের সসেজ খেয়েছ কখনও?

না, আপনি হল্যাণ্ডের লোক বুঝি?

ছিলুম তো বাছা এককালে, স্বামী হলো ইংরেজ, মারা গেল লোকট পিলেতে ভুগে, সেই থেকে লণ্ডনেই আছি। দু'টি ছেলে—খাসা বাছারা আমার—কিন্তু দু'টিই ভাসে সমুদ্রে—নেভি, বুঝলে? জাহাজ চালায়, তা এখানে দাঁড়িয়ে কি কথা হয় বাছা—চল আমার ঘরে চার তালায়। বাড়ীউলি আবার ওকে ঘর বলে—ও হলো গ্যারেট, চলো না নিজেরা চোখে দেখবে চলো, তা তোমার নামটি কি বাছা?

সুকুমার।

হুঁ হুঁ বাঃ—আমার নাম মিসেস অ্যালেন্ পারমেনটার, মনে থাকবে?

আমি কিছু ভুলি না, মিসেস পারমেনটার?

বলো কি বাছা, ম্যা নে ন জা ই টি সে মরবে যে! চলো চলো—

দৌড়ে সস প্যান্ রেখে আলো নিবিয়ে ঘর বন্ধ করে ফিরে এসে সুকুমার বললো, চলুন।

চার তালায় মিসেস পারমেনটারের এক ফালি ঘর। তার মধ্যেই বুড়ি সব করে, রান্না থেকে কাপড় ইস্তিরি পর্যন্ত। ছোট্ট ওয়ালড্রব, আলাদা ড্রেসিং টেবিল নেই—ছোট একটা টেবিলের ওপর একটি ছোট আয়না শুধু। জিনিশপত্র বিশেষ কিছুই নেই মিসেস পারমেনটারের। এ ঘরের দেয়াল বড় পাতলা—এত পাতলা যে পাশের ঘরে কেউ জোরে নিশ্বাস ফেললে শোনা যায়।

দেখছ? বজ্জাত বাড়ীউলি একে বলে ঘর, সপ্তাহে সপ্তাহে ভাড়া নেয় সাঁইত্রিশ শিলিং ছ'পেন্স—জোচ্চর—যাচ্ছি শীগগিরই আমি রেণ্ট্ কণ্ট্রোলারের কাছে—

মন্দ কি! বেশ তো ঘর।

এ কথায় একটু খুশী হলো যেন মিসেস পারমেনটার, বলছ বাছা? বলি ঠিক তো?

হ্যাঁ হ্যাঁ, বেশ ঘর তোমার!

কিন্তু ভাড়া নেয় সাঁইত্রিশ শিলিং-ছ' পেন্স, বলি কম হলো? ও ভাড়ায় কত ভালো ঘর পাওয়া যায়। একবার ভাবলুম দু' পাউণ্ড দিয়ে তোমার ঘরে যাই কিন্তু ও ঘরের কাছেই টেলিফোন কি-না, দিন রাত্তির ঘণ্টা বাজবে টিনির টিনির—ভাল লাগে না আমার—তা সত্যি বলছ আমার ঘরটা পছন্দ হয়েছে তোমার?

হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি একা লোক, বড় ঘর নিয়ে করবে কি, কথা বলতে জানে বৈকি সুকুমার, এই নির্জনে বেশ শান্তিতে আছো।

ঠিক বলেছ বাছা, তাইতো পড়ে আছি, বুড়ি চেঁচিয়ে উঠলো এবার, সিলভিয়া, ও সিলভিয়া বলি ঘরে আছিস ?

পাশের ঘর থেকে উত্তর এলো, কি বলছ ?

বলি আয় না আমার ঘরে, করছিস কি ? কে এসেছে দেখবি আয়—

কে এসেছে ?

কুকুমার—

সুকুমার,—তাড়াতাড়ি সংশোধন করে সুকুমার হাসলো।

তা তোমার মতো আমার অত স্মরণশক্তি নেই, বলি রাগ করোনা বাছা, হ্যাঁ।

একটু পরে দরজা ধাক্কা দিয়ে ঘরে এলো সিলভিয়া। শরীরে শেষ যৌবনের জৌলুষ। লম্বা স্বাস্থ্যবতী চেহারা, কালো চুল। মুখের চারপাশে বড় পবিত্র ভাব। কানে মুক্তোর টাব,—গলায় নেকলেস। ফিকে সবুজ রঙের গাউন পরে সিগ্রেট হাতে যেন ঘর আলো করে দাঁড়ালো সিলভিয়া। আলাপ করিয়ে দিল মিসেস পারমেনটার, কুমারী সিলভিয়া ড্যানবি, আর তোমার নাম তুমি নিজে বল বাছা, আবার কি বলতে কি বলবো—

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে সুকুমার। বিনীত ভাবে সে বললো নিজের নাম।

হাত বাড়িয়ে দিল সিলভিয়া, হাউ ডু ইউ ডু ?

হাউ ডু ইউ ডু ? নিজের চেয়ারে বসতে বললো সুকুমার কুমারী ড্যানবিকে।

না না তুমি বসো সুকুমার, আমি এখানে—খাটের ওপর মিসেস

পারমেনটারের পাশে বসে ধোঁয়া ছেড়ে মিষ্টি হাসি হাসলো সিলভিয়া।

বলি এই বাছার কাছ থেকে ওই পুচকে ঘরের জন্যে ভাড়া নিচ্ছে দু'পাউণ্ড—তোরা আছিস কোথায় রে? বলি মাগিকে একটু সায়েস্তা কর্—

সে কথায় শুধু একটু হেসে সিলভিয়া সুকুমারকে জিজ্ঞেস করলো, কবে এলে এদেশে?

দু' বছর হয়ে গেছে।

পড়তে এসেছ?

হ্যাঁ।

আর কতদিন লাগবে?

আরও দু'বছর।

অনেক দিন, না? বাড়ীর জন্যে মন খারাপ হয় না?

মাঝে মাঝে হয় বৈকি, মিস্ ড্যানবি।

আমাকে তুমি সিলভিয়া বলে ডেকো আর—একটু থেমে সিলভিয়া বললো, যখন যা দরকার হবে, কোন সঙ্কোচ না করে আমাকে জানিও, সুকুমার?

অনেক ধন্যবাদ সিলভিয়া, নিশ্চয়ই জানাবো।

আমাকেও বলবে বাছা, যখন যা চাই, দরজায় এসে ধাক্কা মারবে—বলি শুনছো? না সিলভিয়ার ঢলোঢলো মুখের দিকে চেয়ে মজে গেলে—

আঃ অ্যালেন্—

বলি থাম্ তুই।

কথাটা ঘুরিয়ে দেবার জন্যে তাড়াতাড়ি বললো সিলভিয়া, চা খাবে সুকুমার?

দাঁড়া না, অত তাড়া কিসের রে? সব করে দেবো আমি। বলি দু'দণ্ড কথা কইবো না বাছার সংগে—বলতে বলতে চায়ের জল বসিয়ে দিয়ে ওলন্দাজ সসেজের টিন কাটতে লাগলো মিসেস পারমেনটার।

তুই কিছু খাবি নাকি রে সিলভিয়া?

কিছু না, শুধু এক কাপ চা—এইমাত্র সাপার খেলাম!

কি খেলি কি?

চীজ পুডিং আর কফি।

পুডিং করেছিলি বুঝি বাড়ীতে?

হ্যাঁ।

কখন যে কি করিস চুপে চুপে তুই, কিছুই বুঝিনা—আছিস বেশ!

মিসেস অ্যালেন পারমেনটারের ঘর থেকে পেট ভরে খেয়ে নিজের ঘরে ইজিচেয়ারে আরাম করে বসে সবে সুকুমার একটা সিগ্রেট ধরাতে যাবে এমন সময় দরজায় শব্দ করে মিঃ ষ্ট্রেসন জানিয়ে গেল, টেলি-ফোন!

টেবিলের ওপরে সিগ্রেট ফেলে বেরিয়ে এলো সুকুমার। তারপর রিসিভার তুলে নিয়ে বললো, হ্যালো?

সুকু? প্যাম্—

কি খবর, প্যাম্? এই রাত্তিরে?

রান্না ক'রে খেয়েছ ঠিক মতো?

না, শোন—

কোন কথা শুনতে চাইনা, আবার বাইরে খেয়েছে তুমি?

আরে না না, নেমন্তন্ন জুটে গেল একটা—

মিথ্যাবাদী, কাল অবধি কিছু ঠিক ছিলনা, অমনি আজ নেমন্তন্ন জুটে গেল, নিশ্চয়ই বাইরে খেয়েছ তুমি—তোমাকে নিয়ে সত্যি আমি আর পারলাম না সুকু—

আঃ প্যাম্, দয়া করে শোন না আগে, স্থকুমার বললো এবার মিসেস পারমেনটারের যত্ন করে খাওয়ানোর গল্প।

আচ্ছা, কাল গিয়ে ভালো করে শুনবো সব—অনেক রাত্তির হয়েছে, সোজা বিছানায় যাও—আর একটাও সিগ্রেট খাবেনা আজ। কাল দেখা হবে, গুডনাইট স্থকু—

গুডনাইট প্যাম্—

মিঃ ষ্ট্রেসনের চেহারা চমৎকার। প্রায় ছ'ফুট লম্বা, মুখে সব সময় হাসি, কথা কিন্তু বলে কম। সপ্তাহে একবার, ভাড়া দিতে ভুল হয়ে গেলে, সন্ধ্যেবেলা স্থকুমারের দরজায় ধাক্কা মেরে হাসিমুখে বলে, ইউর রেণ্ট, প্লিজ ?

লজ্জিত হ'য়ে স্থকুমার বলে, আমি খুব দুঃখিত মিঃ ষ্ট্রেসন, সকালে বড় তাড়াতাড়ি থাকে কি-না, তাই ভুলে গিয়েছিলাম—

কিছু এসে যায়না, তবে সোমবার সকালেই ভাড়া পেলে আমাদের স্থবিধা হয়, হিসেব-পত্র রাখতে হয় কি-না, আমাদেরও খরচ পত্রের ব্যাপার আছে, আমার স্ত্রী সোমবার সকাল বেলা ব্যাঙ্কে যায়, হাসিমুখেই স্থকুমারের কাছ থেকে ভাড়া নিয়ে মিঃ ষ্ট্রেসন্ বেরিয়ে যায়।

মিসেস ষ্ট্রেসন্ মোটা সোটা গোলগাল ছোটখাটো মানুষ। তারই নামে বাড়ী লিজ্ নেয়া হয়েছে। ভাড়াটেদের দেখা শোনা সেই করে। স্বামী কাজ করে পোষ্ট আপিসে। সকাল সাড়ে আটটা থেকে কাজ স্থরু করতে হয় তাকে। কিন্তু ছুটির দিনে বিছানায় গড়িয়ে আরাম করেনা মিঃ ষ্ট্রেসন। স্ত্রীকে বিশ্রাম করতে দিয়ে নিজে বাড়ীর চারপাশ দেখা শোনা করে। কখনও মই নিয়ে সিলিং পরিষ্কার করে, কখনও হাতুড়ী দিয়ে ঠুক্ ঠুক্ শব্দ করে এটা ওটা সারায়। ভাড়াটেদের ফোন্ এলে ছুটে এসে খবর দেয়।

আর একটি লোক আছে তাদের পরিবারে। তার নাম ভিকি। মিসেস ষ্ট্রেসনের বোন। বয়স আঠারো-উনিশ। ভিকি করে এ বাড়ীর ঝিয়ের কাজ। ঝিয়ের খরচ লণ্ডনে বড় বেশী। ঘণ্টায় প্রায় এক টাকা বারো আনা। অত খরচ করে ঝি রাখলে কষ্ট করে লাভ হলো কি মিসেস ষ্ট্রেসনের ?

তাই ভিকি করে ভাড়াটেদের ঘর পরিষ্কার, বিছানা করে দেয়—সমস্ত বাড়ী ঝক্ ঝক্ করে ভিকির অক্লান্ত পরিশ্রমে। অবশ্য সময় থাকলে মিসেস ষ্ট্রেসনও যথাসাধ্য সাহায্য করে তাকে। ষ্ট্রেসন্ পরিবার থাকে এক তালার নিচের তালায়—বেস্‌মেণ্টে। এদের সংগে কিন্তু কিছুতেই ভালো করে ঘনিষ্ঠতা করতে পারলো না সুকুমার। ওপর-ওপর সবাই হাসিমুখে কথা বলে তার সংগে কিন্তু অনেক চেষ্টা করে এক কাপ চা'ও সুকুমার খাওয়াতে পারেনি এদের কাউকে। যখনই সে বলে, আমি চা খাচ্ছি, এসো এক কাপ তুমিও খাও আমার সংগে—

ধন্যবাদ জানিয়ে হেসে ওরা বলে, এই মাত্র খেলাম যে কিংবা মাপ করো ঘরের কাজ নিয়ে বড় ব্যস্ত এখন।

কোন ভাড়াটের সংগেই ঢলাঢলি গলাগলি নেই এদের। ভাড়াটেরাও শুধু এদের দেখা দেয় সপ্তাহে একবার, ভাড়া দেবার সময়।

ভাড়া নিয়ে মিঃ কিংবা মিসেস বলে, কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো মিঃ অমুক কি মিস তমুক ?

অসুবিধা হলে ভাড়াটে নালিশ জানায়। সে কি ? অপরাধীর মতো বলে স্বামী কিংবা স্ত্রী, কাল কি পরশু ঠিক করে দেবো। সত্যি যেমন কথা তেমন কাজ, অসুবিধা দূর করে দেয় তারা।

অসুবিধা না হলে ভাড়াটে বলে, কোন অসুবিধা নেই, ধন্যবাদ। হেসে রসিদ দিয়ে বলে ওরা, অসুবিধা হলেই বলবে কিন্তু।

অর্থাৎ ফেল কড়ি মাখো তেল, তুমি কি আমার পর !

থুড়থুড়ে ইটালিয়ান্ বুড়ি ম্যাডাম্ ম্যাকোরোনি থাকে এক তালায়। বুড়ীর অনেক বয়স হয়েছে—ওপর নিচ করতে পারে না। মিসেস ষ্টেসন্ তার বাজার করে দেয়, মাঝে মাঝে রান্নাও করে দেয় তার জন্যে। হয়তো এই সুবিধার জন্যে কিছু বেশী দিতে হয় ম্যাডাম্ ম্যাকরোনিকে। বুড়ির সংগে আলাপ হয়েছে সুকুমারের।

একদিন সকালে সুকুমার যখন ক্লাশ করবার জন্যে বেরোতে যাবে তখন তাকে ডাকলো ম্যাডাম, একটা উপকার করবে আমার?

নিশ্চয়ই, মুখ থেকে সিগ্রেট নামিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো সুকুমার।

এই দুটো চিঠি বড় জরুরী, দয়া করে পোষ্ট করে দেবে? মিসেস স্টেসনের বাইরে বেরুতে এখনও অনেক দেরী—আর আমার পক্ষে বাইরে বেরুনো একটু মুস্কিল বলেই তোমাকে বিরক্ত করছি।

কিছু বিরক্ত করা নয়, চিঠি দু'টো নিয়ে ম্যাডাম্ ম্যাকোরোনিকে 'গুডমর্ণিং' জানিয়ে সুকুমার বেরিয়ে গেল।

বিকেল বেলা বাড়ী ফিরে দেখে তার ঘরের দরজায় হ্যাণ্ডেলে ঝুলছে একটা ঠোঙা, সংগে একটা ছোট্ট চিঠি।

ইটালীর কিছু খাবার রেখে গেলাম তোমার জন্যে।

ম্যাডাম্ ম্যাকরোনি।

তখুনি নিচে ম্যাডেমের ঘরে এলো সুকুমার। এ ঘরটি বড় ছোট। আর মাছের আঁশটে গন্ধ। ইটালীর লোকেরা বাঙালীর মতো মাছের ভক্ত নাকি!

অনেক ধন্যবাদ ম্যাডাম তোমার খাবারের জন্যে।

তুমি খেতে ভালোবাসো কিনা জানিনা, নতুন পার্সেল পেলাম দেশ থেকে, বোসো বোসো, চা খাবে?

ধন্যবাদ, আমার এক বন্ধুর জন্যে অপেক্ষা করছি, ছটার সময় সে এলে দু'জনে ওপরেই চা খাবো।

একদিন এসে চা খেও কিন্তু আমার সংগে, অবশ্য যদি তাতে তোমার কাজের ক্ষতি না-হয়—

নিশ্চয়ই খাবো, ক্ষতি হবে কেন, ম্যাডাম!

তুমি ভারতবর্ষের লোক না?

হ্যাঁ।

খুশী হয়ে ম্যাডাম বললো, ম্যাডাম মণ্টেশারী তো তোমাদের দেশে বেড়াতে গিয়েছিলেন?

কার নাম করলে, ম্যাডাম?

ওমা, চোখ প্রায় কপালে তুলে বুড়ি বললো, ম্যাডাম মণ্টেশারীর নাম শোননি তুমি? শিশু মনস্তত্ত্বের অত বই লিখেছেন—

ও মণ্টেশারী—খুব নাম শুনেছি—

আমারও কয়েকটা বই আছে শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে—পড়বে?

নিশ্চয়ই।

বুড়ি সুকুমারকে দিলো দু'টো বই, তার নিজের লেখা। তারপর যেন একটু লজ্জিত হয়ে বললো, তোমার হয়তো ভাল লাগবে না এ বই, যতদিন খুশি রাখো, কোন তাড়া নেই।

আমি পড়েই আমার মতামত জানাবো, দরজার বাইরে পা বাড়িয়ে সুকুমার বললো, শিশু শিক্ষার বই আমাদের প্রত্যেকের খুব পড়া দরকার—শিশুরাই তো পৃথিবীর ভবিষ্যৎ।

ম্যাডাম ম্যাকোরোনির চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, সেই জন্যেই তো বই দুটো লিখে ফেললাম আমি—শিশুদের শিক্ষার বন্দোবস্ত এখনও বড় খারাপ—ম্যাডাম্ মণ্টেশারীর কাছে পৃথিবীর যে কত ঋণ তার সীমা নেই, কথা বলতে বলতে বুড়ি বোধ হয় শিশুদের ভবিষ্যতের কথাই ভাবছিল।

এক তালায় সবশুদ্ধ তিনখানি ঘর। তার দু'খানি ঘর নিয়ে থাকে কুমার—বম্বের ছেলে। বিজনেস্ অ্যাডমিনস্ট্রেশন পড়ে। সুকুমারের সংগে বেশ ভাব হয়ে গেছে তার। সুকুমারকে খুব ভালো লেগেছে কুমারের। সুন্দর চেহারা, লম্বা চওড়া আর গায়ে দামী স্যুট্—পুরো সাহেব কুমার। কিন্তু সুকুমারের সংগে সে কথা বলে তার নিজস্ব বাংলায় আর সুকুমারও উত্তর দেয় তার সৃষ্টি করা হিন্দিতে। ভাগ্যিস লণ্ডন—পুলিশ দুটো ভাষার কোনটাই জানে না, তা না হলে এদের দু'জনকে ওই দুই ভাষাকে নির্মমভাবে হত্যা করবার জন্যে ফাঁসি যেতে হতো। আর একটা গুণ আছে কুমারের—ভালো গান গাইতে পারে। বন্ধু-বান্ধব তার বড় একটা নেই, আপন মনে গ্রামোফনে হিন্দী গান বাজায় আর দামী দামী স্যুটের অর্ডার দেয়। দেশ থেকে এয়ার মেলে তার মণ্ডা-মিঠাইএর পার্সেল আসে। পয়সা আছে অনেক তার। কুমারের সংগে আলাপ হবার পর পামেলা বলেছিল, এতদিন পর তোমার একজন ভালো ভারতীয় বন্ধুর সংগে আলাপ হলো।

আমার চেয়েও ভালো ?

তোমার মতো অত বুদ্ধিমান নয় যদিও—

প্রেমে পড়ে গেলে নাকি ?

হেসে পামেলা বললো, প্রায়, হিংসে হচ্ছে বুঝি ?

খুব জোরে হেসে সুকুমার বললো, আমার পর যদি আর কাউকে সহ্য করতে পারো তো দেখ চেষ্টা করে—

অহঙ্কারী !

খুব সকালে বাড়ীর অন্যান্য ভাড়াটেদের ঘুম ভাঙবার আগে সুকুমার বাথরুমে গিয়ে মুখ ধুয়ে দাড়ি কামিয়ে নেয়, তারপর কেটলীতে জল ভরে নিচে নেমে আসে। ব্রেকফাষ্ট খেয়ে তৈরী হয়ে নিতে তার আধ ঘণ্টার বেশী দেরী হয় না। সময় থাকলে সুকুমার সিগ্রেট ধরিয়ে

টাইম্‌স্ পত্রিকা পড়ে কিছুক্ষণ, আর দেরী হয়ে গেলে ছুটতে ছুটতে ওট হাতে নিয়ে বাঁ দিকে ফর্ণটন্ ষ্ট্রীট ধরে এসে পড়ে কেনসিংটন হাই ষ্ট্রীটের ওপর। সেখান থেকে ৭৩ নং বাস্ নিয়ে নামে ইউষ্টন্ ষ্টেশনের কাছে। সেখান থেকে ফ্যারাডে হাউসে সাধারণত হেঁটেই আসে সুকুমার—মিনিট কয়েকের পথ।

সেদিন সুকুমারের সময় ছিল না। একটু আগে ব্রেকফাষ্ট খাওয়া হয়ে গেছে আজ। সবে টাইম্‌স্ পত্রিকায় মন দিতে যাবে এমন সময় ঘরে বসেই সুকুমার শুনতে পেল বাথরুমের দরজায় কে যেন প্রচণ্ড ধাক্কা দিচ্ছে। পরমুহূর্তেই খ্যানখ্যানে গলায় চীৎকার করে উঠলো মিসেস পারমেনটার, বলি বাথরুমে কে গা? বেরোও না শীগগির, আর কতক্ষণ লাগাবে বাপু। আবার দুড়ুম দাড়াম্ দরজায় ধাক্কা।

বাথরুমের দরজা খোলবার শব্দ শুনতে পেল এবার সুকুমার। আর বেশ আস্তে কথা বললো, ম্যাডাম্ ম্যাকরোণী, অমন করে দরজায় ধাক্কা মারা তোমার উচিত নয়।

ও তুমি, তা না হলে এতক্ষণ আর কে লাগাবে?

মাত্র মিনিট পাঁচেক হ'লো আমি বাথরুমে গেছি।

কি বল্লে? মিনিট পাঁচেক? উঃ, বললেই হ'লো? আমি দাঁড়িয়ে আছি এই বাথরুমের দরজায় প্রায় আধ ঘণ্টা।

তোমার অসুবিধা হলে আমার সংগে ঝগড়া না করে মিসেস ষ্ট্রেসনকে তো বললে পারো।

মিসেস ষ্ট্রেসনের নামে জ্বলে উঠলো পারমেনটার, বলি উপদেশ দেয়া হচ্ছে? তোমার অসুবিধা হলে তুমি বলো না যে তোমার জন্যে একটা আলাদা বাথরুম করে দেবে। এখানে এই এক ঘণ্টা লাগিয়ে অন্য ভাড়াটাদের কষ্ট দেয়ার মানে কি? যাও না লেক্ ডিষ্ট্রিক্টে, অনেক জল সেখানে—

আমার সংগে অমন করে কথা বলো না, মিসেস পারমেনটার—

কেন? তুমি মন্টেশারীর বন্ধু বলে? বলি বুড়ো বয়সে আর শিশু শিক্ষার বই লিখে কি হবে? সব জানি আমি। নিজের মেয়েকেই তো খুব শিক্ষা দিতে পেরেছো! রাখতে পারলে ঘরে তাকে?—জয়ের উল্লাসে বেশ জোরে হেসে উঠলো মিসেস পারমেনটার। সে নিশ্চিত জানে সে এরপর ম্যাডেম ম্যাকরোণীর আর কিছু বলবার নেই। সত্যি আর কিছু বললোও না সে। সুকুমার শুনলো তার ভারী পায়ের শব্দ। ম্যাডাম ম্যাকোরোণী নিচে নেমে যাচ্ছে।

এই দেখ, আবার মিসেস পারমেনটারের গলা, এই ফাঁকে আবার কে বাথরুমে ঢুকে বসে আছে, বলি—

কিন্তু এইবার সুকুমারের বেরোবার সময় হয়।

সুকুমারের ঘরের দরজা ভেজানো। রান্নার লোভনীয় গন্ধে ঘর ভরে গেছে। ষ্টেক মিট রিঙের ওপর চাপিয়ে পামেলা গেছে বাসন ধুতে বাথরুমে। সুকুমার খাতা খুলে মন দিয়ে করছে শক্ত অঙ্ক। এমন সময় ঘরে এলো মিসেস পারমেনটার, কি ব্যস্ত নাকি কুকু—সরি, সুকুমার? বাঃ বেশ গন্ধ বেরিয়েছে তো—কি রান্না করছো?

জানিনা তো, বোসো মিসেস পারমেনটার।

জানানো, বল কি, রান্না করছো অথচ—এমন সময় একগাদা বাসন-পত্র নিয়ে ঘরে ঢুকলো পামেলা।

আমি না, হেসে সুকুমার বললো, রান্না করছে ও।

এটি আবার কে? মিসেস পারমেনটার যেন গিলতে লাগলো পামেলাকে।

আমার বন্ধু পামেলা হুইট—আর মিসেস পারমেনটার।

পামেলা স্থইট, কি জাত বাছা তুমি ?

ইংরেজ।

চেহারাটি বেশ মা তোমার, তাই বুঝি স্থকুমার,—হি হি হি, খুব ভাগ্যবান তুমি স্থকুমার—তা বলি ওহে পামেলা, কোথায় আলাপ হ'লো তোমার স্থকুমারের সংগে ?

এক সোশ্যালে, মিসেস পারমেনটারের প্রশ্নে একটু অবাক হয়ে বললো পামেলা।

তারপরই প্রেম বুঝি ? বিয়ে করবে বুঝি তোমরা ?

মনে তো হয়, হাসলো স্থকুমার ।

একেও নিয়ে যাবে ভারতবর্ষে ?

তাই তো ঠিক করেছি !

বাঃ, কি মিষ্টি মুখখানি তোমার বাছা পামেলা—

বাধা দিয়ে পামেলা বললো, কিছু খাবেন ?

না না না, এইমাত্র খেলাম আমি—তা' স্থকুমার, সকালে বাথরুমের ঝগড়া কেমন শুনলে বলো ? স্থকুমারকে কিছু বলবার অবকাশ না দিয়ে মিসেস পারমেনটার বলে গেল, রোজ সকালে ঠিক আমি যখন আসি ওই ইটালিয়ান মেয়েমানুষটারও তখন আসা চাই বাথরুমে—আর বাড়ীউলিও হয়েছে যেমন, ষোলটি ভাড়াটে অথচ বাথরুম মোটে একটি—খোঁড়া মানুষ আমি, চারতালা থেকে নেমে এসে অতক্ষণ বাথরুমের সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে রাগ হওয়া খুবই স্বভাবিক—তুমি কি বলো, স্থকুমার ?

তাতো ঠিক, আস্তে বললো স্থকুমার।

ইটালিয়ান মেয়েমানুষ কি অভদ্রের মতো তর্ক করলো আমার সংগে শুনলে তো তুমি, যেন সব দোষ আমার—নাঃ, এমন হলে তো আর এ বাড়ীতে বেশীদিন থাকা যাবে না, বাড়ীউলি খুঁজে খুঁজে ভাড়াটেও জোটায় বটে !

মিসেস পারমেনটার আর উঠতে চায় না। সুরু করলো আরও অনেকের শ্রাদ্ধ। পামেলা অবাক হয়ে শুধু তার মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

আর একবার পামেলা বললো, সত্যি আপনি কিছু খাবেন না? রান্না হয়ে গেছে, আমরা খাবো এবার—

না না, তোমরা খাও, আমি বসে আছি।

সুকুমার হাসলো মনে মনে। পামেলার ইংগীত বুঝলো না মিসেস পারমেনটার। সে উঠলো পামেলা চলে যাওয়ার পরে।

এ বাড়ীতে যে কটি ঘর সুকুমার দেখেছে তার মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর করে সাজানো ঘর হলো কুমারী সিলভিয়া ড্যানবির। ছোট লম্বা টেবিলের ওপর যীশুর ছবি, জ্বলছে মিটমিট ক'রে মোমবাতি—ঘরে অনেক রঙ্-বেরঙের ফুল। ঘরের কোথাও এতটুকু ময়লা নেই। জিনিশপত্র অনেক সিলভিয়ার। তিন চারটি স্যুটকেশ, দু'টো গ্রামফোন, একটা রেডিও, একটা রেডিওগ্রাম। ম্যাণ্টেলপিসের ওপর একই লোকের নানা ভংগীতে অনেক ছবি। ঘরে মধ্যে যেন মন্দির-মন্দির ভাব। চারপাশে তাকিয়ে বড়ো ভালো লাগলো সুকুমারের।

অনেকদিন থেকেই ভাবছি তোমার সংগে দেখা করতে আসবো সিলভিয়া কিন্তু সব সময় ভয় হয় পাছে তোমাকে বিরক্ত করি—

যখন খুশি এসো তুমি সুকুমার, সন্ধ্যেবেলা সাধারণত কিছুই কাজ থাকে না আমার, রেডিও খুলে সেলাই করি শুধু।

মিসেস পারমেনটার কোথায় আজ?

হেসে সিলভিয়া বললো ঘর খুঁজতে গেছে, ভালোই হয়েছে সুকুমার, একটু জোরে হেসে বললো সে, ও থাকলে কি তোমার সংগে কথা বলতে পারতাম।

সুকুমারও হাসলো, এত জিনিশপত্র তোমার !

বড় অসুবিধা হয় আমার ওগুলো নিয়ে। আমি তো ঘুরে বেড়াই বেশী, জন্ম যদিও আমার ইংলণ্ডে কিন্তু দিন কেটেছে ফ্রান্স আর জার্মানীতে বেশী, এই বড়দিনের সময় পাড়ি দেব ভিয়েনায়—

বেড়াতে যাবে বুঝি ?

ঠিক বেড়াতে নয়, একটু থেমে ম্যাণ্টেলপিসের ওপর রাখা ছবিগুলির দিকে তাকিয়ে সিলভিয়া বললো, ওকে দেখতে যাবো, সেখানে হাসপাতালে আছে ও।

উনি কে ?

আমার বন্ধু, জার্মান, ওর নাম হর্ষ্ট হেনি। অষ্ট্রিয়ায় কাজ করছিল ভালো কিন্তু হঠাৎ বাঁ পায়ে হল প্যারালিসিস্ সারবার আশা নেই সুকুমার। আমাদের কপাল বড় খারাপ—

সত্যি খুব দুঃখের কথা সিলভিয়া, সুকুমার কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো হর্ষ্ট হেনির ছবির দিকে।

কিছুদিনের মধ্যে সুকুমারের সংগে সিলভিয়া ড্যানবির বেশ ভাব হয়ে গেল। ফাঁক পেলেই ওরা দু'জনে আসতে লাগলো দু'জনের ঘরে —বসে বসে অনেকক্ষণ করতে লাগলো নানা গল্প। পামেলাকে দেখে খুব খুশী হ'লো সিলভিয়া আর তাকেও বড় ভালো লাগলো পামেলার। সুকুমার নিজের সব কথা বললো সিলভিয়াকে এবং পরিবর্তে শুনলো তার সব কথা—সিলভিয়া ড্যানবির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। শোনবার মতো বটে সিলভিয়ার জীবনের ইতিহাস।

বিয়ে হয়ে গিয়েছিল তার সতেরো বছর বয়সে রাশিয়ার এক ভদ্রলোকের সংগে হামবুর্গে। সে বিয়ে যেমনি নোংরা তেমনি ভয়ঙ্কর। ছেলে বয়সে বাবা মারা যায় ড্যানবির—হ্যমবুর্গে কাষ্টমস্‌এ কাজ করতেন তিনি। বাপ খুব ভালবাসতো তাকে। মা কিন্তু কোনদিনই বেশী

ভালবাসতে পারেনি সিলভিয়াকে। বাবা বেঁচে থাকতেই মঁসিয়ে শলকভ নামে এক রাশিয়ান ভদ্রলোকের যাতায়াত ছিল বাড়ীতে। অমন অদ্ভুত লোক জীবনে দেখেনি সিলভিয়া। বয়স তার বছর চল্লিশ হবে, আর কী বুদ্ধিমান লোক! পৃথিবীর এমন কোন বিষয় নেই যে-বিষয়ে সে কথা বলতে জানেনা। বাবা কিন্তু বিশেষ পছন্দ করতো না শলকভকে। বলতো, ও ব্যবসায়ী বটে কিন্তু ওর ব্যবসা সৎ নয়। আর ওকে নিয়ে মার সংগে বাবার প্রায়ই ঝগড়া হতো। এমন কি একদিন মা বাবাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিল যে ওকে বিয়ে করবে। কিন্তু কোথা থেকে কি যে হয়ে গেল—বাবা হঠাৎ গেল মারা। মা বিয়ে করলো না শলকভকে—আমাকে বললো, তুই ওকে বিয়ে কর সিলভিয়া, ও তোকেও ভালবাসে খুব। শলকভকে সিলভিয়ারও খুব ভালো লাগতো, তাই বিয়ে করতে সে আপত্তি করলো না। খুব শীগগিরই বিয়ে হয়ে গেল তার মঁসিয়ে শলকভের সংগে।

কিন্তু বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই শলকভের রূপ গেল বদলে। অমানুষিক অত্যাচার সুরু করলো সিলভিয়ার ওপর, অকথ্য ভাষায় তার মাকে গালাগাল দিতে লাগলো। তবু মুখ বুজে, একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে মনে করে তার সংগে চার বছর কাটালো সিলভিয়া, আর মার ওপর ঘৃণায় তার মন ভরে গেল। মা তো এর কথা সবই জানতো —বোধ হয় তাই নিজে বিয়ে না করে মেয়েকে ইচ্ছে করে সঁপে দিলো এই দস্যুর হাতে। কারণ তাকে একেবারে নিরাশ করবার ক্ষমতা ছিল না মার।

চার বছর কেটে গেল। আর সহ্য করতে পারলো না সিলভিয়া। তার স্বামীর এক জার্মান সহকারী, যার ছবি আছে ম্যাণ্টেলপিসে, হর্ষ্ট হেনির সাহায্যে সিলভিয়া পালালো এবং আনলো বিচ্ছেদের মামলা। বড় বেগ পেতে হয়েছিল বিচ্ছেদ আনতে, অত বড় ধূর্ত লোকের

সংগে গোলমাল করা সোজা নয়। শলকভ নাকি হেনিকে খুন করবে বলে শাসিয়েছিল। তার উত্তরে হেনি বলেছিল, মেয়েমানুষের ওপর যে অত্যাচার করে তাকে গুলি করতে আমি সঙ্কোচ বোধ করি, শুধু মাথায় বন্দুকের বাড়ি মেরে অজ্ঞান করে দিতে পারি।

তাই তো অত ভালো লাগে সিলভিয়ার হেনিকে। মা'র খবর কিছু জানেনা সিলভিয়া। রাখতেও চায় না। তবে সে বোধ হয় এখন লণ্ডনেই। একদিন গ্লষ্টার রোডের ওপর তাকে দেখতে পেয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল সিলভিয়া। অতীতের এই জঘন্য করুণ ইতিহাস ভুলে যেতে চায় সে; তাই আবার নাম নিয়েছে কুমারী সিলভিয়া ড্যানবি।

কিন্তু কী করুণ আমার জীবন সুকুমার, সিগ্রেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলে সিলভিয়া, হেনির শেষ অবধি হ'লো কি না প্যারালিসিস্।

বম্বে থেকে এয়ার মেলে আসা দেয়ালীর মোয়ায় কামড় দিতে দিতে সুকুমার কুমারের সংগে গল্প করছিল। কুমার এইমাত্র গোটা তিন হিন্দি ফিল্মের গান শেষ করে সিগ্রেট ধরিয়েছে।

মিঠাই কেমন লাগছে, বাবু?

বহুৎ আচ্ছা, আউর হ্যায় নাকি?

হাঁ হাঁ লিন না যতো খুশী, মোয়ার টিন সাগ্রহে এগিয়ে দিল কুমার।

দু'চার পামেলাকা নিয়ে রাখ্‌নে মাংতা।

সব টিন রাখতে পারে, হামার ভাল লাগে না এ মিঠাই, একটু থেমে সিগ্রেটে একটা টান মেরে, আপনার বোন্ধু খুব ভালো আছে।

তুমরা বন্ধু-টন্ধু নেই হ্যায়?

আরে কই বাবু, দু' চার ছিল, শুধু খানাপিনা করতে চায়, হামি সব ভাগা দিছি, আভি সাধু ব'নে গেছি—অত পইসা ছোকরী লিয়ে

খরচ নেহি করবে —তা বাবু চলিয়ে আজ হামি তুমাদের খিলাবে দিল্লী দরবারে।

বহুৎ সুক্রিয়া, কুমার।

পামেলা যাবে, তুমি ভি যাবে, হামি লিয়ে যাবে।

বাঃ বাঃ, সুকুমার আবও কয়েকটা মোয়া শেষ করলো।

এমন সময় দরজায় ধাক্কা শুনে দরজা খুললো কুমার। হ্যালো পামেলা, কাম্ ইন্—

গুড ইভিনিং কুমার, আমার বন্ধু জ্যাকলীন ট্রেভার্স—

জ্যাকলীনের নাম শুনে উঠে দাঁড়ালো সুকুমার। পামেলা আলাপ করিয়ে দিল। ওকে এতদিনে এই প্রথম দেখলো সুকুমার।

হেসে পামেলা বললো, তোমাকে খুব আশ্চর্য করে দিলাম না, সুকু?

আরে, দেখা কি পাওয়া যায় জ্যাকলীনের, আজ হঠাৎ টিউবে দেখা হয়ে গেল তাই ধরে নিয়ে এলাম ওকে।

বেশ করেছ, হেসে জিজ্ঞেস করলো সুকুমার, তোমার বেড়াল ফিগারো কেমন আছে জ্যাকলীন?

ভালো, তুমি ওর কথা জানলে কেমন করে?

আমি সব জানি। কুমার বেরিয়ে যেতে চাচ্ছিল, তাকে বাধা দিয়ে সুকুমার বললো, আরে যাতা কাহে? বৈঠো বাৎ-উৎ করো, বলেই সে জ্যাকলীন আর পামেলার সামনে ধরলো মোয়ার টিন, খাও, কুমার দিয়েছে, আমাদের দিশি খাবার।

দু' এক কামড় দিয়ে ওরা এক সংগে বললো, হাউ লাভলি!

সেই রাত্রেই কুমার সকলকে খাওয়ালো দিল্লী দরবারে। হ্যাম্পস্টেড্ রোডের ওপর ভালো ভারতীয় রেষ্টুরেণ্ট এই দিল্লী দরবার। আর তারপর থেকে শোনা গেল কুমারের মুখে শুধু এক গান, ওগো বধূ সুন্দরী –

ক্লোদের সংগে আর মাত্র একদিন সুকুমারের দেখা হয়েছিল। এক রাত্তিরে ফোন করেছিল ক্লোদ। খুব শীগগিরই সে ফ্রান্সে ফিরে যাবে। ইংলণ্ডের মেয়াদ ফুরিয়েছে তার, তাই যাবার আগে সুকুমারের সংগে সে দেখা করতে চায়। পরদিন সুকুমার চা খেতে বললো তাকে। ঠিক সাড়ে পাঁচটায় এসেছিল সে।

কথা দিলেই তো কথা রাখা যায় না। সুকুমার বলেছিল নিয়মিত দেখা করবে, ওদের খোঁজ নেবে, কিন্তু সময় হলো না আজও তার। তবু অভিযোগ জানালো না ক্লোদ। হাসিমুখে সুকুমারকে সকলের সব খবর দিল। নতুন বাড়ীতে ভালোই আছে তারা, দিনে দিনে বেড়ে উঠছে মণিকা, হেলেনের শরীর খুব ভালো যাচ্ছে না, উরসুলার অবস্থা আরও খারাপ, হেসেলমেয়ার রোডের বাড়ী বিক্রী হয়ে গেছে। আর্থার আরও ভালো চাকরী নিয়ে চলে গেছে ম্যাঞ্চেষ্টার।

আমি চলে গেলে তুমি আমার ঘরে হেলেন-নোয়েলের সংগে থাকবে, সুকুমার?

সুকুমার কোন উত্তর দিতে পারলো না। অনেকক্ষণ ভাবলো তারপর ক্লোদের দিকে তাকিয়ে বললো, আর অতদূরে যাবো না ক্লোদ, পাড়াটা বড় দূরে, নয় কি?

তা বটে।

ঠিক এক ঘণ্টা পর ক্লোদ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, পামেলার সংগে তো আজ আর দেখা হলো না—

ও আসবে সাড়ে সাতটায়, আর একটু বসবে না, ক্লোদ?

না সুকুমার, অনেক কাজ সারতে হবে আমাকে, আমি যাবার আগে ফোন করে ওর সংগে দেখা করবো, সুকুমারের মুখের দিকে তাকিয়ে এক মিনিট ক্লোদ চুপ করে রইলো। তারপর খুব আস্তে আস্তে বললো, একটা অনুরোধ সুকুমার, প্যারিস না গিয়ে দেশে ফিরো না, ফ্রান্সকে একটু জেনে যাও—

আমি যাবার আগে প্যারিস যাবার খুব চেষ্টা করবো, ক্লোদ।

এই রইলো আমার ঠিকানা, যদি যাও তাহ'লে আবার দেখা হবে, তা না হলে তোমার সংগে এই শেষ দেখা—

যদি কোনদিন প্যারিসে যাই, তোমার সংগে দেখা না করে ফিরবো না।

ক্লোদ চলে গেল।

হঠাৎ একটা কাজ পড়ে গেল সুকুমারের ইণ্ডিয়া হাউসে। সে ভাবলো, যাক ভালোই হ'লো, অনেকদিন যাওয়া হয়না ওখানে, আজ যখন যেতেই হবে, তখন সস্তায় দিশি খাওয়া নেহাৎ মন্দ লাগবে না।

লাঞ্চের সময় ফ্যারাডে হাউস থেকে বেরিয়ে সুকুমার পা বাড়ালো ইণ্ডিয় হাউসের দিকে।

আজকাল রীতিমতো ভীড় হয় ইণ্ডিয়া হাউস ক্যানটিনে। প্রত্যেক জাহাজে আসছে ভারতীয় ছাত্র। লম্বা কিউ-এ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে পড়ে সুকুমার এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলো। মশলা দেয়া নানা তরকারীর উৎকট গন্ধ নাকে এসে লাগছে।

অনেকদিন আগে, সুকুমার যখন প্রথম আসে তখন সেই গ্রীণ কাফেতে মিঃ বিজন ঘোষ বলেছিল যে তার মুখ দেখেই তারা বুঝে নিয়েছে যে সুকুমার নতুন এসেছে। সে তাই শুনে খুব রেগে গিয়েছিল মনে মনে। আজ কিন্তু সেকথা মনে করে হাসি পেল তার। এই কিউ-এ যে সমস্ত ভারতীয় ছাত্র দাঁড়িয়ে আছে, সুকুমার সত্যিই তাদের মুখ দেখেই বলে দিতে পারে কে নতুন এসেছে। তাদের মুখে এই নতুনের ছাপ একেবারে স্পষ্ট।

খাবার নিয়ে একটা ফাঁকা টেবিলে বসে পড়লো সুকুমার। একটু পরে আরও দু'জন এসে বসলে তার পাশে।

একজন সুকুমারকে দেখেই প্রশ্ন করলো, কি স্যার চিনতে পারছেন ?

ঠিক বুঝতে পারছি না—

তা মনে রাখবার কথা নয়, আমরা নগন্য ব্যক্তি।

হঠাৎ সুকুমারের মনে পড়লো, সুবিকাশের বাড়ীতে দেখা এ সেই বাচাল ছোকরা, ও হ্যাঁ মনে পড়েছে, সুবিকাশ বাবুর কি খবর ?

চোখ বড় করে বললো পাশের ছেলেটি, তিনি তো কয়েকমাস আগে দেশে ফিরে গেছেন।

সে কি এর মধ্যে ? অবাক হয়ে সুকুমার জিজ্ঞেস করলো।

হ্যাঁ স্যার, বাচাল ছোকরা বললো, বিয়ে থা করে এসে তিনি—মানে হেঁ হেঁ, আপনাদের মত সংগী সাবুদ জোটাতে পারেন নি, তাই কি রকম তার যেন—কি বলে মেণ্টাল ডিপ্রেশন্ হয়—

মেণ্টাল ডিপ্রেশন ?

হ্যাঁ স্যার, কবে যেন সুবিকাশ গেল হে অতুল ?

খরগোসের হাড় কড়মড় করে চিবোতে চিবোতে অতুল বললো, দিন ক্ষণ বলতে পারলাম না, স্যার্।

আর একজন এলো সেই টেবিলে। এদের চেনা লোক। এসেই বললো, কি হে অতুল, আরে মুরলী যে!

এসো তিনকড়ি, তুমিও খরগোসের কারি নিয়েছ দেখছি।

কি আর করবো, শালার মনের মতো খাওয়া পাওয়া যায় পোড়ার এদেশে! সুক্তো বড়া, মাছের কালিয়া, মুড়ি ঘণ্ট, আহাহা কতদিন যে খাইনি, তিনকড়ির জিব্ দিয়ে জল পড়তে লাগলো, পালাতে পারলে বাঁচি, এ হতচ্ছাড়া দেশে ভদ্রলোক আসে, কিচ্ছু জানে না বেটারা, না জানে রান্না, না জানে লোকের সংগে মিশতে।

তাহ'লে সব জেনে শুনে এদেশে এলেন কেন ? খুব আস্তে আস্তে গম্ভীর হয়ে বললো সুকুমার।

সংগে সংগে উত্তর দিল তিনকড়ি, জানলে কোন শালা আসতো—আর ঠাণ্ডা বাপরে বাপ্—দেশ নাকি মশাই ?

একথাটাও আপনি জানতেন না যে বিলেতে খুব ঠাণ্ডা পড়ে ?

তা জানতাম বটে তবে এতবড় হতচ্ছাড়া দেশ সেকথা আগে ভাবতে পারিনি।

ভেবেছিলেন এখানে ইটগুলোও সোনা দিয়ে মোড়া হবে ?

এবার খাওয়া থামিয়ে সুকুমারের দিকে তাকিয়ে তিনকড়ি বললো, আপনি কে মশাই ?

বাচাল ছোকরা মুরলী বললো, উনি চাএব।

অতুল জিজ্ঞেস করলো, তা চাএব বাবু, এদেশে কি সোনা-দানা-মণি-মুক্তো পেলেন আপনি ?

হ্যাঁ, তিনকড়ি সুর করে বললো, এখন বলুন শুনি—

হঠাৎ সুকুমারের যেন খুন চেপে গেল। সাধারণত সে তর্ক করে না। আজ হঠাৎ ঠিক করলো তর্ক করে এদের শায়েস্তা করতেই হবে।

সে বললো, সোনা-দানা মণি-মুক্তো না পেলেও কিছু একটা পাবেন আশা করেই তো আপনারা এদেশে এসেছেন ?

না স্যার্, আমরা এসেছি পড়াশুনো করতে—

হেসে উঠে সুকুমার বললো, বিলিতি ডিগ্রি দেখিয়ে ভবিষ্যতে সোনা-দানা-মণি-মুক্তোর বন্দোবস্ত করতে—তাহলে কিছু পেতেই এসেছেন। দেশের ডিগ্রি নিয়ে সন্তুষ্ট রইলেন না কেন ?

ওরা তিনজন দু'চার মিনিট কথা বললো না। চুপ করে খেতে লাগলো। একটু পরে অতুল বললো, বেশ মশাই, এ বেটারা আমাদের দাবিয়ে রেখেছিল বলেই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির চেয়ে এদের ডিগ্রির দাম বেশী কিন্তু তাই বলে নিজেদের সব কিছু জলাঞ্জলি দিয়ে এদের পা চাটতে হবে ?

কখনও নয়, তবু যখন এসেছেন কষ্ট করে, এদেশ সম্বন্ধে লোকের সংগে মিশে একটু জেনে নিলে ক্ষতি কি ?

ও বেটারা আমাদের দেশে আমাদের সংগে মিশে কিছু জেনেছে কি ?

প্রথম কথা ওরা ডিগ্রি নিতে যায়নি, ওরা গিয়েছিল শাসন করতে, দ্বিতীয় কথা, মিশেছে বৈকি, কারণ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বহু বইয়ের লেখক ইংরেজ।

বাচাল ছোকরা বললো, তবু এরা মেশামেশি পছন্দ করেনা, ধামা ধরে আত্মীয়তা করা আমার দ্বারা হবে না।

গুণ যদি থাকে মশাই, সুকুমার বেশ দৃঢ়স্বরে বললো, ওরাই আপনার ধামা ধরবে—রবীন্দ্রনাথকে পৃথিবীর সামনে ইংলণ্ডই প্রথম হাজির করেছে।

তা থেকে যাননা এদেশে, দেখুন আপনাকেও যদি এরা পৃথিবীর সামনে হাজির করে।

গুণ থাকলে করবে বৈকি, কিন্তু কারুর সংগে মেশবার ক্ষমতা না রেখে এদেশে শুধু আপন মনে বকর বকর করে যারা তারাই দেশে গিয়ে বাঁদর সাহেব হয় আর যারা সত্যি গ্রহণ করে তারাই হয় এই দুই দেশের সংস্কৃতির আদান প্রদানের অগ্রদূত। ভারতবর্ষের প্রায় সব নেতাই বিলেৎ-ফেরৎ আর এদেশে তারা যতদিন ছিলেন, ততদিন খরগোসের হাড় চিবিয়ে এদের শ্রাদ্ধ করেননি, এদের কাছ থেকে নিয়েছেন, দিয়েছেন, শিখেছেন, শিখিয়েছেন—

ওরে বাব্বা, তিনকড়ি হাঁ করলো, খাসা বলেন তো, একেবারে বাক্য-বাগীশ তর্কালঙ্কার বিদ্যাবিনোদ বাচস্পতি—

আহাহা, অতুল বললো, উনি মিশেছেন, দেখেছেন, শুনেছেন—

নিশ্চয়ই, সুকুমার বাধা দিল অতুলকে, আমি যত লোকের সংগে

এদেশে মিশেছি আপনারা তা কল্পনাও করতে পারবেন না, আর একটা কথা জেনে রাখুন, ইচ্ছে করলেই আলাপের সুযোগ হয় না—

বাধা দিল বাচাল ছোকরা, তা যাক্‌গে, বলি ডগ্ শো দেখেছেন তো এ বছর অলিম্পিয়ায় ?

অবাক হয়ে সুকুমার বললো, হ্যাঁ।

কেমন লাগলো, স্যার্ ?

খুব ভালো।

লাগবেই, মুচকি হেসে বাচাল ছোকরা বললো, যে দেশের মেয়ে ভালোবাসা যায় সে-দেশের কুত্তা তো ভালো লাগবেই স্যার্, আপনার কথাই আলাদা !

ম্যাডাম্ ম্যাকরোণীর লেখা বই দু'টো হাতে করে সুকুমার একতালায় এলো ফেরৎ দিতে। ম্যাডাম্ তখন মাছ সেদ্ধ করছে। ঘরে মাছের গন্ধ উদ্দাম হয়ে উঠেছে। বই দু'টো সুকুমার নেড়ে চেড়ে দেখেছে বটে কিন্তু পড়া সম্ভব হয়নি।

ম্যাডাম্ ম্যাকরোণীর সামনে দাঁড়িয়ে সে বললো, চমৎকার বই ম্যাডাম্, আমার খুব ভালো লেগেছে।

ধন্যবাদ, খুশী হয়ে ম্যাডাম্ বললো, শীগগিরই যাবো হল্যাণ্ডে, শিশুদের বিষয় নিয়ে বিরাট সভা হবে সেখানে, আমি নেমন্তন্ন পেয়েছি—আর ফিরবো না এখানে।

হ্যাঁ, আপনি এতো ভালো লেখেন, ভালো করে চর্চা করলে আরও কতো লিখতে পারবেন।

ঠিক বলেছ সুকুমার, সেই জন্যেই তো যাচ্ছি, তারপর যাবো ইটালী।

ইটালীর কোথায় আপনার বাড়ী ?

ফ্লরেন্স্, স্বর্গ একেবারে, পার তো ঘুরে এসো।

চেষ্টা করবো, যাবার তো খুব ইচ্ছে আছে, ম্যাডাম্।

আগে ফ্লরেন্স্ যেও কিন্তু, রোম ভেনিস মিলান নেপল্স্ যেও পরে—জানো সুকুমার ইটালীর লোকদের বড় প্রাদেশিকতার দোষ, রোমের লেখক সব সময় লিখবে রোমকে নিয়ে, ফ্লরেন্সের লেখক ফ্লরেন্সের কথা ছাড়া বলবে না।

এইবার সুকুমার বললো, কিন্তু আপনার বই-এ সে দোষ একেবারেই নেই ম্যাডাম, আপনি একেবারে পৃথিবীর শিশুদের কথা লিখেছেন।

খু খু ক'রে বুড়ীর সে কী হাসি!

হঠাৎ হাসি থামিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বুড়ী বল্লো, আচ্ছা সুকুমার, মিসেস পারমেনটারের সংগে তোমার আলাপ হয়েছে?

হ্যাঁ হ্যাঁ।

ওর সংগে তুমি আমার বইএর কথা কিছু আলোচনা করো না বুঝলে?

না না—

কারণ ও এসব কিছু বোঝে-টোঝে না। তোমাকে একথা বললাম বলে কিছু মনে করলে না তো?

একেবারেই না ম্যাডাম, কলিংবেল্ শুনে, ম্যাডাম্ ম্যাকরোণীকে শুভ রাত্রি জানিয়ে পামেলা এসেছে ভেবে সুকুমার দরজা খুললো। কিন্তু পামেলা নয়—তার সামনে দাঁড়িয়ে এক পুলিশ। আবার পুলিশ! পিটারের কথা মনে ক'রে চমকে উঠলো সুকুমার। এ আবার কাকে ধরে নিয়ে যাবে কে জানে। পুলিশ 'গুড ইভনিং' ব'লে মুচকি হেসে সোজা ভেতরে ঢুকলো। তারপর গম্ভীর হয়ে গট্‌গট্ করে নেমে গেল বেসমেন্টে—মিঃ স্ট্রেসনদের ঘরে। সুকুমার বেশ ঘাবড়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। বোধহয় সাংঘাতিক অপরাধ ওদের কারুর,

তাই পুলিশ খবর না দিয়ে হঠাৎ গিয়ে গ্রেপ্তার করতে চায়। সুকুমার ছুটে গেল চার তালায়—সিলভিয়া ড্যানবির কাছে। মিসেস পারমেনটার তখন জল ভরবে বলে সবে ঘরের বাইরে পা বাড়িয়েছে।

সুকুমারকে দেখতে পেয়ে বললো, এত হাঁপাতে হাঁপাতে কার কাছে এলে বাছা? সিলভিয়ার কাছে নিশ্চয়ই।

মিসেস পারমেনটার—পুলিশ—

পুলিশ! বল কি বাছা?

এইমাত্র একটা পুলিশ কাকে জানি গ্রেপ্তার করতে গেল মিসেস ষ্টেসনদের ঘরে।

বেশ হয়েছে, জোচ্চোর বাড়ীউলি, করেছে হয়তো সাংঘাতিক কিছু, কিন্তু কি করে আমরা খবর পাই বলতো বাছা? তা তুমি যাওনা সোজা বেসমেণ্টে নেমে?

আমার সংগে যে ভালো আলাপ নেই, যাওয়া কি ঠিক হবে?

আর আমার সংগে তো আদায়-কাঁচকলায়, দাড়াও দেখি কি করতে পারি, আমি আবার খোঁড়া মানুষ, নাহ'লে হয়তো নিজেই চলে যেতাম—ও সিলভিয়া—সিলভিয়া—

কি বলছো অ্যালেন?

বলি করছিস কি, বাড়ীতে যে পুলিশ এসেছে।

তোমাকে ধরতে নাকি?

আরে থাম্, বলি রসিকতা হচ্ছে আমার সংগে? আমাকে ধরতে কেন, তোদের বাড়ীউলি মাগিকে হাজতে নিয়ে যেতে—কাঁহাতক আর জোচ্চুরীর ব্যবসা চালাবে—ভগবান আছে তো—

সিলভিয়া বাইরে এসে বললো, বেচারী!

বলি সহানুভূতি দেখানো হচ্ছে? যা না সিলভিয়া, দেখে আয় না—লক্ষ্মী মেয়ে তুই—

বল কি অ্যালেন, আমি কেমন করে যাবো ?

যা বাছা যা, আর আমরা পুরোণো ভাড়াটে, বাড়ীতে বিপদ-আপদ হলে খোঁজ খবর নেয়ার দরকার তো, এক রকম ধাক্কা মেরে সিলভিয়াকে ঠেলে নিচে নামিয়ে দিল মিসেস পারমেনটার।

একটু পরেই হাসতে হাসতে ফিরে এলো সিলভিয়া।

কিরে, হাসছিস কেন অত ? আরে বলনা কাকে ধরলে ? স্বামীকে ? স্ত্রীকে ? না দুজনকেই ?

হাসতে হাসতেই বললো সিলভিয়া, কি যে লজ্জায় ফেললে আমাকে তুমি ! বেস্‌মেণ্টে নেমে দরজা ধাক্কা দেবার অবসর পেলাম না—দরজা খোলাই ছিল, দেখি পুলিশ ভিকিকে জড়িয়ে ধরে বসে আছে। আরে এ পুলিশটা তো রোজই প্রায় আসে—এ হ'লো ভিকির ফিঁয়াসে।

অ্যাঁ, আশায় বাজ পড়লো মিসেস পারমেনটারের। ভেবেছিল ওদের ধরে নিয়ে যাবে আর হাড় জুড়োবে তার। তা না পুলিশ হ'লো প্রিয়তম।

কুমারের আজকাল আর দেখাই পায় না সুকুমার। তার ঘর থেকে আজকাল আর গ্রামফোনের আওয়াজ আসে না—গানও শোনা যায় না। কখন কোথায় থাকে কুমার কিছুই খবর রাখেনা সুকুমার। হিন্দি চর্চাটা আর তেমন হচ্ছে না মনে করে ও একটু দুঃখ পেল মনে মনে।

সুকুমার যেদিন যা-খুশী হয় তাই ধরে। কোনদিন টিউব, কোনদিন বাস্। অনেক সময় তাড়াতাড়ি থাকলে হবোর্ণ থেকে সে ধরে সেণ্ট্রাল লাইনের ট্রেন। এসে নামে নটিং হিল্ গেট টিউব ষ্টেশনে। একটু এগিয়ে কেনসিংটন্ চার্চ ষ্ট্রীট। সুকুমার প্লষ্টার ওয়াক অবধি হেঁটে আসে।

একদিন ট্রেনে বসে সুকুমার বেশ একটু অবাক হলো। কুইনস্ ওয়েতে ট্রেন্ থেমেছিল। প্ল্যাটফর্মে তাকিয়ে সুকুমার দেখে জ্যাক্লীন আর কুমার হাত ধরাধরি করে চলেছে। দু'জনের ঘাড়ে ঝুলছে স্কেটিং বুট। তারপর আরও দু' একদিন ওদের এই কেনসিংটন্ পাড়ায় দেখেছে সুকুমার। তাকে কিন্তু ওরা দেখতে পায়নি একদিনও। যাক্, ভারী ভালো লাগলো সুকুমারের, কুমার এতদিন পর মনের মতো সংগী পেয়েছে ভেবে। বড় একা একা কাটছিল বেচারীর। তাই বোধহয় তার বুক-ভাঙা গানের দাপট একটু কমেছে। পামেলা হয় তো খবরটা জানে না এখনো—ওরা দু'জনেই একটু চাপা প্রকৃতির লোক। খুশী হবে নিশ্চয়ই পামেলা।

একদিন কুমারকে হাতে হাতে ধরলো সুকুমার। ফ্যারাডে হাউস থেকে ফিরে সে সবে দরজায় চাবি ঘুরোতে যাবে ঠিক এমনি সময় দরজা খুলে বেরুলো কুমার আর জ্যাকলীন। ওরা দু'জনেই সুকুমারকে দেখে একটু অপ্রস্তুত হ'লো যেন।

হ্যালো জ্যাক্লীন, কুমারের দিকে তাকিয়ে হেসে সুকুমার বললো, কেয়া বাবা, ডুবকে ডুবকে পানি খাতা? আজ তো বাবা হাত মে হাত মে পাকড় লিয়া—

আরে বাবু, রুমালে নাক মুছে কুমার তাড়াতাড়ি বললো, হামি সব বলবে তুমাকে—এখনও সময় হয় নাই আর এখন হামি বড়া মুস্কিলে আছে—

উতো দেখনেই পাতা হ্যায়, তুম্ বাবা বাস্তু ঘুঘু। আচ্ছা যাও আভি যাঁহা যাতা, আটকাকে তুমরা সময় নষ্ট নেই করে গা—বাই বাই—

জ্যাকলীন বললো, চিয়ারিও সুকুমার, গিভ্ মাই লাভ টু প্যাম্।

থ্যাঙ্ক্ ইউ জ্যাকলীন!

* * *

প্রায় প্রত্যেক মাসেই টাকা পয়সা নিয়ে সুকুমারের আজকাল বেশ অসুবিধা হয়। ঠিক সময় তার টাকা এসে পৌছয় না। মার কথা বুঝতে পারে সুকুমার। সংসারের নানা অভাব-অভিযোগের মধ্যে দিয়ে ঠিক সময় নিয়মিত হয় তো টাকা পাঠানো তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু এদেশে টাকা আসতে দেরী হলে কি যে অসুবিধা হয় সেকথা মা'কে কিছুতেই বোঝাতে পারে না সে। টাকা পয়সা সম্বন্ধে কিছু লিখলেই আজকাল তিনি রেগে যান—যেন বিলেতে এসে সে মস্ত বড় একটা অপরাধ করেছে। যখন আর্থারদের বাড়ীতে ছিল তখন এত ভাবনা হ'তো না সুকুমারের—ওখানে দেরী হ'লে ক্ষতি হ'তো না, কেউ ভাড়া চাইতো না তার কাছে—যেন সঙ্কুচিত হয়ে নোয়েল টাকা নিত সুকুমারের কাছ থেকে। গ্লষ্টার ওয়াকে ওসব হবার উপায় নেই—একদিন দেরী হলেই মিঃ স্ট্রেসন্ দরজায় ধাক্কা মেরে বিনীত ভাবে হাসে আর সে-সময় ভাড়া দিতে না পারার চেয়ে বেশী লজ্জা বোধহয় ভারতীয়র পক্ষে আর কিছু এদেশে হতে পারে না।

ক'দিন থেকে অবস্থা বড় খারাপ হয়েছে সুকুমারের। হাতে এত কম পয়সা যে রাস্তায় পা বাড়াবার উপায় নেই। ক্লাশে যাওয়া বন্ধ করেছে সে—বাড়ীতেই আধ পেটা লাঞ্চ্ খেয়ে পড়ে থাকে—সিগ্রেট দিনে দু'টো তিনটের বেশী খায় না। পড়াশুনোয় মন দেয়া একেবারেই সম্ভব হয় না। সে জানে ধীরে সুস্থে নানা রকম লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে মা যথাসময়ে চিঠি লিখবেন। কিন্তু এমন হলে, মানে টাকার ধান্দায় মাথা ঘামালে পড়াশুনো কেমন করে করবে সুকুমার। ভাবনায় অস্থির হয়ে পড়ে সে।

হাতে এত কম পয়সা যে আজ র্যাশন্ আনতে সাহস হ'লো না সুকুমারের। আলু আছে কিছু, রুটিও আছে একটা, পেঁয়াজ ভাজা আর আলু সেদ্ধ দিয়ে সে রাত্তিরটা চালিয়ে দেবে ভাবলো। একটা

সুবিধা যে পামেলা আজ আসবে না—মাথা ঘষা আর কাপড় কাচার ব্যাপার আছে আজ তার বাড়ীতে। পামেলার সামনে এই দীন অবস্থা প্রকাশ হয়ে পড়লে হয়েছিল আর কি—মানসম্ভ্রম সব যেত, লজ্জার সীমা থাকতো না সুকুমারের। ক্ষিধেয় মাথার মধ্যে বন্ বন্ করতে লাগলো তার। তাড়াতাড়ি সে রান্নার জোগাড় করতে লাগলো।

কিন্তু রান্না করতে গিয়ে তার মাথা গেল আরও ঘুরে। আলু আর পেঁয়াজ এত কম যে তার পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নয়। আর ক্ষিধে যা পেয়েছে শুধু রুটি মাখন খেয়ে কিছুতেই কাটাতে পারবে না সে।

সিলভিয়া অথবা মিসেস পারমেনটারের কাছ থেকে কিছু ধার করে আনা যায় বটে কিন্তু এ অবস্থায় সুকুমার সেকথা আজ ভাবতে পারলো না। তাদের সামনে যেতেই লজ্জা করতে লাগলো তার। এ যেন ভিক্ষে করতে যাওয়া—তার মুখ দেখেই তারা যেন তার অবস্থা ধরে ফেলবে। কুমারকেও এসব কথা কিছুতেই বলতে পারবে না সে। হঠাৎ তার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো পামেলার ওপর। কি দরকার ছিল এমন ভাবে বাড়ীতে রান্না-বাড়া করবার! এখন সে পড়শুনো করবে না গিন্নী-বান্নির মতো ঘর-সংসার দেখে চাল ডাল তেল নুনের হিসেব রাখবে। ক্ষিধের চোটে রাগে পামেলাকে ফোন করলো কে।

আমি আর রান্না করতে পারবো না।

হঠাৎ কি হ'লো তোমার ?

ক্ষিধেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে—

তবে খাও, অত সসেজ রেখে এলাম আমি কাল।

সেগুলো লাঞ্চে খেয়েছি।

লাঞ্চে ? লাঞ্চ্ বাড়ীতে খেয়েছ নাকি ?

সুকুমার নিজের ভুল বুঝতে পারলো, পামেলা জানেনা যে সে পয়সার অভাবে কয়েক দিন ধরে ক্লাশে যাচ্ছে না।

হ্যাঁ, আজ একটা ক্লাশ করে বাড়ী চলে এসেছিলাম—

কেন?

পরে বলবো, এখন কি খাবো আমি?

রুটি মাখন চীজ্—

ওতে কিছু হবে না আমার, ভীষণ ক্ষিধে পেয়েছে—

ওয়াড্রবের নিচের ড্রয়ারে একটা ডিম আছে।

নেই, আমি ভেঙে ফেলেছি ওটা।

হেসে পামেলা বললো, দুষ্টু ছেলের মতো ব্যবহার করছ তুমি—তাহলে, একটু থেমে পামেলা বললো, আজ বাইরে খাও—খুব খুশী হলে তো এবার?

না, গম্ভীর গলায় উত্তর দিল সুকুমার, আমার বাড়ীর বাইরে বেরুতে ইচ্ছে করছে না আজ।

তোমার কি হয়েছে সুকু? এত রাগ কেন? অসুখ করেনি তো?

না না না—আমি কিচ্ছু খাবনা আজ।

লক্ষীটি আজ বাইরে খাও—আমি কাল গিয়ে সব ঠিক করে দেবো।

কিন্তু বাড়ীতে এই রান্নার পাট আমি তুলে দেব।

তা না হয় দিও, হেসে পামেলা বললো, বড় বদ মেজাজী তুমি, একদিন যাইনি বলে এত রাগ—আর কোনদিনও তোমাকে রান্না করতে হবেনা—যেদিন যেতে পারবো না তার আগের দিন রান্না করে রেখে আসবো তোমার—

সে-রাত্তিরে কিন্তু সুকুমারকে সত্যি আধ-পেটা খেয়ে থাকতে হলো। ক্ষিধের জ্বালায় অনেকক্ষণ সে ঘুমুতে পারেনি। পরদিন সকালে খেল একটু দুধ আর এক কাপ চা—আজও টাকা এলো না তার। লাঞ্চে খেল সে দুটো আলু সেদ্ধ আর দু'টুকরো রুটি। বিকেলে শুধু এক

কাপ চা, রুটিও ফুরিয়ে গেছে আজ। এখন কেমন করে চালাবে সুকুমার। রোজই টাকার আশায় বসে থেকে সে হতাশ হয়। এ রকম করে কতদিন চলাতে হয় কে জানে। মাথা দপ্ দপ্ করে সুকুমারের। আর ভাবতে পারেনা সে।

অন্ধকার হবার একটু পরেই একটা প্রকাণ্ড কাগজের ব্যাগে অনেক জিনিশ-পত্র নিয়ে পামেলা এলো।

এই নাও, হেসে বললো সে, এখন সাত দিন আমি না এলেও কোন ভাবনা নেই তোমার—যত খেতে পারো খাও, এখন বলো আগে কি খেলে কাল?

পামেলাকে দেখে সব ভাবনা দূর হয়ে গেল সুকুমারের। সেও হেসে বললো, বাইরে খেলাম—

ওই জন্যেই তোমার অত রাগ হচ্ছিল কাল—খালি পয়সা নষ্ট কববার ছুতো—

পরীক্ষা আমাব শীগগিরই, রান্না বাসন মাজা নিয়ে মাথা ঘামালে পডবো কখন?

আহা, রান্না তো আমিই করি বাপু, কে বলেছে তোমাকে ওসব নিয়ে মাথা ঘামাতে? ছেলেদের কাজ নয় ওটা—বিশেষ করে তোমার মতো ছোট্ট ছেলের, পামেলা সুকুমারের কাছে এসে আদর করতে লাগলো তাকে। তোমার চেহারা আজ এত খারাপ দেখাচ্ছে কেন সুকু? একটু কাহিল হয়ে পড়েছ যেন?

কাল অনেক রাত্তির অবধি পড়েছিলাম কি-না, ভালো ঘুম হয়নি।

রাত্তির জেগে পড়ার কি দরকার তোমার? এক দিনেই মনে হচ্ছে তোমার ওজন কমে গেছে।

ও কিছু নয়, আজ অনেক রান্না কর প্যাম, ভয়ানক ক্ষিধে পেয়েছে।

আগে বলনি কেন? দাঁড়াও এখুনি খেতে দিচ্ছি তোমায়, পামেলা

রান্নার জোগাড় করতে ব্যস্ত হলো। আর সেই মুহূর্তেই দরজায় বেশ জোরে শব্দ হলো, ঠক্ ঠক্ ঠক্। পামেলা দরজা খুলতেই সুকুমারের নাম করে দেখা করতে চাইলো মিঃ ষ্ট্রেসন্।

গুড্ ইভনিং মিঃ ষ্ট্রেসন্, দরজার কাছে এসে বললো সুকুমার।

সেকথার উত্তর না দিয়ে ষ্ট্রেসন্ গম্ভীর গলায় বললো, ভাড়া দাও?

খুব বেশী লজ্জা পেল সুকুমার, আজ?

এখুনি।

আমি বাড়ী থেকে এখনও টাকা পাইনি মিঃ ষ্ট্রেসন্, পেলেই—

দেখ তোমার মতো আরও দু'একজন ভাড়াটে আমাদের আগে ছিল কিন্তু তাদের এ বাড়ী ছাড়তে হয়েছে—

খুব আস্তে আস্তে বললো সুকুমার, আমি বুঝতে পারছি কিন্তু—

এই সব কারণের জন্যে, আর একটু জোরে বললো ষ্ট্রেসন্, আমরা বিদেশী ভাড়াটে নিতে চাই না—

এইবার পামেলা এসে দাঁড়ালো দু'জনের মাঝখানে, ক'সপ্তাহের ভাড়া বাকি পড়েছে?

সোমবার ওর ভাড়া দেবার কথা, আজ শুক্রবার—

তুমি কি ইংরেজ মিঃ ষ্ট্রেসন্? দু'পাউণ্ড ব্যাগ থেকে বের করে পামেলা তার হাতে দিয়ে বললো, প্রায় এক বছর হতে চললো ওর এ বাড়ীতে, তোমরা খুব ভালো করে জান যে ভাড়া মেরে দেবার লোক ও নয়—

টাকা হাতে পেয়ে হেসে ষ্ট্রেসন্, বললো, আমি খুব দুঃখিত কিন্তু প্রায় ও এ রকম করে কি-না—

ইচ্ছে করে করে না, আর ভবিষ্যতে কিছু বলবার হলে লিখে ওর টেবিলে রেখে যাবে, ইংরেজ হয়ে অতিথির সামনে এ রকম চেঁচামেচি

করবে না—তাহলে ভবিষ্যতে ও তোমাকে ভাড়া না দিয়ে রেণ্ট্ কণ্ট্রোলারের অফিসে গিয়ে ভাড়া দেবে।

ধন্যবাদ জানিয়ে মাথা নিচু করে মিঃ ষ্ট্রেসন্ পালিয়ে গেল। সুকুমারও বসে রইলো মাথা নিচু করে অনেকক্ষণ। মার ওপর রাগে তার চোখ ঠেলে জল বেরিয়ে আসতে চাইছে। পামেলার মুখের দিকে মাথা তুলে সে তাকাতে পারলো না।

সুকু ?

কি ?

তোমার ওপর আমি আজ সত্যি রাগ করেছি।

কেন প্যাম্ ?

তোমার এই টাকার টানাটানির কথা আমাকে বলনি কেন ?

কেমন করে বলবো ?

চমৎকার, সুকু আমি কি তোমার কেউ নই ?

সুকুমার উত্তর দিলো না।

আর, আবার বললো পামেলা, তোমার বাড়ীওলার মতো অভদ্র ইংরেজ আমি এর আগে কখনও দেখিনি।

ওর কি দোষ ? স্বাভাবিক গলায় বললো সুকুমার, সব বাড়ীওলাই এমন করে—ওকে ব্যবসা চালাতে হবে তো।

কিন্তু এ বাড়ীতে তোমাকে আর বেশীদিন থাকতে দেবনা, তোমার জন্যে আর একটা ঘর দেখতে হচ্ছে।

না না প্যাম্, এখানেই বেশ আছি।

কিন্তু এই অভদ্র বাড়ীওলা ? ইংরেজ সম্বন্ধে কি ধারণা হবে তোমার সুকু ?

হেসে সুকুমার বললো, ভয় পেওনা প্যাম্, একটা বাড়ীওলাকে দেখে নিশ্চয় রাতারাতি তোমাদের জাতের ওপর আমার ধারণা বদলে যাবেনা,

আর, একটু থেমে সুকুমার বললো, ইংরেজ দুজনেই, বাড়ীওলা আর ভাড়া যে চুকিয়ে দিল সেও, আরও একটা কথা প্যাম্, আমাদের দেশে এর চেয়েও খারাপ বাড়ীওলা আছে—

তোমার হলো কি সুকু? হঠাৎ অবাক হয়ে পামেলা বললো, একটাও সিগ্রেট খাচ্ছনা যে আজ?

একথার পর আর কিছুই লুকিয়ে রাখতে পারলো না সুকুমার। সমস্ত কথা খুলে বললো পামেলাকে—এমন কি কাল রাত্তিরে যে ভাল করে খাওয়া হয়নি সেকথাও।

ছি ছি ছি সুকু, অথচ তুমি আমাকে বলনি, চোখ ছলছল করে উঠলো পামেলার।

বললে কি করতে পারতে তুমি?

তোমাকে টাকা দিতে পারতাম সুকু।

তোমার যে তাতে অসুবিধা হতো।

কিছু অসুবিধা হতোনা, আমার জন্যে সংসার—খরচের টাকা মাসিকে দিয়েও আমার হাতে টাকা থাকে, আর পোষ্ট আপিসে কিছু টাকা জমিয়েছি আমি।

কিন্তু তোমার কাছ থেকে আমার টাকা নেয়া একেবারেই ঠিক নয় প্যাম্—

তা নেবে কেন? অভিমানে পামেলা বললো, তার চেয়ে উপোস করা ভাল না?

আমার ওপর রাগ করোনা প্যাম্, সত্যি আমার এখন টাকার ভাবনায় মাথার ঠিক নেই।

পামেলা বললো, আজ আর পাউণ্ড দুয়েক আছে আমার কাছে, সেগুলো রাখো তুমি, আর কত টাকা চাই তোমার বল? কাল দিয়ে যাবো।

আমার টাকা হয় তো কাল এসে পড়তে পারে—

সেকথা যেন শুনতে পায়নি এমন ভাবে পামেলা বললো, পাঁচ পাউণ্ড দিলে হবে?

হ্যাঁ।

ঠিক করে বল?

খুব হবে পামেলা।

আর একটা কথা দাও আমাকে সুকু?

কি প্যাম্?

আজ থেকে কোন কিছু তুমি আমার কাছে লুকোবে না—যদি তুমি আমাকে আর ভাল না বাস, সেকথাও না?

সুকুমার এ কথার উত্তরে টেনে টেনে শুধু বললো, তোমাকে ভালবাসবো না আমি! কি বলছ প্যাম্?

উত্তর দাও, বল কিছু লুকোবে না?

তাই হবে প্যাম্।

তারপর অনেকক্ষণ বসে বসে নানা গল্প করলো ওরা দু'জন। ভবিষ্যতের কত কল্পনা। কথা যেন ফুরোতে চায় না। তাই রান্না খাওয়া সারতে আজ বেশ দেরী হয়ে গেল। প্রায় রাত এগারোটা। বাসন ধুয়ে সমস্ত সাজিয়ে রেখে বিছানায় এলিয়ে পড়ে পামেলা বললো, আমি বড় ক্লান্ত সুকু।

খুব স্বাভাবিক, যা পরিশ্রম করছ তুমি আমার জন্যে, সাহস করে হঠাৎ সুকুমার বললো, থেকে যাওনা আজ এখানে?

বাড়ী যেতে ইচ্ছে করছে না মোটে আর মাসিও নেই, এক বন্ধুর বাড়ী গেছে দিন দু'য়েকের জন্যে।

এত সৌভাগ্য আশা করেনি সুকুমার, থেকে যাও প্যাম্, এত রাত্তিরে আর বাড়ী যায় না।

বেশ, কিন্তু তোমাকে ওই চেয়ারে ঘুমতে হবে—পারবে ?

সে দেখা যাবে এখন—

না, ওখানে ঘুমতেই হবে।

টাকা দেবার বেলা আমি তোমার বড় আপনার আর শোবার বেলা পর পুরুষ—কী প্রেম তোমার!

তর্কে তোমার সংগে কোনদিনও আমি পারি না বাপু, হেসে পামেলা বললো, তোমার যা খুশী তাই করো। আজ তোমাকে আমার বড ভালো লাগছে সুকুমার—একটু মায়াও হচ্ছে—

এমন মায়া রোজ রোজ হলে তো বেঁচে যাই !

কিন্তু এখন অনেকক্ষণ তোমাকে ব'সে থাকতে হবে ওই চেয়ারে—আমি যখন ডাকবো তখন এসো।

আমি এই মুহূর্ত থেকে শুধু তোমার ডাকের অধীর প্রতীক্ষা করবো প্যাম্ কিন্তু দেখ যেন ডাকের আগে রাত ভোর না হ'য়ে যায়—

হ'তে পারে! সুকু আমাকে তোমার বাড়ীর গল্প বল। মণ্টু ঘুনু ওরাও কি তোমার মতো দেখতে ?

একেবারেই না, কিন্তু তার আগে তোমার বাবার কথা বল প্যাম্, কেন তুমি তাকে ভালবাস না ?

চোখ বন্ধ করে পামেলা বললো বাবা মা'কে বেশী ভালবাসতো না বলে, প্রায়ই তাদের ঝগড়া হতো, আর এই ঝগড়ার মধ্যেই আমি বেড়ে উঠেছি, আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস ক'রোনা সুকু—ওসব কথা মনে হলে রাগে দুঃখে আমার মন বড় খারাপ হয়ে যায়—

মাপ করো প্যাম্, ওকথা আর কোনদিনও তুলবো না, কথা ঘুরিয়ে সুকুমার বললো, কিন্তু তুমি কি পরে শোবে ?

তোমার কিছু নেই ?

খুব ভালো জিনিশ দেবো, একেবারে খাঁটী দিশি, স্যুটকেস হাতড়ে

সুকুমার বের করলো একটা শাদা পাংজামা আর একটা সিল্কের পাঞ্জাবী। পামেলার গায়ের ওপর ছুঁড়ে ফেলে বললো, নাও।

বাঃ, ধন্যবাদ সুকু, পরেই সে হঠাৎ খিল্ খিল্ করে হেসে উঠে বললো, তোমাদের দেশী পোষাকে তোমাকে স্কটিশ মনে হয়েছিল আমার—

তাই নাকি?

শোনা গেল দরজায় ধাক্কা আর মিসেস পারমেনটারের কণ্ঠস্বর, সুকুমার ঘরে আছো বাছা?

লাফ দিয়ে উঠে বসলো পামেলা আর শাদা হয়ে গেল সুকুমারের মুখ। সে শুধু বললো, সর্বনাশ!

খট খট খট খট—

এর মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লে? তোমার গলা পেলাম যেন এখুনি—

দরজা খুলে সুকুমার বললো, কি ব্যাপার মিসেস পারমেনটার, এত রাত্রে?

আরে বাছা একটা মজার খবর দিতে এলাম তোমায়, একি পামেলা এখনও আছো?

হ্যাঁ আজ একটু দেরী হয়ে গেল—

কোথায় থাকো?

ব্ল্যাকহীথে।

ও বাবা, সে তো অনেকদূর—বাড়ী পৌছতে রাত্তির হয়ে যাবে যে? সুকুমার বললো, ট্যাক্সি নিয়ে নেবে একটা।

ট্যাক্সি নিয়ে ওইটুকু মেয়ে রাত্তির দুটোয় বাড়ী গিয়ে পৌছবে—তোমাদের যেমন কাণ্ড, ও থাকবে আজ আমার কাছে—চলো বাছা গল্প করি তোমার সংগে শুয়ে শুয়ে—

না না, সুকুমার বললো, বাড়ী ওকে যেতেই হবে মিসেস পারমেনটার—

এখন বাড়ী গেলে কত রাত্তিরে পৌঁছবে খেয়াল আছে? বলি ও কি নাইট ক্লাবের গাইয়ে যে রাত দুপুরে বাড়ী ফিরবে? চলো বাছা, বাড়ীতে ফোন করে দাও—

আপনি যান, আস্তে আস্তে পামেলা বললো, আমি একটু পরে যাচ্ছি।

না না বাছা, অধৈর্য হয়ে মিসেস পারমেনটার বললো, শেষে আমার ঘুম পেলে গল্প করা হবেনা তোমার সংগে—ওঠো—

উঠে দাঁড়াতেই হলো পামেলাকে। আর তার দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে রইলো সুকুমার। পামেলাকে জড়িয়ে ধরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ওপরে উঠতে লাগলো ডাচ বুড়ী আর সমস্ত ওলন্দাজ জাতির মুণ্ডুপাত করতে লাগলো সুকুমার। আজ তার প্রথম মনে হলো এ বাড়ীর একটি লোকের সংগেও যদি তার আলাপ না হতো তাহলেই যেন সব চেয়ে ভাল হতো।

অনেক রাত্তিরে একদিন চোরের মতো কুমার এলো সুকুমারের ঘরে। তার মুখ দেখলেই মনে হয় যেন একটা কিছু করবার জন্যে সে প্রস্তুত হচ্ছে অথবা সাংঘাতিক কিছু ইতি মধ্যেই করে ফেলেছে। ঘরে ঢুকেই সে বললো, সাক্ষী হবে সুকুমার বাবু?

সাক্ষী! বেশ ঘাবড়ে গেল সুকুমার, কেয়া মামলামে গিরা কুমার?

সাদীর মামলা, হামি জ্যাকলীনকে সাদি করবে।

হাঁ, বলতা কেয়া? এতনা জলদি কাম গুছাকে লিয়া, তুমতো কামকা লড়কা হ্যায় বাবা—

হাঁ হাঁ বাবু, হেসে কুমার বললো, আভি চুপসে সাদি করবে, পিছে বাপকে খবর দিবে, এখন জানাজানি হ'লে সব গড়বড় হোতে পারে।

আউর কোন সাক্ষী হোগা?

তুমি, আমার বোন্ধু প্যাটেল আর অরোরা, দশ বারো দিনের ভিতর সাদি হোবে।

পামেলাকে বোলনে পড়ে গা তো ?

আরে না না, আভি পামেলা-ঝামেলা নেহি করবেন, জ্যাকলীন মানা করিয়েছে, রেজিষ্ট্রী হলে যখন বাপের টাকা দিয়ে খানাপিনা হবে তখন সব বলবে হামি—

জ্যাকলীনকা বাপ রাজী হুয়া ?

ওর বাপ নাহি আছে, বুড্ডী মা, গড়বড করতে পারে, তাই চুপচাপ সাদি করতে হোবে।

কুচ পরোয়া নেই, হাম সাক্ষী হোগা কুমার।

কুমার খুশী হয়ে স্থকুমারের ঘর থেকে বেরিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমতে গেল। আর স্থকুমার ভাবছিল কখন পামেলাকে এ স্থখবর দিতে পারবে।

কুমারী সিলভিয়া ড্যানবি নিজের স্থখ দুঃখের গল্প স্থকুমারের সংগে প্রায়ই করে। তার জীবনে বর্তমানে ভগবান ছাড়া আর কিছুই নেই। বিয়ে তার স্থখের হ'লো না আর যাকে ভালবাসলো সে হ'লো বিকলাঙ্গ। এখন ভগবান ছাড়া আর কাউকে ভালবাসবার সাহস নেই তার, ইচ্ছেও নেই। তাই গির্জে যায় ঘন ঘন কুমারী সিলভিয়া ড্যানবি। ইংরেজের গির্জে নয়, রাশিয়ান গির্জে। বিদ্রোহের সময় পলাতক এবং বিতাড়িত বহু রাশিয়ান আছে লণ্ডনে—ধর্মে বড় মতি তাদের। সিলভিয়া তাদের গির্জে যায়—তাদের ভাষায় যোগ দেয় উপাসনায়। শুধু রাশিয়ান নয়, ফ্রেঞ্চ্ আর জার্মান ভাষাও জানে সিলভিয়া।

শুধু উপাসনা নয় স্থকুমার, তারপর রোজ সন্ধ্যেবেলা আরও অনেক আলোচনা হয় গির্জেতে—

আমাকে একদিন নিয়ে চলো না সিলভিয়া ?

যাবে ? পরক্ষণেই বলে সিলভিয়া, কিন্তু কিছুই যে বুঝতে পারবে না তুমি, সব যে হয় রাশিয়ান ভাষায়—

তা বটে।

আর ওরা ইংরেজী জানে না ভালো।

তাহ'লে তো আমি কথাই বলতে পারবো না কারুর সংগে—তবে আজ অবধি রাশিয়ান দেখিনি, একজনের সংগে একটু আলাপ হ'লে খুশী হতাম।

আচ্ছা দাঁড়াও, কি ভেবে সিলভিয়া বলে, একজন খুব ভালো লোক আছে। অবশ্য ওরা সকলেই ভালো। কিন্তু যার কথা বলছি তার নাম মঁসিয়ে পেকোভিস্কি। ছেলে মেয়ে মারা গেছে রাশিয়ায় বিদ্রোহের সময়। ও পালিয়ে যায়। ওর জীবনের গল্প এত আশ্চর্য! ওর সংগে একদিন তোমার আলাপ করিয়ে দেব।

অনেক ধন্যবাদ সিলভিয়া।

ও কিন্তু ইংরেজী জানেনা এক বর্ণও।

তাতে কি, তুমি অনুবাদকের কাজ করবে।

হেসে সিলভিয়া বলে, আচ্ছা বেশ, বড় সরল লোক এই মঁসিয়ে পেকোভিস্কি—জানো তো সুকুমার আজকাল খাঁটী লোকের দেখা পাওয়া কত কঠিন ?

দেখা তো পাওয়া যায় না সিলভিয়া।

কুমারী সিলভিয়া ড্যানবি গম্ভীর হয়ে কি যেন ভাবতে থাকে।

বিয়ের পর কুমার বিরাট ডিনার দিলো শ্যাভয় হোটেলে। দেশে ফিরে যাচ্ছে সে শীগগিরই। তার বাপ খুব খুশী হয়েছেন এ বিয়েতে। এবং লিখেছেন, আর পড়াশুনো করবার দরকার নেই, মেম-বউ নিয়ে

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে যেন দেশে ফিরে যায়। এ ক'বছরে যা বিগ্যে হয়েছে তার বিলেতে—তা তাঁর ব্যবসা চালাবার পক্ষে যথেষ্ট।

কিন্তু কুমার ঠিক বিয়ের পর দেশে ফিরে গেলনা। জ্যাকলীনকে নিয়ে সে গেল ফ্রান্স, ইটালী, সুইজারল্যাণ্ড। জ্যাকলীনের মা মিসেস ট্রেভার্স প্রথমে একটু আপত্তি করেছিলেন এ বিয়েতে। কিন্তু শেষ অবধি মেয়ের জলন্ত যৌবন আর কুমারের বাপের চেকের কথা শুনে আপত্তি টিকলো না তার। কুমার বললো তারা প্রায়ই আসবে লণ্ডনে এবং যখন খুশী তার শ্বাশুড়ীও যেতে পারেন বম্বেতে—এমনকি তিনি ইচ্ছে করলে সেখানে গিয়ে থাকতে পারেন বরাবর। কুমারের মা নেই কাজেই মিসেস ট্রেভার্স তার মায়ের মতো। কুমারের মা নেই শুনে বেশ খুশী হ'লো জ্যাকলীনের মা আর তার বাপের বয়স জেনে নিয়ে কথা দিলো যাবার খুব চেষ্টা করবে বম্বেতে। তবে বড় দূর আর এত বেশী খরচ যেতে—কুমার তখুনি ভরসা দিল শ্বাশুড়ীকে। জানালো, কুমারের পয়সা মানে মিসেস ট্রেভার্সের ছেলের পয়সা। কবে শ্বাশুড়ী যেতে চায় শুধু সেটা জানালেই চলবে আর কিছু ভাবনা করতে হবে না তাকে। কুমারের বাপও বিলেত-ফেরৎ। দরকার হলে সে বাপকে পাঠিয়ে দেবে জ্যাকলীনের মাকে নিয়ে যেতে।

কন্টিনেণ্ট ঘুরে কুমার আবার লণ্ডনে ফিরে এলো প্রায় মাস খানেক পর। গ্রষ্টার ওয়াকে উঠলো না, উঠলো জ্যাকলীনদের বাড়ীতে হর্ণ চার্চে।

দেশে ফিরে যাবার আগে জ্যাকলীন আর কুমার দেখা করতে এলো সুকুমারের সংগে। অবশ্য ওরা যতদিন বিয়ের পর লণ্ডনে ছিল পামেলা আর সুকুমার বেশী সময় থাকতো তাদের সংগে সংগে।

বিশেষ করে নেমন্তন্ন করলো কুমার পামেলা আর সুকুমারকে বম্বেতে। দেশে ফিরে কিছুদিন কুমারের বাড়ীতে ওদের দু'জনকে

থাকতেই হবে। তাদের জন্তেই তো এ বিয়ে সম্ভব হ'লো। কাজেই তারা হ'লো কুমারের সব চেয়ে বড় বন্ধু।

সুকুমার কথা দিল, নিশ্চয়ই থাকবে তারা বম্বেতে, জাহাজ থেকে নেমে কুমারের সংগে কিছুদিন না কাটিয়ে কিছুতেই তারা কলকাতায় যাবে না।

আর তো মোটে একবছর! আগামী বছর এই সময় পামেলা—সুকুমারেরও দেশে ফেরার সময় হ'য়ে এসেছে।

সে দিনের কথাই ভাবছিল সুকুমার।

শেষ বছর

"আনো মৃদঙ্গ, মুরজ, মুরলী মধুরা
বাজাও শঙ্খ, হুলুরব কর বধূরা—
এসেছে বরষা, ওগো নব—অনুরাগিণী,
ওগো প্রিয় সুখভাগিনী—"

হবোর্ণে কনওয়ে হলে বাঙালী ছাত্র-ছাত্রীরা বর্ষামংগল উৎসব করছে। হল ভরে গেছে একেবারে, তিলধারণের স্থান নেই কোথাও। শুধু ভারতীয় নয়, বহু ইউরোপীয় প্রচুর উৎসাহ নিয়ে শুনতে এসেছে ইণ্ডিয়ান কনসার্ট।

ষ্টেজের ওপর গোল হয়ে বসেছে ছেলেমেয়েরা। দেখা যাচ্ছে বীণা সেতার তবলা। ছেলেরা পরেছে ধুতি পাঞ্জাবী আর ঠিকরে বেরুচ্ছে মেয়েদের শাড়ীর রঙ্।

ভারী ভালো লাগছিল সুকুমারের। সে যেন এসব কথা ভুলে গিয়েছিল একেবারে। আজ হঠাৎ তার নাকে এসে লাগলো বাংলার ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ—শুনলো সে বর্ষার সেই ঝম্‌ঝম্ আওয়াজ।

এত বাঙালী ছেলেমেয়ে যে লণ্ডনে আছে সেকথা জানতো না সুকুমার। জানলে ওদের সংগে আলাপ করে আরও অনেক গান শুনে নিত। তার গা ঘেঁষে পামেলা বললো, কী সুন্দর দেখতে তোমাদের দেশের মেয়েরা!

ভারতবর্ষের সবই সুন্দর প্যাম্, গানের সুর কেমন লাগছে?

চমৎকার, ওই মেয়েদের সংগে আমি আলাপ করতে চাই—কী সুন্দর শাড়ী ওদের!

আমি তো ওদের কাউকেই চিনি না—শেষ হয়ে গেলে তুমি আলাপ কর না গিয়ে?

সত্যি করবো?

হ্যাঁ, খুব খুশী হবে ওরা।

সত্যি সুকুমার আর পামেলা গিয়ে আলাপ করলো মেয়েদের সংগে আসর ভাঙবার পরে।

তারা সকলেই ছাত্রী, কেউ পড়ে ইকনমিক্স, কেউ সোস্যাল্ সায়েন্স, কেউ কেউ নার্সিং। পামেলাকে দেখে খুব খুশী হ'লো তারা। বললো, তার উৎসাহ থাকলে ভবিষ্যতে তাকে তারা গান শিখিয়ে ষ্টেজে নামাবে তাদের সংগে।

পামেলা হেসে বললো, গান তো জানি না আমি।

কোরাস্ গাইবে, শুধু কথাগুলো জানলেই চলবে, বাংলা কথাগুলো আমরা তোমাকে ইংরেজীতে লিখে দেবো।

ধন্যবাদ, পামেলা নিজের নাম ঠিকানা লিখে তাদের হাতে দিয়ে বললো, তোমরা অন্য কিছু করলেই আমাকে খবর দিও, আমি আসবো।

নিশ্চয়ই।

আসবার সময় পামেলা বাংলায় বললো, নমস্কার।

ওরাও হেসে হাত তুলে বললো, নমস্কার।

কী সুন্দর মেয়েরা! বাইরে বেরিয়ে সুকুমারের হাত ধরে বললো পামেলা, কিন্তু তুমি একেবারে চুপ করেছিলে কেন সুকু? একটাও কথা বললে না ওদের সংগে—

ওদের দেখে বড় দেশের কথা মনে পড়ছিল প্যাম্।

স্বাভাবিক, হেসে পামেলা বললো, তোমাদের দেশের মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে অনেক ভালো কিন্তু আর সুন্দরও—

মেয়েরা নিজেদের জাতকেই আগে প্রাধান্য দেয়। সুকুমার হাসলো, কিন্তু আমি জানি প্যাম্, শুধু মেয়েরা নয়, যখন আমাদের দেশে যাবে তখন দেখবে সকলেই তোমাকে কত ভালবাসবে।

লণ্ডনের প্রকৃতি দেবী বোধহয় মন দিয়ে আড়াই ঘণ্টা ধরে বাঙালী ছাত্র-ছাত্রীদের বর্ষা মংগলের গান শুনেছিলেন। তাই দ্বার খুলে দিলেন তিনি। এবারের গ্রীষ্ম অশ্রুসজল। শীত-শীত ভাব গেলনা একেবারে। কবে গ্রীষ্ম এলো আর গেলই বা কবে ঠিক বুঝতে পারলো না সুকুমার কারণ গরম তার লাগেনি একদিনও। আবার কারখানায় কাজ করতে হচ্ছে তাকে—এবার এক বছর কাজ করতে হবে। এটা শেষ হলেই পাবে সে ফ্যারাডে হাউসের ডিপ্লোমা। বিদেশে আসা সার্থক হবে তার। তবে এবার তাকে লণ্ডনের বাইরে যেতে হয় নি—এখানেই একটা বড় কারখানায় কাজ করবার সুযোগ পেয়েছে সে।

বাড়ী ফিরতে ফিরতে তার প্রায় সাড়ে ছ'টা হয়। এসে দেখে পামেলা ব্যস্ত আছে ঘরের কাজ নিয়ে—তাকে দেখেই চায়ের জল বসিয়ে দেয় সে।

ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়ে সুকুমারের। খাটে শুয়ে সে গড়িয়ে নেয় কিছুক্ষণ।

এই, চায়ের কাপ্ সামনে নিয়ে বলে পামেলা, চা খেয়ে নাও, বেচারী সুকু!

গ্রীষ্ম হোক, বর্ষা হোক্, শীত আসুক, হিম পড়ুক, তুষার ঝরুক, কুয়াশা ভরুক, ব্লিজার্ড বয়ে যাক্—কিছুতেই দমেনা এ বাড়ীতে শুধু একটি লোক—উৎসাহ তার ঠিক তেমনি থাকে। অর্থাৎ মিসেস

পারমেনটার। তিন চারদিন স্থকুমার তার ঘরে গিয়ে দেখা না করলে আর রক্ষে নেই।

স্থকুমারের কাছে এসে একেবারে ফেটে পড়ে সে, বলি হঁ্যাগা বাছা, পামেলা ছাড়া আর কারুর কথা কি ভাবতে হবে না তোমার? বলি আমি কি কেউ নই? লোকটা বেঁচে আছে কি মরে গেছে একবার খবর করবার সময় পাও না?

তাড়াতাড়ি বললো স্থকুমার, এই এখুনি যাচ্ছিলাম তোমার কাছে আমরা মিসেস পারমেনটার—

রাখো তোমার বাজে কথা, বলি শোন স্থকুমার, এ বাড়ীতে সত্যি আমি আর থাকতে পারবো না বলে দিলুম তোমায়।

স্থকুমার ঘাবড়ে গিয়ে বললো, এবার থেকে আমি নিয়মিত তোমাব খবর নেব, আমাকে মাপ কর।

আহা, তোমার ওপর রাগিনি আমি, তুমি ছেলেমানুষ মেয়ে নিয়ে ব্যস্ত তো থাকবেই—আমার ছেলে ছু'টো তো লণ্ডনে এসে মোটে এক ঘণ্টার জন্যে আসে আমার কাছে, খালি গার্ল ফ্রেণ্ড আর গার্ল ফ্রেণ্ড—

তাহ'লে আবার কি হ'লো?

বলি সারাদিন হাড ভাঙা পরিশ্রম করে রাত্তিরে একটু ঘুমবার দরকার তো?

তাতো বটেই।

কিন্তু ঘুমোতে দেয় কে? রাত্তির একটা ছু'টো অবধি কানের কাছে ঘটর-মটর ফটর-ফটর্ করে বকর-বকর করলে কি ঘুম আসে, বলি বলনা বাছা?

কে বিরক্ত করে তোমায়?

ওই তোমার প্রেয়সী, কুমারী সিলভিয়া ড্যানবি—বিয়ে করে স্বামী ছেড়ে মেয়েমানুষটার কুমারী সাজবার সাধ গেলনা—

অবাক হয়ে সুকুমার বললো, সিলভিয়া বিরক্ত করে তোমায় ?

বলি হ্যাঁ বাছা, অমন করে তাকিও না আমার দিকে, রাগ তুমি করবে জানি, কিন্তু সত্যি কথা বলতে আমি ভয় করি না বাছা—ঢলো ঢলো মুখ দেখে আর গির্জে যাবার ঘটা দেখে তুমি বুঝি ভেবেছ ও সতী-সাধ্বী—অ্যাঁ ? বলি শুনছো বাছা, ঘন ঘন গির্জে ও যেত কেন জানো ?

কেন ? গম্ভীর হয়ে বললো সুকুমার। পামেলা 'আমাকে মাপ করো' বলে ঘর থেকে বেবিয়ে গেল বাসন মাজতে।

লোক ধরতে। জোগাড় করেছ একটাকে। ধড়িবাজ মেয়েমানুষ বাবা, যেমন হয়েছে বাড়ীউলি তেমনি তার ভাডাটেগুলো—এখন এ বাড়ী ছাড়তে পারলে বাঁচি আমি।

কিন্তু তোমাকে সিলভিয়া বিরক্ত করলো কেমন করে মিসেস পারমেনটার ?

বলি খুব যে ওর হয়ে লড়ছো বাছা ? ছেলেগুলো সকলেই সমান, রূপ দেখেছে কি মজেছে ! আরে শোন বাছা সেই লোকটা রোজ ঘরে আসে ওই মেয়েমানুষটার—তারপর কত গল্প হাসি, বুঝলে বাছা ? —আর মাঝখান থেকে ঘুমতে পারি না আমি। ইংরেজী বলে না আবার ওরা—ওদের কথা বুঝতে পারলে রাগ হতো না অত আমার। লোকটা রাশিয়ান—তাই শুনি কানের কাছে, শুধু ফটর্ ফটর্ ভুট্— তা প্রেম করবি তো কেনসিংটন গার্ডেনস্-এ যানা—আমার ঘুম নষ্ট করে তোদের কি লাভ বাপু।

একটু কৌতুহল হলো সুকুমারের। ভাবলো সিলভিয়াকে জিজ্ঞেস করে জানতে হবে আসল ব্যাপারটা কি।

কয়েকদিন পর সিঁড়িতে সিলভিয়ার সংগে দেখা হতেই সুকুমার তাকে ডাকলো নিজের ঘরে আর অসঙ্কোচে প্রকাশ করলো তার

কৌতূহল। সিলভিয়া ড্যানবির লাল মুখ আরও লাল হয়ে গেল—লজ্জায় নয় রাগে। সে যেন ফুঁশতে লাগলো হঠাৎ।

ছি ছি স্নকুমার, এমন মেয়েমানুষ আমি জীবনে দেখিনি।

সিলভিয়া যে এত রাগ করতে পারে সেকথা ভাবতে পারেনি স্নকুমার। লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি সে বললো, আমি বোধহয় তোমার মনে কষ্ট দিলাম, দোষ আমার সিলভিয়া—

তুমি কি করতে পারো? রাগ সংযত করে বললো সিলভিয়া, দুই ছেলে ওর, এই দোষের জন্যে তারা ওর ছায়া মাড়ায় না, দিন রাত খালি পরের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায়, বাড়ী ছাড়ছে ও আজ দু'বছর থেকে—কোথায় যাবে ও? গেলে বাঁচি আমরা—

চা খাবে সিলভিয়া?

হেসে সিলভিয়া বললো, না ধন্যবাদ স্নকুমার। কিন্তু আজ নয়, আমার একটু কাজ আছে এখন—তোমাকে সব কথা বলব আমি কিছুদিনের মধ্যে। অ্যালেন জানিনা কেন, হঠাৎ আমার সংগে কথা বলা একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে, তাই খুব স্নখে আছি আমি, হেসে সিলভিয়া বেরিয়ে গেল।

শরতেও পেলনা স্নকুমার মনের মতো একটি উজ্জ্বল দিন। ভিজে দিনগুলি ধোঁয়ায় আরও ভারী হয়ে ওঠে। হালকা শীতের ছোঁয়ায় শিরশির করে শরীর। রেন কোট না নিয়ে বাইরে বেরুবার উপায় নেই।

কনওয়ে হলে বর্ষার সেই গান শোনার পর থেকে দেশের কথা মনে পড়ে স্নকুমারের। ভাবতে ভালো লাগে মার কথা, দেখতে ইচ্ছে করে মণ্টু, ঘুছু ছায়া রাণুকে, স্মরণে আসে আত্মীয়দের কথা। আর মনে হয়, এই আমি কি সেই আমি! ছাব্বিশ বছর বয়স হলো তার—কিন্তু এই ক'বছরের যেন হয়ে উঠেছে সে আর এক মানুষ।

কত লোককে জেনেছে সুকুমার—পেয়েছে কত স্নেহ, কত সমবেদনা, কত ভালবাসা! তাই এই ইংলণ্ড ছাড়তে হবে ভাবলেই মন ভেঙে যায় তার। অথচ ছাড়তে তো হবেই—সামনে কঠিন দায়ীত্ব তার। সময়ও হয়ে এলো। আর একবছরও নেই, মাত্র কয়েকমাস। দেখতে দেখতে শেষ হয়ে যাবে শেষের এই কয়েকটা মাস। পামেলার দেখা পেয়েছে সুকুমার এইখানেই—লণ্ডন ছাড়বে কেমন করে সে। পামেলার যদি ভালো না লাগে ভারতবর্ষ—যদি ভালো না লাগে তার মাকে আর ভাইবোনদের—যদি তার মুখের হাসি মিলিয়ে যায়।

প্রকৃতি অপ্রসন্ন হলেও ছুটির দিনে পামেলাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে সুকুমার। কারখানা থেকে মাইনে পাচ্ছে বলে তার পয়সার অভাব এখন নেই। তাই বাড়ীতে নিয়মিত রান্না করে না তারা—বাইরে খায় অনেক সময়।

আর মোটে কয়েকটা মাস প্যাম্, তারপর দু'জনকেই ইংলণ্ড ছাড়তে হবে, চলো তাই ভালো করে দেখি লণ্ডন—

আমরা কি চিরকালের জন্যে লণ্ডন ছাড়ছি, আবার তো আসবো।

নিশ্চয়ই, জোর দিয়ে বলে সুকুমার।

ইউরোপে আর আসা হবেনা সেকথা কিছুতেই ভাবতে পারে না সে। এবারে তো কিছুই দেখা হলোনা ইউরোপের। পয়সা নেই তার যথেষ্ট। মা আর ভাই বোনদের কথা মনে করে শুধু দেশ ভ্রমণ করে এক পয়সাও খরচ করতে মন চাইলো না তার! ছাব্বিশ বছর বয়স হলো, মা'র ওপর নির্ভর করা আর সাজেনা তার। মার কষ্টের পয়সায় সে যাবে কেমন করে কণ্টিণ্টেটে—পামেলা শুনলে বলবে কি! আর যেমন করে লণ্ডনে এসেছে তেমন ভিখিরীর মতো জীবনে আর কোনদিনও কোথাও যাবে না সুকুমার। খুব শিক্ষা হয়েছে তার একবারেই।

আবার পামেলাকে নিয়ে ইউরোপে আসবে সে। তখন আসবে আপিসের কাজে, আপিসের পয়সায় সস্ত্রীক। কোন দায় থাকবে না তখন স্বকুমারের, থাকবে না কোন ভাবনা। সেই সময় মনের সুখে ঘুরে যাবে। স্কটল্যাণ্ড, আয়র্ল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী, সুইটজারল্যাণ্ড, জার্মানী, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক—আরও কত দেশ!

এক ছুটির দিনে ঠাণ্ডা রোদ্দুর পেয়ে পামেলা আর সুকুমার কেনসিংটন চার্চ ষ্ট্রীট থেকে ২৭বি বাস ধরে চলে এলো কিউ গার্ডেনসএ। একটু রোদ উঠলে ঘরে বসে থাকার কথা আজকাল কল্পনাও করতে পারেনা সুকুমার। রোদ খুব ভাল লাগে তার, মিষ্টি লাগে, কাঁচা সোনার চেয়ে মূল্যবান মনে হয়। লণ্ডনের রোদ সোনার মতো বৈকি!

ছোট বড় গাছ, অনেক ফুল, আর নানা তরী-তরকারীতে ভরা কিউ গার্ডেনস—বোটানিক্যাল গার্ডেনস্এর মতো। বেশ দূরে এই বাগান। ওদের আসতে প্রায় ঘণ্টা খানেক সময় লাগলো।

কিন্তু এক পেনি দিয়ে টিকিট কেটে ভেতরে এসে ওরা দেখে ছেলেমেয়ের ভীড়ে ভরে গেছে বাগান। দলে দলে ছেলেমেয়ে হয় হাত ধরাধরি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে নয় গা এলিয়ে শুয়ে আছে।

দেখছ প্যাম্ কী ভীড়!

রোদ্দুর উঠেছে যে সুকু—আহা কী সুন্দর দিন!

চলো ওই বড় গাছটার নিচে বসি।

না ওখানে তো ছায়া, এসো এই তাজা রোদ্দুরে বসি।

পামেলা কোট খুললো না, সুকুমারেরও গায়ে রইলো রেইন কোট। রোদ হলেও তেজ তার খুবই সামান্য।

সুকুমার পকেট থেকে সিগ্রেট বের করলো। পামেলার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, খাও।

স্থকু আমি কি সিগ্রেট খাই ?

খাও না একটা ?

তারপর অভ্যাস হয়ে গেলে ? যা দাম সিগ্রেটের !

এতটুকু মনের জোর নেই ? আমি তো ইচ্ছে করলেই ছেড়ে দিতে পারি।

দাওনা ছেড়ে লক্ষীটি, তোমার মনের জোর কত দেখি, পামেলা হাসতে লাগলো।

অন্য কথা পাড়লো স্থকুমার, আমাদের দেশে মেয়েরা কিন্তু সিগ্রেট খায়না প্যাম্।

তবে আমাকে খেতে বলছ কেন ?

তুমি কি আমাদের দেশের মেয়ে ?

তুমি কি আমাদের দেশের ছেলে ? তাহলে আমাদের দেশের লোক যা করে তুমি তাই কর কেন ? অত ইংরেজী আদব-কায়দা নিয়ে মাথা ঘামাও কেন ?

স্থকুমার হেসে বললো, যস্মিন দেশে যদাচার।

তাই আমি যদি তোমাদের দেশে গিয়ে সিগ্রেট খাই তাহলে লোকে নিন্দে করবে, ভাববে ইংরেজ মেয়েরা অসভ্য।

বাঃ বাঃ, পামেলার পিঠ চাপড়ে স্থকুমার বললো, দিন দিন তোমার বুদ্ধি বাড়ছে - বেশ কথা বলতে শিখেছ তো।

তুমি কি মনে কর তুমি শুধু একাই কথা বলতে পারো ?

কে শেখাল তোমায় কথা বলতে ?

কিন্তু আমি শুধু কথা বলিনা তোমার মতো—কাজও করি।

কি আমার কাজের মেয়ে রে ! যাওনা কারখানায়—দেখা যাবে কাজের বহর !

দরকার হলে এখখুনি পারি।

সুর বদলে সুকুমার বললো, তুমি সত্যি কাজের মেয়ে পামেলা, তা না হলে এতদিনে কি হতো আমার।

স্বীকার করছ সেকথা ?

মনে-প্রাণে। তোমাকে বাদ দিয়ে আমার একদিনও চলবে না, ভাগ্যিস বিলেতে এসেছিলাম।

পামেলা সুকুমারের আরও কাছে সরে এসে বললো, ভাগ্যিস—তুমি না এলে কি করতাম আমি।

আমার চেয়ে ভাল লোক পেতে হয় তো।

চাইনা আমি।

কয়েক মিনিট চুপচাপ।

এই সুকু ?

কি ?

কি ভাবছ ?

তোমার কথা প্যাম।

বল না কি কথা ?

ভাবছি যদি আমাদের দেশ তোমার ভাল না লাগে ?

খুব ভাল লাগবে।

আমার মা বড় সেকেলে—

আমার মাও বড় সেকেলে ছিলেন—

আমার ভাইবোন—তারা তো আমার মতো ইংরেজী আদব-কায়দা জানেনা—

হেসে পামেলা বললো, তাতে কি হয়েছে ?

তোমার যদি কষ্ট হয় ?

কষ্ট হবে কেন ? তুমি তো থাকবে।

আর আমাদের দেশের সমস্ত কিছু একেবারে আলাদা—কেমন করে থাকবে তুমি ?

ঠিক তুমি যেমন করে থাকবে তেমনি করে।

তবু প্যাম্—

আমার কথা ভেবনা সুকু—তুমি কি আজও চেননি আমাকে ?

হেসে সুকুমার বললো, চিনেছি তবু—

বাধা দিয়ে পামেলা বললো, আমি ভারতবর্ষকে না দেখে ভালবেসেছি একটি মাত্র মানুষকে দেখে—

সুকুমার শেষ করে দিল কথা, কিন্তু তাই তো আমার ভয় কারণ ভারতবর্ষে সেই মানুষ মাত্র একটি, ঘরে ঘরে সুকুমার নেই—আরও পাঁচজনকে দেখে হতাশ না হও !

উঃ কী দাম্ভিক !

দম্ভ হবে না কেন প্যাম্ ? আমার জন্যে তুমি ভারতকে ভালবাসলে, বাংলা শেখার চেষ্টা করলে, সব কিছু ছাড়লে—রাষ্ট্রদূতের চেয়ে আমি কম কিসে ?

পামেলা বললো, ইওর্ এক্সেলেন্সি ! আমি সর্বান্তকরণে তোমার সেবা করবো।

জ্বলন্ত সিগ্রেট দূরে ছুঁড়ে ফেলে সুকুমার বললো, হিজ এক্সেলেন্সি তোমার কথা শুনে বড় পুলকিত হলেন।

ব্যারনস্ কোর্টে রাশিয়ান গির্জে বসে মোমবাতির কম্পমান আলোয় কুমারী সিলভিয়া ড্যানবি মঁসিয়ে পেকোভিস্কির মুখে স্বর্গের জ্যোতি দেখেছিল। সুকুমার বলেছিল তাকে একদিন, খাঁটী লোকের দেখা আজকাল একেবারেই পাওয়া যায় না। সেকথা বিশ্বাস করে সিলভিয়া। কিন্তু মোমবাতির আলোয় পেকোভিস্কির মুখ দেখে তার সে-ধারণা

শিথিল হয়ে যায়। এত ভালো এত সরল! ঈশ্বরের ইচ্ছে না থাকলে এমন লোকের দেখা কোনদিনও পেতনা সিলভিয়া। বস্তুত, জীবনে তার আর কোন সাধ ছিলনা—ঈশ্বর তার সর্বস্ব, তাই বোধহয় তিনি মুখ তুলে চাইলেন। জীবন আবার মধুময় হল সিলভিয়ার। আর কিইবা তার এমন বয়স—মন পবিত্র থাকলে যৌবন কোনদিনও যায় না। সিলভিয়া আবার শুনতে পাচ্ছে অনন্ত যৌবনের মৃদু করাঘাত। হয় তো অদূর ভবিষ্যতে পেকোভিস্কির সংগে এক হয়ে তারা ভগবানেরই সেবা করবে। অবশ্য এও রাশিয়ান—কিন্তু এবার মাঝখানে মা নেই আছে ঈশ্বর, তাই এবার আর কিছুতেই আঘাত পাবে না সিলভিয়া, ব্যর্থ হবেনা তার এ হঠাৎ আসা যৌবন।

হঠাৎ প্রার্থনার পর একসময় মাথা তুলে সিলভিয়া দেখে পেকোভিস্কি তাকিয়ে আছে তার দিকে—সে-দৃষ্টিতে কী গভীর সমবেদনা! মন্ত্র-মুগ্ধের মতো সিলভিয়াও তাকিয়ে রইলো তার দিকে। আস্তে আস্তে পেকোভিস্কি এগিয়ে এলো তার কাছে, আমি ইংরেজী জানিনা, তুমি রাশিয়ান জানো?

মাথা তুলে মন্ত্রচালিতের মতো সিলভিয়া বললো, হ্যাঁ।

খুব ভালো হ'লো, আমার নাম পেকোভিস্কি, আর তোমার?

সিলভিয়া ড্যানবি।

ইংরেজ?

হ্যাঁ, কিন্তু রাশিয়ান আমার সব চেয়ে বেশী ভালো লাগে।

কোন রাশিয়ানদের? একটু হাসলো পেকোভিস্কি, রাশিয়ান দু' রকম আছে, বিদ্রোহের আগের দল, আর বিদ্রোহের পরের দল।

আগের দল নিশ্চয়ই, পরের দলের কথা কিছু জানিনা।

আমি আগের দলের, আমার স্ত্রী মেয়ে মারা যায় বিদ্রোহের সময়—আর আমি কোনরকমে পালিয়ে আসি।

ইংরেজী শেখনি কেন এতদিন ?

ইচ্ছে করে, আর সময়ও পাইনি—কী যে না করতে হয়েছে আমাকে ইংলণ্ডে—কুলিগিরি থেকে সব কিছু।

বেচারী পেকোভিস্কি !

তারপর থেকে রোজই কথা হতো সিলভিয়ার পেকোভিস্কির সংগে। তারা দু'জনে মিলে শুনতো ঈশ্বরের কথা। আর হঠাৎ এক সময় তারা দু'জনেই বুঝতে পারলো যে তাদের হৃদয় তাদের অজ্ঞাতে এক হয়ে গেছে বিধির বিধানে !

মুখে যাই বলুক না কেন সুকুমার, সেই ভাড়ার ব্যাপারের পর থেকে ষ্ট্রেসন দম্পতির ওপর বিশেষ প্রসন্ন ছিল না সে। তার মনের কোথায় যেন একটা আঘাত লেগেছিল। ইংলণ্ডে এত স্নেহের মাঝে একটি লোকও যে তাকে এমনি করে অপমান করবে সে কথা সে কল্পনাও করেনি কোনদিন। দয়া মায়া দূরের কথা, ভদ্রতা-জ্ঞানও নেই তাদের। অবশ্য দোষ হয়তো সুকুমারের কিন্তু ইংরেজ হয়ে অমন অভদ্র ব্যবহার কেন করেছিল ষ্ট্রেসন। তারপর থেকে সুকুমার তাদের সংগে যেচে কথা বলেনি—খামের মধ্যে যথা সময়ে ভাড়া নিচে রেখে গেছে, অসুবিধা হলে লিখে জানিয়েছে। ষ্ট্রেসন দম্পতি যখন তাকে হেসে অভিবাদন জানিয়েছে, গম্ভীর হয়ে সুকুমার শুকনো প্রত্যুত্তর দিয়েছে তার। আর অ্যালেন পারমেনটার যখন চীৎকার করে শ্রাদ্ধ করেছে তাদের, সুকুমার সায় দিয়েছে মনে-প্রাণে। সেই হৃদয়হীন ইংরেজ ব্যবসায়ী দম্পতির চোখে একদিন সুকুমার দেখলো জল। খুব আশ্চর্য লেগেছিল তার সেদিন। মানুষের জন্য নয়, অশ্রু তাদের ঝরেছিল কুকুরের জন্যে।

ষ্ট্রেসনদের কুকুরের নাম নিপ। কালো রঙের বেশ বড় স্প্যানিয়েল

—চো'খের কাছে একটু শাদা। ভাড়াটেদের সংগে একেবারে হরিহর আত্মা নিপের। অনেকদিন যখন দরজা একটু ফাঁক রেখে কিছু কাজ করেছে সুকুমার—হঠাৎ কার স্পর্শ পেয়ে চমক লেগেছে তার। ফিরে দেখে নিপ্ জিব বের করে নেজ নাড়ছে। তাকে আদর করে সুকুমার বলেছে, নিপ্ বিরক্ত করোনা, যাও—লক্ষ্মী ছেলের মতো তখুনি বেরিয়ে গেছে নিপ্।

সেই নিপের জন্যে একদিন শোকের ছায়া নামলো বাড়ীতে। শনিবার একটু বেলায় ঘুম থেকে উঠে ব্রেকফাষ্ট খেয়ে সুকুমার ওয়ার্ডবের ওপর থেকে পাড়লো কাগজের ব্যাগ—র‍্যাশন বুক পকেটে নিয়ে নিচে নেমে এলো। সদর দরজা খোলা, ছলছলো চোখে দাঁড়িয়ে আছে মিসেস ষ্ট্রেসন।

গুড মর্ণিং মিসেস ষ্টেসন্?

গুড মর্ণিং, খুব ব্যস্ত আছো?

বিশেষ নয়—কেন?

ধরা গলায় বললো মিসেস ষ্ট্রেসন, ওই দেখ ওখানে, কেনসিংটন চার্চ ষ্ট্রীটের ওপর ভীড় জমেছে, আর ভ্যান্ দাঁড়িয়ে আছে, শুনছি একটা কুকুর বাস্-চাপা পড়ে মারা গেছে, তুমি দয়া করে দেখবে ও নিপ্ কি-না?

নিশ্চয়ই, আমি এখুনি যাচ্ছি।

তোমাকে কষ্ট দিচ্ছি বলে কিছু মনে করো না, আমি যাচ্ছিনা কারণ যদি নিপ্ হয় তাহ'লে সে-দৃশ্য আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারবো না—

কিছু কষ্ট নয় মিসেস ষ্ট্রেসন, আমি দেখছি—

সুকুমার সেখানে গিয়ে পুলিশকে জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার অফিসার?

একটা কুকুর চাপা পড়ে মরেছে, আমরা বুঝতে পারছি না কার কুকুর ওটা—

কোথায়? আমি দেখতে পারি কি?

নিশ্চয়ই, ওই ভ্যানের মধ্যে দেখ।

কিন্তু বড় উঁচু ভ্যান্, সুকুমার দেখতে পারলো না। তখন পুলিশ তুলে ধরলো সুকুমারকে, দেখতে পাচ্ছ?

অফিসার, এ নিপ্। নিপের মুখ বাসের চাকায় থেঁতো হয়ে বিকৃত হয়ে গেছে। আর ঘাড়ে রক্তের দাগ। পুলিশ তাকে নামিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তোমার কুকুর?

না, আমার ল্যাণ্ড লেডির।

দয়া করে তার কাছে আমাকে নিয়ে চলো।

মিসেস ষ্ট্রেসনের হাতে নিপের বকলস্ দিয়ে পুলিশ বললো, আমি খুব দুঃখিত, তারপর মিসেস ষ্ট্রেসনের নাম ঠিকানা লিখে নিয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল।

সুকুমার, মিসেস ষ্ট্রেসন্ সুকুমারের হাত ধরে কেঁদে উঠলো, তুমি এখন কোথাও যেওনা, আমার সংগে থাকো কিছুক্ষণ —

সেই সন্ধ্যায় দরজায় মৃদু করাঘাত।

ক্ষমা করো, তোমাকে বিরক্ত করলাম, মিঃ ষ্ট্রেসন বললো, was Nip badly injured?

না মিঃ ষ্ট্রেসন।

অনেক ধন্যবাদ, ছলছল চোখে টলতে টলতে মিঃ ষ্ট্রেসন নিচে নেমে গেল।

ম্যাডাম ম্যাকরোণী হল্যাণ্ড চলে যাবার পর তার ঘরে এলো

অক্সফোর্ড থেকে হালে পাশ করা সিরিল গার্ডনার। সুকুমার এ খবর পেয়েছে মিসেস পারমেনটারের কাছ থেকে। বেশীদিন সে থাকবে না লণ্ডনে, শুধু কাটাবে এই বড় দিনের ছুটিটা। সিরিল গার্ডনার লেকচারারের চাকরী পেয়েছে বার্মিংহাম্ বিশ্ববিদ্যালয়ে। সোজা সেখানে চলে যাবে সে।

মিসেস পারমেনটার পামেলাকে তার ঘরে শুতে নিয়ে যাবার পর থেকে সুকুমারের আর ক্ষীণতম কৌতূহল নেই এ বাড়ীর নতুন লোকের সংগে আলাপ করবার। তাই সে জানেও না কারা এসেছে কুমারের ঘরে। কিন্তু মিসেস পারমেনটার ছাড়বার পাত্রী নয়। বললো, তোমার মতো বুদ্ধিমান সিরিল, বুঝেছ বাছা, আলাপ করে দেখ খুশী হবে, কিন্তু সাবধান বাছা, দেখো ওই কুমারী মেয়েমানুষটার সংগে ওর কিছুতেই যেন আলাপ না হয়, মাথাটি খাবে তাহলে বাছার, যদিও আমি ওকে সাবধান করে দিয়েছি এর মধ্যে—

এক শনিবার সিরিল আর সুকুমারকে চা খেতে বললো মিসেস পারমেনটার। সেখানেই ওদের দু'জনের আলাপ হলো।

সুকুমারকে দেখে প্রায় লাফিয়ে উঠলো সিরিল গার্ডনার, আরে তুমি ইণ্ডিয়ান—দর্শনের ছাত্র নাকি?

না, হেসে সুকুমার বললো, ইলেকট্রিক্যাল্ এনজিনীয়ারিংএর—তোমার বিষয় বুঝি দর্শন?

হ্যাঁ, দর্শনে এ বছর অক্সফোর্ড থেকে পাশ করেছি। এত অদ্ভুত জ্ঞান তোমাদের স্যার রাধাকৃষ্ণনের, আলাপ আছে তোমার সংগে?

না, তবে তাঁর নাম ভারতবর্ষের সকলেই জানে।

ইউরোপেও তাঁর খুব নাম, চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারেন তিনি, সুকুমারের মুখের দিকে তাকিয়ে গার্ডনার বললো, তুমিও মাদ্রাজের লোক নাকি?

আরে না না, আমার বাড়ী বাংলা দেশে ?

মানে টেগোরের দেশ।

হ্যাঁ, তুমি টেগোরের লেখা পড়েছ ?

নিশ্চয়ই।

হঠাৎ এদের বাধা দিয়ে মিসেস পারমেনটার বলে উঠলো, সুকুমার পামেলাকে বিয়ে করবে, সে-মেয়ে রোজ আসে ওর ঘরে।

অবাক হয়ে সিরিল বললো, তাই নাকি !

কয়েকদিনের মধ্যেই খুব ভাব হয়ে গেল সিরিল আর সুকুমারের।

পামেলাকে সংগে নিয়ে ওরা একসংগে কাটালো বড়দিনের ছুটি। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সিরিল গার্ডনার বোধহয় সুকুমারের চেয়ে বেশী জানে। শুধু বুদ্ধ, রামানুজ, শঙ্করাচার্য্য, শ্রীঅরবিন্দ, চার্বাক, আর রাধাকৃষ্ণনের কথা নয়, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, অবনীন্দ্রনাথ, যামিনী রায়ের কথাও।

পামেলা বললো, তুমি তো কিছুই বলনি আমাকে ভারতবর্ষের কথা, সিরিলের কাছ থেকে সব জেনে নিলাম আমি। আমি জানতাম টেগোর অনেক আগেকার কবি—তিনি মারা গেছেন মাত্র ১৯৪১ সালে।

সুকুমার বললো, সত্যি সিরিলকে আমার এতো ভাল লেগেছে পামেলা, আমিও ওর কাছ থেকে ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে অনেক কিছু জানলাম।

ওরা ঘুরে বেড়ালো বেশ। রয়্যাল অ্যালবার্ট হলে কনসার্ট শুনলো, সেডলার্স ওএল্‌স্‌এ ব্যালে দেখলো, একদিন কভেন্ট গার্ডেনে অপেরা শুনতেও গেল। সুকুমারের ইংলণ্ডে এই শেষ বড় দিন। তাই সে মিটিয়ে নিতে চায় সব সাধ।

কিন্তু সিরিল গার্ডনার হলো এদের ক্ষনিকের সাথী। একেবারে শেষ বছরে মনের মতো ইংরেজ ছেলে-বন্ধু পেয়ে খুব খুশী হয়েছিল

সুকুমার। আজও একটি সমবয়সী ইংরেজ বন্ধু হয়নি তার। তাই সিরিল চলে যেতেই বড় মন খারাপ হয়ে গেল সুকুমারের। কয়েকদিন সে বেশ মন-মরা হয়ে রইলো।

এবারের শীত তত কঠিন নয়। বড়দিন হয়ে গেল। জানুয়ারী শেষ হতে চললো প্রায়, তবু তুষার ঝরলোনা একদিনও। সিলভিয়ার সংগে কথা হয়নি অনেকদিন তাই সুকুমার একদিন পা টিপে টিপে খুব আস্তে টোকা মারলো তার দরজায়। মিসেস পারমেনটার জানতে পারলে আর রক্ষে থাকবে না।

এসো সুকুমার, সত্যি রূপ আছে বটে সিলভিয়ার। ইসারায় তাকে চুপ করতে বলে আস্তে আস্তে চেয়ারে বসে পড়লো সুকুমার। ইংগীত বুঝতে পেরে হাসলো সিলভিয়া। বোধ হয় মনে মনে এই ভেবে সে খুশী হলো যে তাহলে এতদিনে সুকুমারও চিনেছে অ্যালেন পারমেনটারকে।

সিলভিয়ার ঘরে একটা বিরাট পরিবর্তন প্রথমেই সুকুমারের চোখে পড়লো। অর্থাৎ ম্যান্টেলপিসের ওপর ছবিগুলি। কর্ট হেনির ছবি আর একটিও নেই সেখানে—রয়েছে আর একটি লোকের ফটো, রোগা হিটলারের মতো দেখতে, ঠিক তেমনি গোঁফ—নানা ভঙ্গীতে তার অনেক ছবি।

ইনি কে সিলভিয়া?

আমার প্রিয়তম, হেসে সিলভিয়া বললো, মঁসিয়ে পেকোভিস্কি।

তাহলে প্রিয়তমই করে ফেললে একে?

কি আর করতে পারি সুকুমার, সব ঈশ্বরের ইচ্ছা—তবে সত্যি আমার ভাগ্য বলতে হবে—এত খাঁটী লোক ও!

ওরও ভাগ্য ভালো, তোমার মতো রূপসী ক'জন পায়?

হেঁ হেঁ হেঁ, আজ তুমি আমাদের সংগে খেয়ে যাও সুকুমার, তুমি তো মাংস ভালবাসো, ভাল মাংস আছে আজ, আর পেকোভিস্কির সংগে তোমার আলাপ করিয়ে দেব।

পামেলা আসবে, থাকতে তো পারবোনা সিলভিয়া, আর একদিন বরং—

আরে পামেলাও খাবে এখন আমাদের সংগে।

ধন্যবাদ সিলভিয়া, কিন্তু ম'সিয়ে পেকোভিস্কির কথাও ভেবে দেখ, সে শুধু তোমাকেই দেখতে চায়, সারাদিন পর তোমাকে একা পাবার জন্যে সে ছুটে আসবে—তাই আমি বলি আজ তার সংগে শুধু আলাপ করে আমি চলে যাই, খাওয়া দাওয়া অন্যদিন হবে।

সিলভিয়া একটু ভেবে বললো, আমি তোমার আর পামেলার জন্যে মাংস তোমার ঘরে দিয়ে আসবো।

সেই সবচেয়ে ভালো, অনেক ধন্যবাদ সিলভিয়া।

আসছে মাসে আমরা চলে যাবো সুকুমার।

কোথায় ?

ম'সিয়ে পেকোভিস্কি আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছে।

খুব ভালো কথা, তুমি রাজী হয়েছো তো ?

না হ'য়ে কি করি বলো সুকুমার, অমন ভালো লোকের মনে ব্যথা দেব কেমন ক'রে ?

তাতো ঠিক—কবে বিয়ে হবে তোমাদের ?

এখনও দেরী আছে মাস আষ্টেক, আগামী মাসে আমরা অষ্ট্রিয়া যাচ্ছি একসংগে, আমার বন্ধু হর্ষ্ট হেনির সংগে দেখা করতে। আমার অনেক দিনের বন্ধু, তার মত এ ব্যাপারে নেয়া দরকার।

তিনি নিশ্চয়ই মত দেবেন, হেসে বললো সুকুমার।

নিশ্চয়ই, আমি সুখী হলেই সে সুখী হবে।

তোমাদের বিয়েতে থাকতে পারলে খুব খুশী হতাম কিন্তু আমি তো তখন দেশে ফিরে যাবো।

কবে?

মোটে আর কয়েকমাস পরে।

এমন সময় এলো মঁসিয়ে পেকোভিস্কি। শান্ত শিষ্ট গোবেচারা-গোছের লোক। সুকুমারকে দেখেই কি যেন বললো সে সিলভিয়াকে।

হেসে সিলভিয়া বুঝিয়ে দিল, ও বলছে যে তোমাকে দেখেই বুঝেছে যে তুমি কে—

খুব বুদ্ধিমান লোক, সুকুমার তারিফ করলো পেকোভিস্কির।

সিলভিয়া অনুবাদ করে পরস্পরকে বোঝাতে লাগলো ভাবার্থ।

পেকোভিস্কি বললো, ইণ্ডিয়ান কারি তার খুব ভাল লাগে।

সুকুমার বললো, শীগগিরই একদিন রেঁধে খাওয়াবে।

কেমন লাগলো সুকুমার? ভালো যে সুকুমারের লাগবেই এ বিষয় নিশ্চিন্ত থাকলেও প্রশ্ন করলো সিলভিয়া।

অদ্ভুত খাঁটি লোক, উঠে দাঁড়িয়ে সুকুমার বললো, তোমাদের দু'জনেরই ভাগ্য খুব ভালো।

একথাও অনুবাদ করলো সিলভিয়া।

বোসো বোসো, বললো পেকোভিস্কি।

না, ওর মেয়ে-বন্ধু আসবে এখন।

আবার এসো, যেন এ ঘরের মালিক পেকোভিস্কি, ভারতীয় দেখলেই আমার কারি খেতে ইচ্ছে করে হি হি হি—

সিলভিয়া হেসে বললো, আমি শীগগিরই তোমাদের জন্যে মাংস নিয়ে যাচ্ছি সুকুমার।

ধন্যবাদ, গুড নাইট মঁসিয়ে পেকোভিস্কি, সুকুমার পা টিপে টিপে তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেল।

আজ আর রান্না করো না প্যাম্—

কেন ?

সিলভিয়া মাংস নিয়ে আসবে।

বাঁচলাম, বড় ক্লান্ত আজ, কিছুই করতে ইচ্ছে করছে না।

ভবিষ্যতে ক্লান্ত থাকলে বলবে, বাইরে খাব আমরা।

তোমার কেবলই বাইরে খাবার ইচ্ছে।

দরজায় শব্দ শুনে সিলভিয়া মাংস নিয়ে এসেছে মনে করে সুকুমার তাড়াতাড়ি দরজা খুললো। সিলভিয়া নয়, কাঁচের বড় বাটী হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মিসেস পারমেনটার।

তোমাদের জন্যে একটু মাংস নিয়ে এলাম সুকুমার।

অনেক ধন্যবাদ মিসেস পারমেনটার!

এখন খাও দেখি বাছা দু'টোতে মিলে।

এত তাড়াতাড়ি ? আমরা বরং পরে--

না বাছা না, এইতো সাপার খাবার সময়, আর আমাকেও তো বলবে কেমন লাগলো, দাও দেখি পামেলা দুটো প্লেট, আমার সামনে বসে আজ খেতে হবে তোমাদের।

অগত্যা খেতেই হ'লো। আর যেই তাদের খাওয়া শেষ হয়েছে সেই আবার শোনা গেল দরজায় টুক্‌টুক্। এবারে এলো সিলভিয়া।

সুকুমার তোমাদের জন্যে—, মিসেস পারমেনটারকে দেখে থেমে গেল সিলভিয়া।

আর খ্যানখ্যানে গলায় চেঁচিয়ে উঠলো মিসেস পারমেনটার, আঃ, বল না সুকুমার যে খাওয়া হয়ে গেছে তোমাদের, বলি লোকে সাপার কি রাত দুপুরে খায় ? মেয়েমানুষটাকে বল যে রাশিয়ানটাকে খাওয়াক ওই মাংস।

উঃ—এমন লজ্জায় জীবনে কোনদিন পড়েনি সুকুমার।

প্রায় দেড়মাস পর মঁসিয়ে পেকোভিস্কির সংগে কুমারী সিলভিয়া ড্যানবি চলে গেল অষ্ট্রিয়ায় তার বিকলাঙ্গ প্রেমিক হুষ্ট হেনির মত আনতে। তারা যাবার সংগে সংগে হিংস্র হয়ে উঠলো প্রকৃতি। দিনরাত ঠাণ্ডা হাওয়ার সোঁ সোঁ শব্দ আর তুষারের অবিশ্রাম ঝড়।

সিলভিয়াকে বলেছিল সুকুমার, তোমার বিয়ের পর তোমার সংগে আর আমার দেখা হবে না, তাই আমাকে প্রথম তোমার নতুন নামে সম্বোধন করতে দাও—

কি বলছ সুকুমার ঠিক বুঝতে পারছি না।

হেসে সুকুমার বলেছিল, ম্যাডাম পেকোভিস্কি!

অনেক ধন্যবাদ, খুশীতে গলে পড়েছিল যেন সিলভিয়া, একথা আমার চিরদিন মনে থাকবে সুকুমার, আমাদের বিয়েতে তুমি থাকলে এত খুশী হতাম!

ভবিষ্যতে আবার দেখা হবে সিলভিয়া।

তাই যেন হয়!

সিলভিয়া চলে যাবার পর সুকুমারকে নিয়ে পড়লো মিসেস পারমেনটার, ওহে বাছা এবার চল দেখি—

কোথায়?

আমার পাশের ঘরে থাকতে হবে তোমাকে, তা না হলে আবার কোন বদমাইস মেয়েমানুষ এসে জুটবে।

ঘাবড়ে গিয়ে সুকুমার বলেছিল, না না মিসেস পারমেনটার—ও ঘরটা বিশেষ ভালো লাগে না আমার।

না লাগুক, আমি থাকবো পাশেই, কত সুবিধা হবে তোমার বাছা।

মানে, চারতালায় একটু মুস্কিল, এই জল আনা, বাসন মাজা, বাথরুম দোতালায় কি-না।

কি যে বল বাছা, খোঁড়া পা নিয়ে আমি জল ভরি না—বাসন মাজি না? আসল কথা, ভাবছ ওঘরে থাকলে পামেলার সংগে প্রেম করতে অসুবিধা হবে তোমার আমার জন্যে। না বাছা ভয় পেও না, আমি বিরক্ত করবো না তোমাদের।

সুকুমার লজ্জা পেয়ে বললো, আরে ছি ছি, কি যে বলেন মিসেস পারমেনটার,—হঠাৎ একটা ফন্দী এলো সুকুমারের মাথায়। সে বললো, আপনি তো এ বাড়ী ছেড়ে দেবেন শীগগিরই তখন আমি কি করবো চারতালায় বসে? শেষে আপনার ঘরে যদি এক অদ্ভুত ভাড়াটে আসে?

তা বটে, একথা শুনে সুকুমারকে সিলভিয়ার ঘরে নেয়ার উৎসাহ বেশ কমে গেল মিসেস পারমেনটারের, বাড়ী আমি ছাড়বোই সুকুমার, মিসেস ষ্ট্রেসনকে জব্দ না করে ছাড়বো না।

তাই তো বলছিলাম আপনি না থাকলে ওঘরে আমার থেকে কি লাভ?

তা ঠিক, একটু থেমে মিসেস পারমেনটার বললো, উঃ যা জ্বালিয়েছে আমাকে তোমার প্রেয়সী মেয়েমানুষ, ছি ছি লজ্জার কথা! এমন করে কেউ স্বামীকে ছেড়ে, একটা অসুস্থ লোককে আশা দিয়ে—ও কখনও সুখী হবে না, তুমি দেখে নিও সুকুমার। নির্লজ্জ। আবার গেল অসুস্থ পুরানো প্রেমিকের কাছে নতুন লোক জুটিয়ে বিদায় নিতে—কী প্রেম!

আরও অনেক কিছু বলে যায় মিসেস পারমেনটার। কিন্তু সব কথা শোনে না সুকুমার। অন্য কথা তুলে সিলভিয়ার প্রসংগ চাপা দিতে চেষ্টা করে।

বাইরে বরফের ঝড়।

যতই যাবার দিন কাছে আসে ততই দিশা হারিয়ে যায় সুকুমারের। তার মাথা ঝিম ঝিম করে, হিম হয়ে যায় দেহ। আর তো মোটে কয়েকটি মাস তারপর পাবে সে ফ্যারাডে হাউসের ডিপ্লোমা। আর তারপর? সে নিতেই আসা—সেটা নিয়ে ফিরে যেতেই হবে তাকে। এই নতুন জীবনের হ'য়ে যাবে শেষ!

হঠাৎ কেমন যেন ভয় লাগে সুকুমারের। এই প্রথম ভয় পাওয়া নয়, ফিরে যাবার কথা মনে হলেই ভয় হয় তার। তার এই চার বছরের জমা করা শক্তি নিঃশেষে ক্ষয় হয়ে যায় যেন।

কোথায় যাবে সুকুমার পামেলাকে নিয়ে? কোথায় উঠবে তারা? কেমন করে সাজিয়ে তুলবে এতদিনের স্বপ্ন-দেখা সংসার?

তাদের বাড়ীতে এখন মোটে দু'টি ঘর। একটি ঘরে থাকে ছায়া রাণু আর মা, আরেকটি ঘরে মণ্টু ঘুনু। সুকুমার পামেলাকে নিয়ে উঠবে কোথায়? বাড়ীর বড় ছেলে সে—সংসারের সমস্ত ভার তাকে নিতে হবে ফিরে গিয়ে। এই চার বছর সংসারের ওপর দিয়ে তার জন্যে বয়ে গেছে যে প্রচণ্ড ঝড়, আর তার অসহ্য আলোড়ন সহ্য করেছে যারা তারা চাইবেই সুকুমারের কাছ থেকে তাদের এই অসহ দুর্দিনের দাম। তারই কল্পনা করে মা এদেশে পাঠিয়েছিলেন তাকে। এখন তার ঘর থাক না থাক, তার ক্লান্তি আসুক না আসুক সেকথা শোনবার লোক তো নেই কেউ—তাকে মন দিয়ে শুনতেই হবে তার জন্যে যারা কষ্ট করেছে তাদের দুঃখ-কষ্টের, তাদের জ্বালা-যন্ত্রণার ইতিহাস। তার মুখের দিকে হাজার আকাঙ্খা নিয়ে তাকিয়ে আছে তারাই যারা ছেড়েছে একদিন তার জন্যে সমস্ত কিছু। ঋণ শোধের সময় হয়ে এলো। তাই সুকুমার ভয় পায়। নিজের কথা তাদের কাছে বলবার কি অধিকার আছে তার—আর শুনবেই বা কে! তাই তার মাথা ঝিম ঝিম করে।

এরমধ্যে কয়েকটা কোম্পানীর সংগে কথা বলেছে সুকুমার। এখান

থেকে তারা তাকে চাকরী দিতে পারে না, দেশের আপিসে গিয়ে দেখা করতে হবে—সবাই তাই করেছে। আরও অনেকে এসেছিল তাদের কাছে। আর যারা এখান থেকে চাকরী দিতে পারে, তাদের মাইনেতে সন্তুষ্ট নয় সুকুমার। পামেলাকে নিয়ে বড় অসুবিধা হবে তার ওই টাকায় চালাতে। চাকরী হবেই তার নিশ্চয়ই, সকলেরই হয়। কিন্তু কবে থেকে সেকথা বলা কঠিন। তাই হিম হয়ে যায় তার দেহ।

এবার মার কথা—আত্মীয়-স্বজনের কথা। পামেলাকে মা কেমন ভাবে নেবেন? কথাটা শুনেই একেবারে প্রথমে কি মনে হবে তাঁর? তিনি কি মূর্ছিত হয়ে পড়বেন? হয়তো তিনি চীৎকার করে কেঁদে উঠে বলবেন, ওরে এই জন্যেই কি তোকে সর্বস্ব খুইয়ে বিলেত পাঠিয়েছিলাম রে সুকু? তোর বংশে কখনও কেউ যা করে নি—তুই তাই করলি? আর সে কান্না শুনে কি মনে হবে পামেলার? তাই দিশা হারিয়ে যায় সুকুমারের।

'বাসে' আসতে আসতে সে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে কেনসিংটন্ গার্ডেন্স্‌এর দিকে। প্রকৃতিকে বড় রিক্ত মনে হয়। শীতের আরম্ভে কবে ঝরেছিল অসংখ্য পাতা, বরফে চাপা পড়েছিল তারা। এখন বরফ গলে গেছে তাই আবার দেখা যাচ্ছে তাদের—মৃত সিক্ত ঠাণ্ডা পত্রগুচ্ছের দল। হালকা কুয়াশায় আচ্ছন্ন কেনসিংটন্ গার্ডেন্স্। তারই ফাঁকে ফাঁকে কত নিঃস্ব গাছ মূক প্রহরীর মতো নিঃশব্দে শুধু দাঁড়িয়ে আছে। কোন ভাষা নেই তাদের। সুকুমারেরও যেন কোন কথা নেই আর। পাতা ঝরে গেছে, উড়ে গেছে পাখী, রিক্ত প্রকৃতি দেখে পৃথিবী পেয়েছে ভয়।

বাস থেকে নেমে সুকুমার কেনসিংটন্ চার্চ স্ট্রীট ধরে আস্তে আস্তে হাঁটে। বাঁ দিকে কোন সৈনিকের স্মৃতি-স্তম্ভ, অনেক শুকনো মালা পড়ে আছে সেখানে আর ডান দিকে মদের দোকান, চায়ের দোকান,

সিগ্রেট-তামাকের দোকান। কত দোকান যে এ রাস্তায়! আর একটু এগিয়ে এসে একটা বইয়ের দোকানের সামনে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে সে। তারপর আবার হাঁটতে আরম্ভ করে। নিকোল্‌স্‌-ষ্টোরস্‌ ছাড়িয়ে, সানলাইট লণ্ড্রীর পাশ দিয়ে ফুলের দোকান দেখতে দেখতে স্থকুমার এগিয়ে যায়। এ পাড়ায় এ রাস্তাটাই সবচেয়ে ভালো লাগে স্থকুমারের। কেনসিংটন্‌ গির্জের সামনে আবার চুপ করে দাঁড়ায় সে। রাস্তার ওপরেই যীশুর ক্রুশ বিদ্ধ মূর্তি, ফুল নিয়ে সেখানে জড়ো হয়েছে বুড়ীর দল।

কি নেই এ পথে? সবই আছে। এত ভালো করে এর আগে এই চার্চ ষ্ট্রীট কোনদিনও দেখেনি স্থকুমার। কেমন ঘোর লাগে তার এ রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে। গ্লষ্টার ওয়াকের কাছে এসে সে মোড় বেঁকে না—সিগ্রেটের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আপন মনে পড়ে ঘর খালির বিজ্ঞাপন। তার পাশেই পুরানো কাঁচের বাসনের দোকান—অনেক প্রাচীন জিনিশের দোকান এ রাস্তায়, প্রাচীন মালা, কত আগেকার তলোয়ার, কত পুরানো টেবিল-চেয়ার। এই প্রাচীন জিনিশ পত্রের দোকানগুলির সামনে দাঁড়িয়ে মন দিয়ে দেখে স্থকুমার। আর তো দেখতে পাবে না এসব। কেনসিংটন্‌ চার্চ ষ্ট্রীট শেষ হয় নটিং হিল গেটের কাছে এসে। তখন স্থকুমার অন্য ফুটপাথ ধরে দোকানগুলি দেখতে দেখতে ফিরে আসে গ্লষ্টার ওয়াকে। আর ক্লান্তিতে তন্দ্রা আসে তার।

* * *

কল্যাণবরেষু,

বাবা স্থকু, তোমার ঠাকুরমার দেয়া দশ ভরির হার বিক্রি করিয়া তোমার আসিবার ভাড়া পাঠাইলাম। এতদিন পর আমার দায়ীত্ব শেষ হইল—এবার সমস্ত ভার তোমার লইবার পালা। আমি আর

পারিতেছি না। সুকু আমি এই চার বছর ভাবনায় ভাবনায় কুঁজা হইয়া গিয়াছি—আর পারি না সুকু। তুমি আসিলে তোমার মাথা বুকে লইয়া কিছুক্ষণ কাঁদিবার সাধ আছে। তুই কই রে বাবা সুকু।

তুমি যাইবার পর হইতেই সংসারে যেন শনি ঢুকিয়াছে। একটির পর একটি বিপদ—যেন শেষ নাই।

মণ্টুর খুব বড় টাইফায়েড গেল। তোমার ভাবনা হইবে বলিয়া ইচ্ছা করিয়াই খবর দিই নাই। ডাক্তার পীড়াপীড়ি করিতেছে চেঞ্জে লইয়া যাইবার জন্য কিন্তু বাছাকে কি করিয়া চেঞ্জে লইয়া যাইব বলিতে পার? তাই তোমার আসিবার দিন গুনিতেছি—এদের সকলকে তোমার হাতে তুলিয়া দিয়া আমি দায়মুক্ত হই। তুমি বড় ভাইএর কর্তব্য পালন কর।

মণ্টুর অসুখের সময় কোন উপায় না দেখিয়া তোমার কাকার কাছ হইতে এক হাজার টাকা বাধ্য হইয়া ধার করিতে হইল। ভালো করিয়াই জানো তোমার কাকা মানুষটি কি রকম। তোমাকে বিলাত পাঠাইয়াছি বলিয়া আমাকে খোঁটা দিয়া নানা তম্বি করিয়া টাকা দিলেন বটে। কিন্তু হ্যাণ্ডনোট লিখাইয়া লইলেন এবং সুদও চাহিলেন। এখন ঘন ঘন চিঠি লিখিয়া জানাইতেছেন, টাকা শীঘ্র ফেরৎ দাও। আমি তাঁহাকে বলিয়াছি সুকু আসিয়াই তোমার টাকা শোধ করিয়া দিবে।

আরও কত কথা তোমাকে বলিবার আছে সুকু, আসিলে সব বলিব। তুমি অতি অবশ্য বিলাত হইতে চাকরী লইয়া আসিবে—যেন আসিয়াই মাহিনা পাও তা না হইলে আমি টিকিতে পারিব না আর তোমার মুখে সাধ করিয়া দু'মুঠা ভাতও ঠিক মত তুলিয়া দিতে পারিব না। কি যে সংসারের অবস্থা হইয়াছে সুকু—আসিলে সব, বলিব। আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জানিবে। মণ্টু, খুকু, ছায়া রাণু এখন ভালো আছে। ইতি

আশীর্ব্বাদিকা

তোমার মা

*　　　*　　　*

"হে ভারত নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি ত্যাজিতে মুকুট দণ্ড—"

ক্লোদের কথা মনে পড়ছে সুকুমারের। ঠিক ক্লোদের কথা নয়, কারখানায় পাওয়া ক্লোদের সেই কয়েকটি লাইন—

"আজ সকাল সাতটা থেকে শুধু মনে পড়েছে তোমাদের টেগোরের লেখা একটি লাইন—"

পরের কথাগুলি জানে না সুকুমার তাই শুধু ওই একটি লাইনই ফিরে ফিরে গুঞ্জন করে ফিরতে লাগলো তার চারপাশে—

"হে ভারত নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি ত্যাজিতে মুকুট দণ্ড—"

*　　　*　　　*

প্যাম্!

কি সুকু?

কাছে এসো। প্যাম্!

এই তো!

আরও কাছে!

হয়েছে?

পামেলা সুইট!

কি সুকু?

কিছু না প্যাম্।

চুপচাপ।

সুকু?

কি বলছ প্যাম্?

আজ ক'দিন ধরে তোমার কি হয়েছে ?

কিছু না তো।

কেন আজও আমার কাছে লুকোও তুমি ?

কিছু হয় নি প্যাম্।

আমি লক্ষ্য করছি তোমার চোখ বসে গেছে তোমার সে কথার খেলা নেই—এমন করুণ মুখ করে কি ভাবো তুমি ?

প্যাম্ ?

কি ?

না থাক—কিছু না।

আমি সত্যি তোমার ওপর রেগে যাব স্কু।

আজ থাক্, আর একদিন বলব।

না, আজই বলতে হবে—যদি না বলবে তাহ'লে কথা তুললে কেন ?

না শুনলে আমার ঘুম হবে না।

প্যাম্ তুমি—তুমি—

বল স্কু ?

তুমি ভারতবর্ষে যেওনা—

কেন ? তুমি যেতে চাও না ? এখানেই চাকরী করে থাকতে চাও ?

পারলে থাকতাম বৈ কি প্যাম্ !

তাহ'লে ?

আমার মা ছোট ভাইবোনদের জন্যে যেতেই হবে।

তাহলে আমাকে থাকতে বলছ কেন ?

চুপচাপ।

কথা বল স্কু—লক্ষীটি !

পামেলা একদিন, তুমি যেদিন আমার ভাড়া চুকিয়ে দিয়েছিলে

সেদিন বলেছিলে কোনদিনও কোন কিছু যেন তোমার কাছে না লুকোই, মনে আছে প্যাম্?

হ্যাঁ সুকু।

তাই বলছি ভারতবর্ষে গিয়ে তুমি সুখী হবেনা—আমি তোমাকে নিয়ে যেতে পারবো না—

কেন?…এই তুমি কাঁপছ কেন? সুকু—সুকু—

আমাকে ক্ষমা করো প্যাম্—তুমি ভারতবর্ষে যেওনা—আমি তোমাকে নিয়ে যেতে পারবো না—

সত্যি বলছ?

হ্যাঁ।

কিন্তু কেন সুকু?

কোথায় উঠবো তোমাকে নিয়ে?

তোমাদের বাড়ীতে।

আমারই থাকবার ঘর নেই সেখানে।

নতুন বাড়ী নেবো আমরা।

তা হয় না প্যাম্।

তাহলে হোটেলে থাকবো?

টাকা কোথায়?

তুমি তো ভালো চাকরী করবে।

সে তো পরের কথা—আর আমার মা আমার জন্যে দেনায় ডুবে আছে।

আমিও চাকরী করবো।

তাতেও হবেনা প্যাম্—তুমি আমাকে ভুল বুঝোনা—আমি সত্যি তোমাকে—

শান্ত সুকু—

আমি তোমাকে অসুখী করতে পারবো না—প্যাম্ আমাকে ভুল বুঝোনা—প্যাম্—

ভুল বুঝবো কেন? আমি সব বুঝেছি।

এত তাড়াতাড়ি উঠলে কেন? বোসো—

না—

তুমি চলে যেওনা প্যাম্—

আমাকে যেতে দাও সুকু—

না!

ছাড়ো আমাকে যেতেই হবে।

আমি ভেবে দেখবো—আমি আবার ফিরে আসবো—

তার প্রয়োজন নেই সুকু।

প্যাম্ তুমি যেও না—

আমাকে যেতে দাও—

প্যাম্ যেওনা—পামেলা—একটু থাকো—পাঁচ মিনিট পামেলা—পামেলা—প্যাম্—

* * *

যে সম্পর্ক গড়ে উঠতে চার বছর লেগেছিল তা ভাঙতে চার মিনিটও লাগলো না। তবু সুকুমার ভেবেছিল পামেলা আবার আসবে অন্তত একদিন ফোন করে তার খবর নেবে। দিন কেটে গেল, ভোর হলো কত রাত, পামেলার দেখা পেল না সুকুমার। একদিন সকালে সুকুমার পেল অ্যামেরিকান এক্সপ্রেসের চিঠি। মাত্র পনেরো দিন সময়। আর পনেরো দিন পরে সাউদাম্পটন বন্দর থেকে ছাড়বে তার জাহাজ। এত অল্প সময়! তারপর কিছু ভাবতে পারে না সুকুমার। শুধু ঝিম্‌ঝিম্ করে তার সমস্ত শরীর।

এর মধ্যে অনেক কাজ সেরে ফেললো সে। মার জন্যে জিনিশ

কিনলো, নিজের জামা-কাপড় নিলো, ভাইবোনদের জন্যে কিনলো এটা-ওটা।

বিদায় নিলো প্রত্যেকের কাছ থেকে। তার যত চেনা শোনা—এই চার বছর যাদের কাছে তার অনেক ঋণ। কাউকেই ভুললো না সুকুমার। যারা এখন লণ্ডনে নেই তাদের কাছ থেকে বিদায় নিল চিঠি লিখে।

কিন্তু এখনও তার আসল কাজ বাকি। পামেলার কাছ থেকে বিদায়! এই চার বছর তার সুখে-দুঃখে যে ছিল তার কাছে কাছে—যে ছিল তার দিনরাত্রির বন্ধু—যার কাছে জমা তার অপরিশোধনীয় ঋণ—সেই পামেলার কাছ থেকে নিতে হবে বিদায়—একথা ভাববে কেমন করে সুকুমার। তবু বলতেই হলো শেষ কথা।

গলার স্বর যেন বন্ধ হয়ে গেছে সুকুমারের, হাত কাঁপছে, কি কথা বলবে সে পামেলাকে!

উত্তর এলো, গ্রীনিচ ১১১২—

পামেলা?

কোন উত্তর নেই।

সুকুমার কথা বলছি।

হ্যাঁ।

আমি চলে যাচ্ছি প্যাম্, তাই তোমার সংগে একদিন দেখা করতে চাই।

আজকাল আমি বড় ব্যস্ত, একেবারে সময় নেই।

পামেলা, আমি সুকুমার—

জানি।

শুধু একদিন—আমি চলে যাবো প্যাম, তাই একবার দেখা করে শুধু গুড বাই বলতে চাই তোমাকে।

ফোনেই বল—দেখা করতে পারলে আমি খুশী হতাম কিন্তু বড় ব্যস্ত আজকাল—

কিন্তু তোমার বাবা—তাঁর সংগেও একবার দেখা—

বাবা এখন এখানে সেই। আচ্ছা সুকুমার—আমার এখন একটু তাড়াতাড়ি আছে, তোমার যাত্রা সুখের হোক—আমার শুভ কামনা, গুড বাই —

মাথা নিচু করে পেছনে দুই হাত দিয়ে খুব আস্তে আস্তে সুকুমার নিজের ঘরে এলো। অন্ধকার জমা হয়েছে তবু আলো জ্বাললো না সে। দুই হাতে শক্ত করে মাথা চেপে ধরে বসে পড়লো সোফায়।

পামেলা তুমি কোথায়! কেন ছেড়ে গেলে? কেন চলে গেলে? কেন ফেলে গেলে আমায়! কেন বোঝালে না? কেন তর্ক করলে না? কেন দিলে না সাহস!

এমনি করে জীবনে আর পামেলার সংগে দেখা হবে না। বুকের ভেতর কেঁপে উঠলো সুকুমারের—ঠেলে বেরিয়ে এলো দীর্ঘশ্বাস।

চলে যেতে হবে—আরও দূরে যেতে হবে—ফিরে যেতেই হবে।

মাঝখানে থাকবে কত সমুদ্রের ব্যবধান—কত হাওয়ার হাহাশ্বাস—দিগন্তের কত নিঃশব্দ প্রতিরোধ!

হঠাৎ সুকুমারের মনে পড়লো আলেকজান্দ্রা প্যালেসের কথা।

প্রাসাদের ভেতরে গিয়ে সে আলোগুলির উৎস দেখার অবসর আজও তার হলো না।

রচনাকাল ঃ

৩রা নভেম্বর, শুক্রবার সন্ধ্যা

থেকে

১২ই ডিসেম্বর, মঙ্গলবার সন্ধ্যা

লণ্ডন ঃ ১৯৫০